(প্রথম চরণ)

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৬
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২
মুদ্রাকর—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মানসী প্রেস,
৭৩, মানিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও,
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

আদি কাণ্ড

জিরানিয়ার বিবরণ

অযোধ্যাজী নয়, এখনকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে (১) এর নাম লেখা আছে "জীর্ণারণ্য"। পড়তে না পারো তো মিসিরজীকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। তখনও যা ছিল, এখনও প্রায় তাই। বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল। রেলগাড়ি ইষ্টিশানে পৌছিবার আগেই ঘুমন্ত যাত্রীদের ঠেলে তুলে দিয়ে লোকে বলে 'জঙ্গল আগেয়া, জিরানিয়া আগেয়া' (জঙ্গল এসে গিয়েছে, জিরানিয়া এসে গিয়েছে)।

তাৎমাটুলির লোকেরা একেই বলে 'টৌন' (টাউন)। যেমন-তেমন হেজিপেজি শহর নয়—'ভারী সাহার' (২), পীরগঞ্জ থেকেও বড়, বিসারিয়া থেকেও বড়। পীরগঞ্জে কলস্টর (কলেক্টর) সাহেবের কাছারি আছে? বিসারিয়ায় ধরমশালা আছে? পাদ্রী সাহেবের গির্জা আছে? ভা-আ-রী সাহার জিরানিয়া। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাস্তা দিয়ে টমটম যায়; পাকা রাস্তা দিয়ে। দোতলা বাড়িও আছে, পাকা দোতলা। চেরমেন (চেয়ারম্যান) সাহেবের।

শহরের 'বাবুভাইয়ারা' সব ছিলেন 'বাংগালী; ওকিল, মুখ্‌তার, ডক্‌টর, আমলা' সব। তাঁদের ছেলেপিলেদেরও এ শহরের গর্ব ছিল তাৎমাদেরই মত। না হলে সেকালের যুগে কালীবাড়ি কমিটির বার্ষিক রিপোর্ট পড়ার সময় বিরাটবপু রায়সাহেব জিরানিয়াকে মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, 'এটা একটা সামান্য পণ্ডগ্রাম'। ছেলের দল চীৎকার করে তাঁকে আর 'গণ্ডগ্রম' না করে বসে পড়তে বলে। তাদের নাগরিক গর্বে আঘাত লেগেছিল।

টীকা:—

(১) **রামচরিতমানস**—তুলসীদাসজীর লেখা রামায়ণের নাম 'রামচরিতমানস'। ভারতবর্ষের মধ্যে রামচরিতমানসই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় বই। রামচরিত্র মানসসরোবরের মত বিশাল। ইহার ভিতর রামকথারূপ হাঁস ঘুরিয়া বেড়ায়।

(২) **ভারী সাহার**—প্রকাণ্ড শহর।

তাৎমাটুলির কাহিনী

এহেন শহরের শহরতলি, তাৎমাটুলি; শহর যখন, তার শহরতলি থাকবে না কেন? জিরানিয়া আর তাৎমাটুলির মধ্যে আর কোন গাঁ নেই। সেই জন্যই তাৎমাটুলিকে বলছি শহরতলি। শহর থেকে মাইল চারেক দূরে হবে; তাৎমারা বলে 'কোশভর' (১)। তাৎমাটুলির পশ্চিমে শিমুলগাছ-ভরা বকরহাট্টার মাঠ, তারপর ধাঙ্গড়টুলি। দক্ষিণ ঘেঁষে গিয়েছে মজা নদী 'কারীকোশী'—লোকে বলে 'মরণাধার'। মাঠের বুক চিরে গিয়েছে কোশী-শিড়িগুড়ি রোড। তাৎমাটুলির লোকেরা এই রাস্তাকে বলে 'পাক্কী' (২)।

বোধ হয় তাৎমারা জাতে তাঁতি। তারা যখন প্রথম আসে, তখন খালি একজনের কাছে ছিল একটা ভাঙ্গাচোরা গোছের গামছা বোনার তাঁত। দ্বারভাঙ্গা জেলার রোশরা গ্রামের কাছ থেকে অনেকদিন আগে এখানে এসেছিল দল বেঁধে—পেটের ধান্ধায়। না এদের কেউ কোনদিন কাপড় বুনতে দেখেছে, না এরা স্বীকার করতো যে, এরা তাঁতি। এরা চাষবাস করে না, বাসের জমি ছাড়া জমি চায় না। আর বাড়িতে একবেলার খাওয়ার সংস্থান থাকলে কাজে বেরোয় না। সেটুকুও বোধ হয় জুটছিল না দ্বারভাঙ্গা জেলায়। তাই এসে তারা 'ধন্না' দিয়েছিল ফুকন মণ্ডলের কাছে। তিনি তখনকার একজন বড় 'কিসান' (জোতদার) (৩)। তাঁর আবার জমিদার হওয়ার ভারী শখ। নামমাত্র খাজনায় একরকম জোর করে তিনি এদের এই জমিতে রেখেছিলেন। নিজেই এদের বাড়ি করবার জন্য বাঁশ খড় দিয়েছিলেন। চিঠির কাগজে মনোগ্রাম ছাপিয়েছিলেন—বকরহাট্টা এস্টেট, দেউড়ি ফুকননগর। তাঁর দেওয়া ফুকননগর নাম ধোপে টেঁকেনি। নাম হয়ে গেল তাৎমাটুলি। যতদিন বেঁচেছিলেন, তিনি রোজ এখানে আসতেন। তাঁর পাড়ার বখা ছেলেরা তাঁর আসার পথ ছেড়ে দিত—'সরে যা, সরে যা—জমিদার সাহেব ক্যাম্প ট্যাটমাঠোলিতে যাচ্ছেন, নিমান্তিনের পকেটে এস্টেটের কাছারি নিয়ে।' মোটা লেন্সের চশমার মধ্যে দিয়ে তিনি রোজ ধাঙ্গড়টোলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন।—সবুজ বাঁশবনের পিছনে পরিষ্কার করে নিকানো ধাঙ্গড়দের খড়ের ঘরগুলো, এখান

থেকেই যেন দেখতে পেতেন। অঙ্গনে, মেঠোপথে, আমগাছের তলায় খড়ের কুটোটি পর্যন্ত নেই। সব ঝকঝকে তকতকে। লোকেরা চকচকে কালো; সুন্দর স্বাস্থ্য। সেখানকার ছাগল, কুকুর, গাছ, ল্যাংটো শিশু, সবই যেন তাজা নধর। এতদূর থেকেও যেন দেখা যায়, তাদের কাপড় চোপড়, ধাঁদরার ছাইয়ের ক্ষার (৪) দিয়ে পরিষ্কার ধবধবে করে কাচা। মাদলের শব্দ যেন কানে আসছে পিড়িং পিড়িং।...

বকরহাট্টা এষ্টেটের জমিদারবাবু ভাবেন কেন তাঁর প্রজা তাৎমারা এরকম হ'লনা, কেন তারা ধাঙ্গড়দের মত ঠিক সময়ে খাজনা দিয়ে দেয় না। জমিদারি থেকে রোজগার না হয় নাই হল, কিন্তু প্রজারা একটু পরিষ্কার ঝরিষ্কার থাকলে, একটু পাড়াটা দেখতে ভাল হলে, জমিদারের ইজ্জৎ বাড়ে। বাংগালী উকীল হরগোপালবাবু কতদিনই বা জিরানিয়ায় এসেছেন। এখনও ত্রিশ বছর হয়নি। যেবার রেল লাইন হ'লো বাংগালী বাবুভাইয়ারা পিঁপড়ের মত দলে দলে এসে শহরের এদিকে বাড়ী করলেন। ওদিকে সাহেবদের মহল্লা, সাহেবরাই রেল লাইন আনিয়েছে নিজেদের পাড়ার কাছ দিয়ে। ওদিকেতো বাংগালী বাবুদের "দাল গললোনা" (৫)। ওঁরা এলেন এদিকে। তখন ধাঙ্গড়রা থাকতো ঐখানেই। লোক দেখলেই তারা পালায় দূরে। তাই তারা এসে বাসা বাঁধলো আজকালকার ধাঙ্গড়টোলায়। ভারী বুদ্ধিমান লোক হরগোপালবাবু; পয়সা কামাতে জানেন। কাছারির নিলামে কেনা 'পড়তী' জমি, গরুচরার জন্যও লোকে নিত কিনা সন্দেহ, তাই দিলেন ধাঙ্গড়দের মধ্যে বিলি করে। সেই জিনিসই এখন দেখ কেমন ফেঁপে ফুলে উঠেছে। ঐ কিরিস্তান ধাঙ্গড়গুলোর বাংগালীদের সঙ্গেই খাপ খায়। যাকগে মরুকগে! রামচন্দ্রজী! "কৃপা তুমহারি সকল ভগবানা (৬)"।

এ অনেক দিনের কথা হ'ল।

.. এর পর বহুবার বকরহাট্টার মাঠ সবুজ হয়ে গেলে 'মরণাধারে' জল এসেছে, বহুবার কুল পাকার সময় শিমুল বনে ফুলের আগুন লেগেছে, লু বাতাসে শিমুল তুলো উড়ে যাওয়ার সময় "পাক্কীর" ধারের নেড়া অশথ গাছগুলো তাৎমাদের আচার খাওয়ার জন্য কচি কচি ডগা ছেড়েছে। তাৎমাদের মধ্যে কেউ হিসাব

জানলে বলতো—এ "ঢের সালের" (৭) কথা—দশ সাল, বিশ সাল, এককুড়ি, দোকুড়ি, তিন কুড়ি সালের কথা। মনে মনে গুণবার মিছা চেষ্টা করতো—এর মধ্যে "ঝোটাহারা" (৮) ক'বার স্নান করেছে (৯)।

টীকা :—

(১) **কোশভর**—মাত্র এক ক্রোশ।

(২) **পাক্কী**—পাকা রাস্তা।

(৩) **কিসান**—জিরানিয়া জেলায় 'কিসান্' বলতে ঠিক যারা নিজেরা জমি চাষ করে তাদের বোঝায় না। দশ পনের হাজার বিঘা জমি যার সেও কিসান। কেবল গভর্নমেণ্টে রেভেনিউ দিলেই তবে তাকে বলে জমিদার।

(৪) **বাঁদরা**—একরকম পরগাছা।

(৫) **দাল গললোনা**—মুরদে কুলোলোনা; টুঁ ফঁ্যা চলবে না ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়।

(৬) সবই তোমার কৃপা—তুলসীদাস হইতে।

(৭) **ঢের সাল**—অনেক বছর।

(৮) **ঝোটাহা**—শব্দার্থ ঝুঁটিওয়ালী; তাৎমারা মেয়েদের এই নামেই ডাকে।

(৯) **ক'বার স্নান করেছে**—তাৎমা মেয়েরা সাধারণতঃ বছরে একবার 'ছট'পরবের সময় স্নান করত। যে মেয়েরা একটু বেশী ছিম্‌ছাম্, তারা স্নান করে মাসে একবার।

তাৎমাটুলির মাহাত্ম্য বর্ণন

তাৎমাটুলিতে ঢুকতে হবে পালতেমাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার 'বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায়—শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে—দেশালাইয়ের বাক্স পায়ের তলায় চেপ্টে যাবার পর ফের সোজা করবার চেষ্টা করলে, যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফরসা কাপড় পরা লোক দেখলে, এখানকার কুকুর ডাকে; কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটো ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়; বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ল্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সেও উঠে বসতে চেষ্টা করে, আদাব করবার জন্য। মেয়েরা কিন্তু একটু অন্য রকম। এর বাড়ীর উঠোন আর ওর

বাড়ীর পিছন দিয়েতো যাওয়ার পথ। ধোঁদলের হলদে ফুলে ভরা একচালাটার নীচে যে মেয়েটা তামাক খাচ্ছে, সে না হুঁকোটা নামায়, না চিরকুট কাপড়খানা সামলে গায়ে দেবার চেষ্টা করে। ইঁদারা তলার ঝগড়া সেইরকমই চলতে থাকে, কেউ ভ্রুক্ষেপও করে না; তেলের বোতল হাতে কুঁজো বুড়ীটা ফিক্ করে হেসে হয়ত জিজ্ঞাসাও করে ফেলতে পারে যে বাবু কোনদিকে যাবেন।

এই হল বাইরের রূপ; কিন্তু বাইরের রূপটাই সব নয়,—

তাৎমাটোলার লোকরা বলে—রোজা, রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন। অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে বলে গুণী। রোজগার এদের 'ঘরামী'র কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়ীরই খোলার চাল, আর প্রত্যেক বাড়ীতেই আছে কুয়ো। তাই কোন রকমে চলে যায়। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু রামায়ণের নজীর এদের পুরুষদের কথায় কথায়, বিশেষ করে মোড়লদের।

মেয়েদের না জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলে—গাঁয়ে আছে কেবল 'পঞ্চায়তী', আর 'পঞ্চায়তী' আর 'পঞ্চায়তী' (১)।

টীকা:—

(১) পঞ্চায়তের মোড়লকে বলে "মহতো"। চারজন মাতব্বরকে এরা বলে 'নায়েব'। আর যে 'নুটিস্' তামিল করে, আর লোকজনকে ডেকেডুকে নিয়ে আসে তার নাম "ছড়িদার"। মহতো আর চারজন নায়েব পঞ্চায়তে থাকে। পাঁচজন, 'পঞ্চ'।

ধাঙ্গড়টুলির বৃত্তান্ত

ধাঙ্গড়টুলির সঙ্গে তাৎমাটুলির ঝগড়া, রেষারেষি চিরকাল চলে আসছে। ধাঙ্গড়দের পূর্বপুরুষরা আসলে ওরাওঁ। কবে তারা সাঁওতাল পরগণা থেকে গঙ্গার এপারে আসে কেউ জানে না। তবে সাঁওতাল পরগণার ওরাওঁদের ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার মিল আছে। ধাঙ্গড় ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলবার সময় তারা হিন্দিতে কথা বলে।

ধাঙ্গড়দের মধ্যে কয়েক ঘর আছে খৃষ্টান। অধিকাংশ ধাঙ্গড়ই সাহেবদের

বাড়ী মালীর কাজ করে। যারা মালীর কাজ না পায় বা পছন্দ না করে তারা অন্য অন্য কাজকর্ম করে। কুলের ডাল কাটা থেকে আরম্ভ করে মৌচাক কাটা পর্যন্ত কোন কাজেই তাদের আপত্তি নেই। সকলেরই গায়ে অসীম ক্ষমতা, আর কাজে ফাঁকি দেয় না বলে, সকলেই তাদের মজুর রাখতে চায়।

ধাঙ্গড়রা তাৎমাদের বলে নোংরা জানোয়ার। তাৎমারা ধাঙ্গড়দের বলে "বুড়বক কিরিস্তান" (বোকা খৃষ্টান)।

ধাঙ্গড়টুলি পড়ে পরগণা ধরমপুরে, আর তাৎমাটুলি হাভেলী (১) পরগণাতে। রাজা তোডরমল্লের যুগে যখন এই দুই পরগণার সৃষ্টি হয়, তখনও পরগণা দুইটির মধ্যের সীমারেখা ছিল একটি উঁচু রাস্তা। সেইটাকেই এযুগে পাকা করে নাম হয়েছে কোশী-শিলিগুড়ি রোড। কিন্তু এখন ঐ রাস্তা কেবল ধরমপুর আর হাভেলী পরগণার সীমারেখা মাত্র নয়, তাৎমা ও ধাঙ্গড় এই দুটি সম্প্রদায়ের হৃদয়েরও বিচ্ছেদরেখা।

ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তাৎমা আর ধাঙ্গড়দের মধ্যে নিত্য ঝগড়া লেগেই আছে। গায়ে পড়ে ঝগড়া আরম্ভ করে তাৎমারাই। ঝগড়াটা বেশ বেধে যাওয়ার পর পালানোর পথ পায় না। তবু অভ্যাস যাবে কোথায়।

টীকা :—

(১) হাভেলী কথাটার শব্দার্থ অন্দর মহল।

বৌকা বাওয়ার আদিকথা

তাৎমাটুলির বড় রাস্তার ধারে আছে একটা প্রকাণ্ড অশথ গাছ। তার নীচে একটি উঁচু মাটির ঢিবি বেশ করে সিঁদুর মাখানো। ইনিই হচ্ছেন তাৎমাদের 'গোঁসাই' (১) এই গোঁসাইয়ের সম্মুখে পোঁতা আছে একটা প্রকাণ্ড হাড়িকাঠ। এই জায়গাটার নাম গোঁসাইথান, লোকে ছোট করে বলে 'থান'। প্রতি বছর ভাইদ্বিতীয়া না তার পরের দিন এই হাড়িকাঠে তেল-সিঁদুর পড়ে, একটা নিশান পোঁতা হয়, আর চাঁদা করে কেনা একটা ভেড়া বলি দেওয়া হয়।

এই 'থানেই' বৌকা বাওয়ার (২) আস্তানা। বৌকা বাওয়ার আগে কিম্বা পরে তাৎমাদের মধ্যে আর কেউ সাধু-সন্ন্যাসী হয়নি।

ছোট বেলায় বৌকা তার মার সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুত। শহরের গেরস্তদের দোরগোড়ায় 'খোথা-আ মুমু-উ-উউঃ (৩) এই ডাক শুনলেই বাড়ির লোকে বলত, 'এইরে বৌকামাই (৪) এসেছে, এখন দুটি ঘণ্টা চলবে এর একটানা চীৎকার।' দিদিরা ছোট ভাইকে ভয় দেখাতো—কাঁদলেই দেবো বৌকামাইয়ের কাছে ধরিয়ে।

সেই বৌকা বড় হয়ে তার দাড়ি-গোঁফ গজালে, হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, একটা চিমটে আর একটা ছোট ত্রিশূল নিয়ে সে গোঁসাইথানে বসে আছে। পাড়ার লোকে দেখতে এলে, বৌকা ত্রিশূলটা ইট দিয়ে ঠুকে মাটিতে গেঁথে দিল। সেই দিন থেকে ঐ 'থানে'ই তার আস্তানা। এতদিনকার বৌকা ঐদিন থেকেই বৌকা বাওয়া হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরের কথা। গোঁসাইথানের পাশেই পথের ধারে একটা ঝড়ে-পড়া পাকুড়গাছ বহুদিন থেকে পড়ে ছিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের জিনিস; কিন্তু তাৎমারা নিয়মিত শুকনো গাছটার থেকে জ্বালানি কাঠ কেটে নিচ্ছিল। শিকড়ের মোটা কাঠগুলিকে পর্যন্ত তারা গর্ত করে বের করে নিতে ছাড়েনি। পড়ে ছিল কেবল মোটা গুঁড়িটা। এই কাত হয়ে পড়া গুঁড়িটা একদিন সকালে খাড়া দাঁড় করানো অবস্থায় দেখা যায়। আরও দেখা যায়, যে বৌকা বাওয়া হাত জোড় করে গাছের চারিদিকে ঘুরছে আর প্রত্যেক পরিক্রমার পর একবার করে সূর্যদেবকে প্রণাম করছে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। রেবন 'গুণী' বলে, জিনের কাণ্ড। চশমা-পরা সর্বজ্ঞ পেশকার সাহেব রায় দিলেন—'ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড পথের ধারে ডাল পুঁতে গাছ লাগায়। সেই জন্য এসব গাছের ট্যাপরুট নেই—তা না হলে কি এরকম হয়।' বিজনবাবু উকীলের কলেজে-পড়া ছেলে ফরিদপুরের সূর্যোপাসক খেজুরগাছের কথা তোলে। স্কুলের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, —'নন্তুদা পণ্ডিত হবে না? ও যে কলেজে 'ভুটানি' (৫) পড়ে'। এসব ব্যাখ্যা তাৎমা ধাঙ্গড়দের মনে ধরেনি। এই দিন থেকে বৌকা বাওয়ার পসার-প্রতিপত্তি অনেক গুণ বেড়ে যায়। তার নামডাক তাৎমাটোলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে।

গোঁসাইথানের বেদীর উপরের তেল-সিঁদুরের প্রলেপ আরও পুরু হয়ে উঠতে থাকে। বাওয়ার আস্তানার জন্য লোকে নিজে থেকে খড় বাঁশ দড়ি পৌঁছে দেয়।

তাৎমাদের বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ টাকা পায় বরপক্ষের কাছ থেকে। তাৎমাটুলির বুড়ীরা বলে 'আহা টাকার অভাবে বিয়ে করতে না পেরে বৌকাটা সন্ন্যাসী হয়ে গেল।

তাৎমাদের ছেলেরা বিয়ে হলেই সাহেবদের মত মা-বাপের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই ভয়ে বৌকার মা ভিক্ষায় জমানো আধলাগুলো একদিনও ছেলের হাতে দেয়নি।

বৌকামাই মারা যাওয়ার দিন বৌকা যখন নারকেলের মালায় করে তার মুখে জল দিচ্ছিল, তখন সে ছেলের হাতটা বুকে টেনে নিয়ে বলেছিল—'অযোধ্যাজীতে গিয়ে থাকিস—সেখানে খুব ভিক্ষে পাওয়া যায়। পীপড় (অশ্বত্থ) গাছ কোনদিন কাটিস না। ধাঙ্গড়টোলার 'কর্মাধর্মার' (৬) নাচ দেখতে যাস না, ওদের মেয়েরা বড় খারাপ। অদৌড়ি (৭) খেতে বড় ইচ্ছে করছে! নারকেলের মালা যেখানেই দেখবি তুলে নিস, ও এঁটো হয় না।

—এর পরের কথাগুলো বৌকা মায়ের মুখের কাছে কান নিয়ে গিয়েও বুঝতে পারেনি। কেবল শুকনো ঠোঁট দুখান নড়তে দেখেছিল। মায়ের আধবোঁজা চোখের কোণ থেকে যে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল, সেটাকে মুছিয়ে দিয়েছিল লেঙ্গটের খুঁট খুলে নিয়ে। ঠোঁটের কোণের ছোট্ট লাল পিঁপড়েটাকে দু আঙুল দিয়ে খুঁটে তুলে দূরে ফেলে দিয়েছিল—মেরে ফেলতে মন সরেনি।

টীকা:—

(১) তাৎমারা সূর্যদেবকেও 'গোঁসাই' বলে; আবার ঐ অশথতলায় সিঁদুর মাখানো যিনি আছেন তাঁকেও গোঁসাই বলে।

(২) **বৌকা**—বোবা। **বাওয়া**—সন্ন্যাসী।

(৩) **খোখা**—খোকা; **মুন্নু**—ছোট ছেলে।

(৪) **বৌকামাই**—বোকার মা; কারও নামের সঙ্গে মাই শব্দটি যোগ করিলে অর্থ হয় অমুকের মা।

(৫) **ভুটানী**—Botany।

(৬) **কর্মাধর্মা**—ধাঙ্গড়দের ভাদ্র পূর্ণিমার দিনের উৎসব আর পূজা।

(৭) **অদৌড়ি**—আদা দেওয়া একরকম বড়ি।

বাল্যকাণ্ড

ঢোঁড়াইয়ের জন্ম

বুধনীর মনে আছে যে, ঢোঁড়াই যেদিন পাঁচদিনের সেদিন 'টৌনে' (১) ছিল একটা 'ভারী তামাসা' (২)। আর একদিন আগেই যদি ঢোঁড়াই জন্মায়, তাহলেই বুধনী ছদিনের দিন স্নান করে তামাসা দেখতে যেতে পারে; কিন্তু তা ওর বরাতে থাকবে কেন! কেবল খাও, রসুন গুড় আদাবাঁটা একসঙ্গে সেদ্ধ করে সেইটা তেলে ভেজে! মরণ! বুধনী কাঁদতে বসে।

ওর স্বামীটা ভারী ভালমানুষ। অন্য তাৎমারা বলে হাবাগোবা তাই রোজগার কম। বুধনীর নিজের রোজগার আছে বলেই, চলে যায় কোনোরকমে। তার স্বামীকে দিয়ে তাৎমার দল চাল ছাইবার সময় খাপরা বওয়ায়, খাপরার ঝুড়ি নিয়ে মইয়ে চড়ায়; পৌষ মাঘে কুয়ো পরিষ্কার করতে হলে, তাকেই জলের ভিতর বেশীক্ষণ কাজ করায়।

বুধনীকে কাঁদতে দেখে সে বলে 'তা এখন কাঁদতে বসলি কেন? ছেলেটার দিকেও ছাখ্—ঘাড় কাত করে রয়েছে কেন। তোর জন্যে আবার দুপয়সার মসুরির ডাল কিনে আনতে হবে। কি গরম মসুর ডাল—না?'

তার স্বামী কোনদিন মসুর ডাল খায়নি। সে কেন, কোন তাৎমাই খায় না। অত গরম জিনিস খেলে গায়ে কুষ্ঠ হয়ে যাবে সেই ভয়ে। খালি খাবে মেয়েরা, ছেলেপিলে হওয়ার পর কয়েকদিন, তখন ওদের শরীরের রস শুকোনোর দরকার সেইজন্যে।

বুধনী বলে 'হ্যাঁ, খেলেই যেন গরম আগুন জ্বলে গায়ে।'

'আমি তামাসা দেখে এসে তোকে সব বলবো, বুঝলি? কাঁদিস না।'

সেদিন 'টৌন' থেকে বাড়ী ফিরবার সময় ঢোঁড়াইয়ের বাপের বুক দুর দুর করে ভয়ে। দুটো পয়সা ছিল তার কাছে। তামাসায় গিয়ে সে তাই দিয়ে এক পয়সার এক 'পাকিট বাত্তিমার' (৩) কিনেছে, আর এক পয়সার খয়নি। বাড়ি

গিয়ে এখন কি বলবে বুধনীর কাছে মন্থর ডালের সম্বন্ধে, সেই কথাই সে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফেরে ; যত বোকা তাকে সকলে ভাবে সে তত বোকা নয়।

'কে আর দোকান খোলা রাখবে, ঐ রাজার দরবারের (৪) জুলুস' (মিছিল) দেখা ছেড়ে দিয়ে।' এই কথা বলতে বলতে সে বাড়ি ঢোকে।

বুধনী অনেকক্ষণ থেকে তারই জন্য অপেক্ষা করছিল, তামাসার খবর শোনবার জন্য।

'কার ? কপিলরাজার নাকি ?'

কফিল রেজা কুলের জঙ্গলের ঠিকেদার, লার ব্যবসা করে। তাকেই সকলে বলে কপিল রাজা।

'না রে না। ওলায়তের (বিলাতের) রাজার। তার কাছে কলস্টর সাহেব, দারোগা পর্যন্ত থর থর থর থর।' (৫)

দরবার কথাটার ঠিক মানে, ঢোঁড়াইয়ের বাপ নিজেই বুঝতে পারেনি। মনে মনে আন্দাজ করেছে যে বোধ হয় এই মিছিলেরই নাম দরবার। পাছে বুধনী ঐ কথাটার মানে জিজ্ঞাসা করে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে 'জুলুসে'র হাতী ঘোড়া উটের কথা বলতে আরম্ভ করে।

সে কি বড় বড় হাতী ! সোনার কুর্তা পরানো, ইয়াঃ বড় বড় দাঁত, 'চাঁদি' দিয়ে ঢাকা। সে যে কত চাঁদি, তা দিয়ে যে কত ঘুন্সি হতে পারে, তার ঠিকানা নেই। একটা হাতী ছিল সেটার আবার একটা দাঁত এই ছোট্ট কদুর মত। উটগুলো চলছে টিম-টাম্ টিম-টাম্, সামনে পিছনে—ঠিক খোঁড়া চথুরীটার মত চলার ধরণ। হাতীর পিঠে চাঁদির হাওদায় 'কলস্টর সাহাব্' (কলেক্টর সাহেব), আর একটায় বুধনগরের কুমাররা, আরও কত সাহেব, কত হাকিম, কে কে, সব কি অত চিনি ছাই ! সাদা ঘোড়ার পিঠে ভাইচেরমেন সাহাব। কি তেজী ঘোড়া ! টকস-টকম টকস-টকম কি চাল ঘোড়ার ! তার কাছে যায় কার সাধ্যি। ছত্তিস বাবুর (৬) দোকানের বারান্দায় বাঙালী মাইজীদের মিছিল দেখার জন্য চিক টাঙিয়ে দিয়েছিল—ঘোড়াটা তার জোড়া পা তুলে দিতে চায় সেই চিকের উপর। ইয়াঃ তালের মত বড় বড় খুর !

বুধনী আঁতকে ওঠে ভয়ে 'গে মাইয়া ! তাই নাকি !'

আরও কত তামাসার খবর বুধনী শোনে। তার দুঃখের সীমা নেই। উট আর কলস্টর সাহাব দেখা তার পোড়া কপালে রামজী দেন নাই, সে আর কার দোষ দেবে।.........

ছেলেটা কেঁদে ওঠে।

ঢোঁড়াইয়ের বাপ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। —"নে, নে দুধ দে। অমন করে তুলিস না—ঘাড় মটকে যাবে 'বিলি বাচ্চাটার' (৭)"। তারপর ঐ 'বিলি বাচ্চা' ঢোঁড়াইয়ের দিকে মাথা নেড়ে, হাত তালি দেয়।

এ মুন্নু !. (ও খোকন) এত্তা ভাত খাওগে ? (এতগুনো ভাত খাবে) বকড়ি চড়াওগে ? (ছাগল চড়াবে)।

এত্তা ভাত খাওগে, বকড়ি চরাওগে। এত্তা ভাত খাওগে, বকড়ি চরাওগে।

ছেলেকে দুধ দিতে দিতে গর্বে বুধনীর বুক ভরে ওঠে। ছেলেপাগল লোকটার আদর করা দেখে হাসি আসে। তোমার বিলিবাচ্চা কি এখন শুনতে শিখেছে, এখনও আলোর দিকে তাকায় না, ওকে হাততালি দিয়ে দিয়ে আদর হচ্ছে ! পাগল নাকি !.

ঢোঁড়াইয়ের বাপ বেঁচে গিয়েছে আজ খুব, 'তামাসা'র গল্প আর ছেলে সামলানোর তালে মসুর ডাল না আনার কথা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু তার মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করে—ছেলের তাকৎ মায়ের দুধে, আর মায়ের দুধ হয়, মসুর ডালে।

খানিকপরেই মহতোগিন্নি আসেন, প্রসূতির তদারক করতে। হাজার হোক ছেলেমানুষতো বুধনী। মা হলে কি হয়, পেট থেকে পড়েই কি লোকে আঁতুরঘরের বিধিবিধান শিখে যাবে। কাল স্নান করবার দিন। মহতোগিন্নি না দেখাশুনো করলে, পাড়ার আর কার গরজ পড়েছে বলো। মহতোগিন্নী হওয়ার ঝক্কি তো কম নয়। এসেই প্রথম জিজ্ঞাসা করলেন বুধনীকে, মসুরডালে রসুন ফোড়ন দিয়েছিলে না আদা ফোড়ন ? দোকান বন্ধ ছিল ! কে বললো ? তোমার 'পুরুখ' (৮) ? আমি নিজের চোখে দেখে এলাম খোলা রয়েছে ; দেখে আসা কেন আমি নুন কিনে এনেছি।.........

তারপর চলে মহতোগিন্নির গালাগালি ঢোঁড়াইয়ের বাপকে। বুধনীও সঙ্গে সঙ্গে রসান দেয়। পাড়ার অন্য কোন বয়স্থ পুরুষকে এরকমভাবে বকতে মহতোগিন্নি নিশ্চয়ই পারতেন না। কিন্তু এ মানুষটিকে সবাই বকতে পারে।

তারপর মহতোগিন্নি চলে গেলে ঐ 'পুরুখ' বুধনীর কাছে সব কথা খুলে বলে, নিজের দোষ স্বীকার করে।

বুধনী মনে মনে হাসে। এমন 'পুরুখে'র উপর কি রাগ করে থাকা যায়। লোকের ঠাট্টাটা পর্যন্ত বোঝে না এ মানুষ; না হলে কাল হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে আমাকে খবর দেওয়া হল, যে রতিয়া 'ছড়িদার' রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করেছে ওকে—যে ছেলের রঙ মকস্থদনবাবুর গায়ের রঙের মত হয়েছে নাকি।

টীকা:—

(১) টৌন—জিরানিয়া।

(২) ভারী—বড়।

(৩) এক পাকিট বাত্তিমার—এক প্যাকেট লণ্ঠন মার্কা সিগারেট। সিগারেটটির নাম ছিল 'রেড ল্যাম্প'।

(৪) দরবার—দিল্লী দরবার (১৯১২)।

(৫) থর থর থর থর—তাৎমারা কথা বলিবার সময় ধ্বনিপ্রধান শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করে।

(৬) ছত্তিসবাবু—সতীশবাবু।

(৭) বিলি-বাচ্চাটার—বিড়ালের বাচ্চাটার (আদরে)।

(৮) পুরুখ—স্বামী।

বুধনীর বৈধব্য ও পুনর্বিবাহ

ঢোঁড়াই হয়েছিল বেশ মোটা সোটা। রংটাও কাল না—মাজা মাজা গোছের—তাৎমারা বলে গমের রং। তার বাপ সন্ধ্যার সময় কাজে থেকে এসেই ছেলে কোলে নিয়ে বসতো। ছেলে হওয়ার পর থেকে সে রাতে পাড়ার ভজনের দলে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। তাই নিয়ে পাড়ার লোকের কত ঠাট্টা।

বুধনী উনুনের ধারে উঠনে বসে। আর সে বসে দরজার ঝাঁপের পাশে ছেলে কোলে নিয়ে বুধনীর সঙ্গে গল্প করতে।

"বকড়—হাট্টা—আ—আ

বড়দ বাট্টা—আ--আ

সো জা পাঠ্‌ঠা—আ—আ"

(ছাগলের হাট, বলদের চলার পথ, শুয়ে পড় জোয়ান)। ঘুমপাড়ানী গান শুনতে শুনতে ছোট্ট ঢোঁড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে বাপের কোলে।

'বুঝলি বুধনী এ ছোঁড়া বড় হয়ে আমার বংশের নাম রাখবে। একে লেখাপড়া শেখাবো চিমনীবাজারের বুড়হা গুরুজীর কাছে। রামায়ণ পড়তে শিখবে, পাড়ার দশজনকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে; ধাঙড়টুলি, মরগামা, কত দূর দূর থেকে লোক আসবে ওর কাছে, খাজনার রসিদ পড়াতে। ভারী 'তেজ' (১) ছোঁড়াটা; দেখিসনা এই বয়সেই কোলে নিলেই ছোট্ট ছোট্ট আঙুল দিয়ে খাবলে ধরতে চায় আমার কান আর নাক।'—ঘুমন্ত ছেলের গাল দুটো টিপে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে 'ওনামাসি ধং গুরুজী পড়হং;—কিরে পড়বি?' (২)

'পড়ে টড়ে খোকন আমার, ভিরগু তশীলদারের মত জজসাহেবের পাশে কুর্শীতে বসে 'স্সেরী' (দায়রা কোর্টের এসেসর্) করবে। আমার সেসর সাহেব ঘুমুলো; আমার সেসর সাহেব ঘুমিয়েছে। নে বুধনী, চাটাইটা ঝেড়ে একে শুইয়ে দে।'

কিন্তু এত সুখ বুধনীর সইলো না।

সেই যেবার কলস্টর সাহাব জিরানিয়ায় হাওয়াগাড়ী আনলেন প্রথম, (৩) সেইবারই ঢোঁড়াইয়ের বাপ মারা যায়। ঢোঁড়াই তখন বছর দেড়েকের হবে।

শহরে, দেহাতে, তাৎমাটুলিতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে 'তামাম হল্লা'—কলস্টর সাহেব হাওয়াগাড়ী এনেছেন অনেক টাকা দিয়ে। আপনা থেকে চলবে,—'বিলা ঘোড়েকা'—পানিতে আর হাওয়ায় চলবে। আজ প্রথম চলবে হাওয়াগাড়ী। কলস্টর সাহেব যাবেন চাঁদমারীর মাঠে—যেখানে সাহেবরা ফৌজের উর্দী পুরে বন্দুক চালানো শেখে—দমাদ্দম্, দমাদ্দম্। 'বড়া' নিশানা ঠিক কলস্টরের হাতের; তাঁর ধাঙড় মালী বড়কাবুদ্ধ বলে যে, মেমসাহেবের হাতে পেয়ালা রেখে নাকি

গুলি মেরে চুরচুর করে দেয়। চাঁদমারীর মাঠে কাউকে যেতে দেয় না—ওটা পড়ে সাহেব পাড়ায়। কেউ গেলেই আর দেখতে হচ্ছে না; সোজা হিসাব; নও দো, এগারহ (নয় আর দুয়ে এগারো)। একেবারে সিধা ফাটক্।

তাই লোকে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়েছিল কামদাহা রোডের দুপাশে—হাওয়াগাড়ী দেখবার জন্য। ঢোঁড়াইয়ের বাপের হয়েছিল জ্বর ক'দিন থেকে। নিশ্চয়ই পেয়ারা খেয়ে, কেননা সেটা বাতাবিলেবুর সময় নয়। জ্বর কিজন্যে হয়, তা আর তাৎমাদের বলে দিতে হবে না—সবাই জানে, আশ্বিনের পরে জ্বর হয় বাতাবিলেবু খেয়ে, আর আশ্বিনের আগে জ্বর হয় পেয়ারা খেয়ে।

কলস্টর কখন যাবেন চাঁদমারীর মাঠে তা কেউ জানে না। সেইজন্য সকাল থেকে ঢোঁড়াইয়ের বাপ দাঁড়িয়েছিল রোদ্দুরে হাওয়াগাড়ী দেখবার জন্য। ভয় ভয়ও করছিল—'জিনে' (ভূত) কলের ভিতর থেকে গাড়ী চালাচ্ছে সে ভেবে নয়,—অত বোকা সে নয়,—ওসব ছেলেপিলেরা ভাবুক, না হয় দেহাতী ভূতরা ভাবুক—সে ঠিকই জানে যে, হাওয়াগাড়ী চলে পানি আর হাওয়াতে। তবে তার ভয় করছিল যে, গাড়ীটা আবার তার গায়ের উপর এসে না পড়ে,—কলকব্জার কম্ম, বলাতো যায় না।

ঐ আসছে! আসছে!

শব্দ হচ্ছে রেলগাড়ীর মত। কেমন দেখতে কিছুই বোঝা যায় না, কেবল ধুলো! না ধুলো কেন হবে, ধোঁয়া। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার! আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় হঠাৎ হাওয়াগাড়ীর। দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে—প্রথমে অল্প, তারপরে হঠাৎ দাউ দাউ করে। কি হয়ে গেল হাওয়াগাড়ীর! হাওয়া আর পানির গাড়ী আগুন হয়ে গেল। অধিকাংশ লোকই যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। কেউ কেউ আগুনের দিকে এগিয়ে যায়।

জ্বর গায়ে ঢোঁড়াইয়ের বাপ পালাতে আর পারে না।

ধুঁকতে ধুঁকতে হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ী যখন পৌঁছায় তখন ঢোঁড়াই ঘুমুচ্ছে। বুধনী আসছে জল নিয়ে 'ফৌজী ইঁদারা' থেকে। ফৌজের লোকদের কোশী-শিলিগুড়ি রোড দিয়ে মার্চ করে যাওয়ার সময় দরকার লাগবে বলে, এই ইঁদারাগুলো পথের ধারে ধারে বানানো হয়েছিল একসময়ে। আগেই ইঁদারাতলায়

হল্লা হয়ে গিয়েছে যে পানি ছিল না বলে হাওয়া গাড়ী জ্বলেছে। তাই বুধনী হাঁকুপাঁকু করতে করতে এসেছে, খুঁটিয়ে আসল খবর নেওয়ার জন্য 'পুরুখের' (স্বামীর) কাছ থেকে। মাই গে! এ আবার কি! এসে দেখে 'পুরুখ' চাটাইয়ের উপর শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। চোখ দুটো লাল শিমুল ফুলের মত! গা পুড়ে যাচ্ছে। কলসীভরা জল খেতে চায়! খাও আরও পেয়ারা! বাপের কাতরানির চোটে ঢোঁড়াই ওঠে। এদিকে বাপ চেঁচায়, ওদিকে ঢোঁড়াই চেঁচায়। বাপে বেটায় চমৎকার! তারপর কদিন জ্বরে বেহুস। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, 'জড়ীবুটী', টোটকা-টাটকী অনেক হল। কিছুতেই কিছু নয়। জ্বরের ঘোরে 'গজর গজর গজর গজর' কি সব বলে, কখনও বোঝা যায় কখনও বা যায় না। কখনও ঢোঁড়াই, কখনও সেসর সাহেব, কখনও হাওয়াগাড়ী।...কদিন কি টানাপোড়েনই না গিয়েছে বুধনীর। তারপর তো শেষই হয়ে গেল সব।

একটা পয়সা নেই ঘরে। কিছুদিন আগে থেকেই রোজগার বন্ধ ছিল জ্বরের জন্য। বুড়ো মুসুলাল তখন 'মহতো'। সে ছিল মহতোর মত মহতো। পুলিসের হাত থেকে আসামী ছিনিয়ে নেবার তার নাকি 'একতিয়ার' ছিল। সে পঞ্চায়তীর জমা টাকা থেকে এক টাকা দশ আনা খরচ করে, নাপিত, ঘাট, 'কিরিয়াকরম' (ক্রিয়াকর্ম) সব করিয়ে দেয়। দেড় বছরের ঢোঁড়াই মাথা নেড়া করে হাসে, আর গাঁ শুদ্ধ লোকের নেড়া মাথা দেখে, চেনা মুখকেও চিনতে পারে না। বুধনী কপালের মেটে সিঁদুর দিয়ে আঁকা চাঁদটা মুছে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।

অভ্যাস মত মহতো বলে—

ছিতি জল পাবক গগন সমীরা
পঞ্চ রচিত অতি অধম শরীরা ॥ (৪)

ওঠ্ বুধনী। এখানে বসে বসে কাঁদলেই কি চলবে। কোলের ছেলেটার কথাও তো ভাববি?

বুধনী বিধবা ছিল প্রায় বছর দেড়েক। বর্ষা নামলেই শুকনো বকরহাট্টার মাঠ নতুন ঘাসে সবুজ হয়ে যায়। এর পর মাস কয়েক বুধনী ঘাস বিক্রি করে টৌনে। অঘ্রাণে যায় ধান কাটতে পুবে। মাঘ মাসে বুনো কুল, ফাগুন চোতে

শিমূল তুলো, আর কচি আম, বাবুভাইয়াদের বাড়ী বিক্রি করে। এ দিয়ে পেট চালানো বড় শক্ত। অন্য কোন রকম মজুরি করা তাৎমা মেয়েদের বারণ। তার উপর ঢোঁড়াইটাও আবার ভাত খেতে শিখলো, আস্তে আস্তে। দু দুটো পেট চালাতে বড় মেহনৎ করতে হয়।" তাও চলে না।

বাবুভাইয়ারা আনাগোনা আরম্ভ করেন; বাবুলাল ঘোরাঘুরি করে তার বাড়ীতে। পাড়াপড়শী, 'নায়েব' 'মহতো' সবাই খোঁটা দেয়—মেয়েমানুষ আবাব বিধবা থাকবে কি!

বুধনীও ভাবে, যদি অন্যের পয়সাই নিতে হয়, তবে বয়স থাকতে.তাকে বিয়ে করাই ভাল। তার বয়সও ছিল, আর 'সিন্দুর লাগানোর' (৫) শখ যে ছিল না তা নয়। বাবুলালটা আবার এরই মধ্যে ডিষ্টিবোর্ডে ভাইচেরমেন সাহেবের চাপরাসীর কাজ পেয়ে গেল। লোকটা বড় হিসেবী। সে নিজের বিড়িতে একসঙ্গে দুটোর বেশী টান দেয় না। তারপর নিবিয়ে কানে গুঁজে রাখে। বুধনীকে সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু তিন বছরের ঢোঁড়াইয়ের ভার নিতে চায় না। "চুমৌনা" (৬) করতে ইচ্ছে হয় কর, না করতে ইচ্ছে হয় করো না; তা বলে পরের ছেলের ভার নিচ্ছি না।

অনেকদিন গড়িমসি করবার পর বুধনী মন ঠিক করে ফেলে।

একদিন সকাল বেলায় গোঁসাইথানে বৌকাবাওয়ার পায়ের কাছে ছেলেটাকে ধপ্ করে নামায়। কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে নিজের দুঃখের কথা বলে। তারপর ঢোঁড়াইকে ঐখানে রেখেই বাবুলালের বাড়ী চলে যায়। ঢোঁড়াই তখন আঙুল-চোষা ভুলে বাওয়ার ত্রিশূলটা নিয়ে খেলা করছে। বাওয়া দেখে যে তার গভীর নাভিকুণ্ডের উপর তিনটে রেখা পড়েছে, ঠিক বালক শ্রীরামচন্দ্রজীর যেমন ছিল (৭)।

টীকা :—

(১) তেজ—বুদ্ধিমান।

(২) পড়া আরম্ভ করার সময়, এদেশের ছেলেদের 'ওম্ নমস সিদ্ধং' বলে আরম্ভ করতে হয়। ছেলেরা তার মানে বোঝে না। তারা বিকৃতভাবে কথাটা উচ্চারণ করে 'ওনামাসি ধং, গুরুজী পড়হং' বলে পণ্ডিতমশায়কে চটায়।

(৩) কলেক্টরের নাম ছিল কিলবি সাহেব—১৯১৩ সালের কথা।

(৪) মাটি জল আগুন আকাশ বাতাস—এই দিয়েই নশ্বর দেহ রচিত।

(৫) সিন্দুর লাগানোর—বিয়ে করবার।

(৬) চুমৌনা—সাঙ্গা।

(৭) "কটি কিঙ্কিনী উদর ত্রয় রেখা।
নাভি গঁভীর জান জিন্হ দেখা।"—

তুলসীদাস : বালকাণ্ড।

বস্ত্রলাভের উপাখ্যান

বুধনীকে বৌকা বাওয়া দোষ দেয়নি, পাড়ার লোকেও দেয়নি। করতই বা কি বেচারী। বিয়ে বিধবাকে করতেই হবে—যদি ছেলেপিলে হবার বয়স না গিয়ে থাকে! রইল—ছেলের কথা। এখন বাবুলাল খাওয়াতে রাজী না, তা বুধনী কি করবে।

মাকে ছেড়ে ছেলেটা কান্নাকাটি বিশেষ করেনি। প্রথম প্রথম যখন তখন মার কাছে পালিয়ে যেত। বাবুলাল বাড়িতে থাকলে বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন বুধনী কোলে করে ঢোঁড়াইকে 'থানে' পৌছে দিয়ে যায়। দিনকয়েকের মধ্যে ছেলেটা বুঝে গেল যে, দুপুর বেলায় বাবুলাল থাকে না বাড়িতে। কিন্তু এই দুপুর বেলায় বুধনীর কাছে যাওয়ার অভ্যাসও দু-তিন মাসের মধ্যে আস্তে আস্তে কেটে যায়। ও যে ওখানে অবাঞ্ছিত, সেটা বুঝে, না বন্ধুদের সঙ্গে খেলার টানে, বলা শক্ত।

ছেলেটা কান্নাকাটি করে না, তবে দিন দিন রোগা হয়ে যায়। বাওয়া ব্যস্ত হয়ে ওঠে—দিব্যি দামাল ছেলে ছিল।

একজন পশ্চিমা ফৌজের লোক বহুদিন আগে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে না পেন্সন নিয়ে, জিরানিয়ার বাজারে একটা রামজীর মন্দির বানিয়েছিলেন। সে যুগে তাঁকে লোকে বলতো 'মিলিট্রি বাওয়া।' তাঁর একটা পোষা চিতাবাঘ ছিল। তারই হাতে নাকি 'মিলিট্রি বাওয়া'র প্রাণ যায়। মন্দিরের উঠোনে

তাঁর বাঁধানো সমাধিস্থান আছে। আর এই মন্দিরের নাম হয়ে যায় 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ি'।

বৌকা বাওয়া রোজ যেত 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে'—নামে রামায়ণ শুনতে, আসলে গাঁজা খেতে।

বাওয়া দেখে যে, ঢোঁড়াই রোগা হয়ে যাচ্ছে; পাঁজরার হাড়গুলো গোণা যাচ্ছে, এই মায়ে-খেদানো বাপমরা ছেলেটির। রামজীই পাঠিয়ে দিয়েছেন তার কাছে—এখন তাঁর মনে কি আছে, কে জানে। রোগটা জানা রোগ; সবাই জানে যে, ছেলেটার হয়েছে 'বাই-উখড়ানোর' (১) রোগ। এ-রোগে পাতা, শিকড়ে কিছু উপকার হয় না, তবে দুধে হয়। দুধ তো বাবু-ভাইয়াদের জন্য। তারা 'রাজা লোগ'। 'পরমাৎমা' তাদের দুধ খাবার সামর্থ্য দিয়েছেন। তবে 'বাই-উখড়োলে' শুষনির শাকটাও বেশ উপকার করে—ভাত আর শুষনির শাক দুবেলা; না হয় শুষনির শাক, আর কাঁচা চিড়ে না ভিজিয়ে। মুড়ি খবরদার না—পেট খারাপ করে মুড়ি, আর ঘর খারাপ করে বুড়ী…

ভাবতে ভাবতে বাওয়ার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে; ঢোঁড়াইটাকে একটু দুধ-টুধ খাওয়াবার এক উপায় করে দেখলে হয়।

সে ঢোঁড়াইকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে'। এক মিনিটের মধ্যে ঢোঁড়াই মোহন্তজীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিল। ল্যাংটা ঢোঁড়াইকে চিমটেটা দেখিয়ে মোহন্তজী বলেন, খবদ্দার 'পিসাব' (২) করো না এখানে। ওই হাড়-জিলজিলে ছোঁড়া, কোথায় একটু ভয় পাবে, তা-না খলখল করে হাসে। সেই দিন থেকেই রামায়ণ শুনলেই ঢোঁড়াইয়ের 'পাক্কা প্রসাদী' (ভোগের প্রসাদ) মঞ্জুর হয়ে যায়। এইতেই 'বাই-উখড়োনোর' অসুখের হাত থেকে ছোঁড়াটার জান বেঁচে যায়।

না, না, এতে বাওয়ার কিছু কৃতিত্ব নেই। যিনি পাঠিয়েছিলেন ঢোঁড়াইকে তার কাছে, তিনিই ছেলেটাকে প্রসাদ দিচ্ছেন। তাঁরই কৃপাতে এ-ছেলে বেঁচে-বর্তে থাকলে সে বাওয়ার উপযুক্ত চেলা হবে। আবছা স্বপ্নরাজ্য বাওয়ার চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে…গোঁসাইথানে প্রকাণ্ড মন্দির হয়েছে …..মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির চাইতেও বড়, বড় নৈবেদ্যর থালায় মন্দিরের মত করে চিনি আর স্তুপাকার করে

পেঁড়া সাজানো। ঢোঁড়াইকে ঐ থানের 'পূজারী' করে, না পূজারী কেন হবে, মোহন্তের "চাদর" (৩) দিয়ে, সে চলে গিয়েছে অযোধ্যাজী ·····

"করউ কাহ মুখ এক প্রশংসা" (৪) ···মাত্র একটা মুখ, তাও কথা বলতে পারি না।···তাদিয়ে তোমার আর কতটুকু প্রশংসা করতে পারি রামজী!

তোমার কৃপা না হ'লে যেদিন মোহন্তজী সরকারকে লড়ায়ে জেতাবার জন্য যুজ্ঞ করলেন মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ীতে, সেদিন ঢোঁড়াইকে নিজে সামনে বসে পুরী হালুয়া খাওয়ালেন—যত খেতে পারে। সে কি হালুয়া! ঘিতে জবজব জবজব। যত না ঘি আগুনে ঢালা হয়েছিল তার চাইতেও বোধহয় বেশী ঢালা হয়েছিল হালুয়ার প্রসাদে। চারিদিক থেকে সকলে ঢোঁড়াইয়ের খাওয়া দেখছে; ঢোঁড়াইয়ের কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। মোহন্তজী ঢোঁড়াইয়ের পাতের একখানা পুরী দেখিয়ে বৌকা বাওয়াকে বুঝোন যে, পুরীর মোটা দিকটা, এমন কড়া করে কোথাও ভাজে না, কোন ভোজে না। এ হচ্ছে সীতারামের খাওয়ার জন্যে, এতে কি ফাঁকি দেওয়া চলে।

তারপর মোহন্তজী বাওয়াকেও কড়া পুরীর প্রসাদ চাখানোর জন্য, বড় চেলাকে হুকুম দেন।

ঢোঁড়াই আর বাঁওয়ার চোখোচোখি হয়। বাওয়ার মনে হয় যে, ঐ একরত্তি ছোঁড়াটা যেন বুঝছে যে, বাওয়া যে পুরী পেল খেতে, সেটা মোহন্তজীর সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের এত আলাপ সেই জন্যে।······

হয়ত এটা বাওয়ার ভুল; কিন্তু সেদিন বাড়ী ফিরবার সময়, মোহন্তজী যখন বাওয়াকে একখানা কাপড় দিলেন, ছিঁড়ে লেঙ্গট আর গামছা করবার জন্য, তখন ঢোঁড়াইয়ের কি কান্না! কাপড়খানা যেন তারই পাওয়ার কথা ছিল।

এস, ডি, ও সাহেব এসেছিলেন যজ্ঞ দেখতে সকাল বেলায়। তিনিই খুশী হয়ে মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ীতে যজ্ঞের জন্য তিনজোড়া "লাট্টুমার রৈলী" অর্থাৎ লাট্টু মার্কা র‍্যালিব্রাদার্সের কাপড়, "সরকারী খাজানা" (৫) থেকে দেন। তারই একখানা মহন্তজী বাওয়াকে দিয়েছিল।

ঢোঁড়াইয়ের কান্না আর থামে না। বাওয়া বুঝোয় তোর জন্যেই তো নিয়ে যাচ্ছি, তোকেইতো দিয়েছেন মোহন্তজী।

না আমি আর কোন দিন যাবনা রামায়ণ শুনতে। আমাকে দিলে বড় কাপড় দেবে কেন?

বাবুলাল ঐ কাপড় দেখে বলে, বাওয়া তুমি পরতো লেঙ্গট। তুমি এ পাড়ওয়ালা কাপড় নিয়ে করবে কি।. সরকারী "গিরানির" (৬) দোকান আছে না, যেখান থেকে হাকিম, বাঙ্গালী বাবু আর চাপরাসীদের সস্তায় কাপড় চাল দেয়, সেখান থেকে আমি পেয়েছি খুব ভাল মার্কিন, "জাপৈনী" (জাপানী) আট আনা করে, পাঁচ-শ পঞ্চান্ন নম্বর থেকেও ভাল জিনিস। পাঁচ গজ তাই দিচ্ছি তোমাকে—এ ধুতি আমাকে দাও।

বাওয়াও খুশী। তা'না হ'লে অতবড় কাপড় কি ঢোঁড়াই পরতে পারে।

এই মার্কিন ছিঁড়ে ঢোঁড়াইয়ের প্রথম কাপড় হ'লো। লেঙ্গট ছাড়া, চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সে এই কাপড়খানাই দেখেছে।

বাওয়া আবার কাপড়খানা নিয়ে যায় পাক্কীর ধারের কপিল রাজার বাড়ীতে। কুলের ডালের পোকা থেকে গালার ঘুঁটে তোয়ের করে চালান দিত কপিল রাজা। তার উঠনের গামলায় থাকে লাল রং গোলা। তাই দিয়ে বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের ধুতি রং করে দেয়।

এই ধুতি কোনো রকমে কোমরে বেঁধে ঢোঁড়াই পাড়াশুদ্ধ সকলকে দেখিয়ে আসে—মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ীর মোহন্তজী দিয়েছে তাকে। কেউ বুঝুক আর নাই বুঝুক, সে সকলকে বোঝাতে চায় যে, মোহন্তজী এ কাপড় বাওয়াকে দেয়নি। পাঁচ বছরতো বয়স হবে, কিন্তু তখনই সে কারও কাছে ছোট হতে চায় না—বাওয়ার কাছে পর্যন্ত না। তবে বাবুভাইয়ারা "বড় আদমী," তাদের দেখলেই আদাব করতে হবে; আর সাহেব দেখলে কাছাকাছি থাকতে নেই, এ তাৎমাটুলির সব ছেলেই জানে। ওর মধ্যে ছোট হওয়ার প্রশ্ন নেই।

ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছে যে কাপড়খানা পরে থাকে,—তার কোন বন্ধুর কাপড় নেই, ঐ কাপড়খানা দেখিয়ে তাদের চেয়ে একটু বড় হয়, কিন্তু বাওয়া কিছুতেই তাকে কাপড়খানা পরতে দেবে না; তুলে রেখে দেবে। লাল কাপড় পরে ভিক্ষে চাইতে গেলে লোকে এক মুঠিও চাল দেবে না। ও কাপড় পরে দেখতে যেতে হয় তামাসা, মেলা, মোহরমের দুলদুল্ ঘোড়া। তবুও হারামজাদা ছেলেটা

মুখ গোঁজ করে বসে থাকবে! ঢোঁড়াইকে ভয় দেখানোর জন্য বাওয়া চিমটে ওঠায়।

টীকা :—

(১) বাই-উখড়ানোর রোগ—স্নায়ু উপদ্রোবার রোগ। যে কোন অনিশ্চিত রোগকে এখানকার অশিক্ষিত লোকেরা বলে 'বাই উখড়োনোর' ব্যারাম।

(২) পিসাব—প্রস্রাব।

(৩) মহত্ত্ব পদের নিদর্শন।

(৪) "একটি মাত্র মুখ দিয়ে তোমার আর কতটুকু প্রশংসা করতে পারি"?—তুলসীদাস হইতে

(৫) গভর্ণমেণ্ট কাণ্ড

(৬) গিরানির দোকানে—গিরানির অর্থ আক্রা। গভর্ণমেণ্ট-ষ্টোর। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সস্তায় কাপড় দেওয়া হত সেখান থেকে। সকলে পেতো না এ কাপড়।

ঢোঁড়াইয়ের মায়ের সন্তানবাৎসল্যের বিবরণ.

ছোঁড়াটা বুধনীর কাছে যেতে চায় না, এর জন্য বাওয়া বুধনীকে দোষ দেয় না। বাওয়া যতদূর জানে বুধনী কোন দিন ঢোঁড়াইকে হতশ্রদ্ধা করেনি। করবে কি করে, নিজে পেটে ধরেছে যে। আর একটা 'চুমৌনা' করেছে বলে কি নিজের নাড়ীর সম্বন্ধটা ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিতে পারে। তা হয় না, তা হয় না। রামজী তেমন করে মানুষ গড়েননি। সময়ে অসময়ে বুধনী ঢোঁড়াইয়ের জন্য করেছে বইকি।

—ঐ যখন 'জার্মানবালা' রথ তারা হয়ে রাতের আকাশে ছুটে যেত;—সে রথ কোথায় নামে, কি করে, কেউ বলতে পারে না; বাওয়া অবশ্য সে রথ দেখেনি তবে তার চাকার কালো দাগ কচুর পাতার উপর তাৎমাটুলির সবাই দেখেছে; সেই সময় বুধনী কতদিন বাবুলালকে লুকিয়ে ঢোঁড়াইকে ভাত খাইয়েছে। তখন চালের দাম উঠেছে দু আনায় আধ সের। ঐ আক্রাগণ্ডার দিনে ভিক্ষে আর দিত কজন,—সে সাধুকেই হোক আর সন্তকেই হোক। তখন 'অফসর আদমী'দের সরকারী দোকান থেকে সস্তায় চাল দিত।

বাবুলালের বাড়ীতে সেই জন্যে চালের অভাব ছিল না। তখন যদি বুধনী ঢোঁড়াইকে লুকিয়ে চুরিয়ে না খেতে দিত, তা হলে সাধ্যি কি বাওয়ার, সে সময় ঐ ছেলে মানুষ করার। সে সময় অতটুকু ছেলে রামায়ণের চৌপই গেয়ে 'ভিখ মাঙ্গলেও' টৌনের কোনো গেরস্থ উপুড়হস্ত করতো না।

আর কেবল খাওয়ানো কেন, ঢোঁড়াইয়ের উপর বুধনীর প্রাণের টান বাওয়া আরও একদিন দেখেছে। মিছে বলবে না। পাড়ার মেয়েরা যে যা বলুক। বাওয়া নিজের চোখে সাক্ষী, আর সাক্ষী ভূপলাল 'সোনার' (১)। ভূপলাল সোনারের নাও মনে থাকতে পারে, সে রাজা আদমী, তার 'গাহকীর ভরমার' (২)। ঢোঁড়াই তখন পাঁচ ছ সালের (বছরের) হবে। বাবুলাল গিয়েছে ভাইচেরমেন সাহেবের সঙ্গে দেহাতে, দিন কয়েকের জন্য। বুধনীর তখন দুখিয়া পেটে। এমনি তো বাবুলাল বৌকে বাড়ীর বাইরে কাজ করতে দেয় না; 'ইজ্জৎবালা আদমী' (৩) সে। তাই বুধনী সেই ফাঁকে সাত আনা পয়সা রোজগার করেছিল। লগা দিয়ে শিমুল ফল পেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ফাটিয়ে, সেই ভিজে শিমুল তুলো বেচেছিল 'কিরাণী বাবুর জনানার' (৪) কাছে। 'কিরাণীবাবু' বাবুলালের অফিসের মালিক। বুধনীর ভারি ইচ্ছে ঢোঁড়াইকে 'চাঁদির জেবর' (৫) দেয়—কোনো দিনতো কিছু দেয়নি। বুধনী বাওয়াকে বলে, দাও বাওয়া একটা চাঁদির সিকি কিনে ভূপলাল সেকরার দোকান থেকে ঢোঁড়াইয়ের ঘুনসিতে দেবার জন্য। বাওয়ার ভারি আনন্দ হয় কথাটা শুনে! একটু ভয় ভয়ও করে, চাঁদির ঘুন্সিটা লেঙ্গটের তলায় ঢেকে রাখতে হবে ঢোঁড়াইয়ের, না হলে ভিক্ষে জুটবে না। বাওয়ার সেদিনকার কথা সব মনে আছে,—তার ঢোঁড়াই গয়না পানে, আর তার মনে থাকবে না সেদিনকার কথা। সেদিন বাওয়া আর ঢোঁড়াই মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ী থেকে রামায়ণ সেরে, যখন ভূপলাল সোনারের দোকানে আসে, তখন বুধনী সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। অত লোকের মধ্যে ঢোঁড়াইকে কোলে টেনে নিয়েছিল, সেদিন সেকরার সঙ্গে কথা বলার সময়। সেকরার দোকানের সিঁড়ির উপর বুধনী ওকে একটা বিড়িও ধরিয়ে দিয়েছিল। ও ছোঁড়া তখনও কাশে। ভূপলাল সোনারতো শুনেই আগুন। ভারী আদমি (বড়লোক)—তার কথার ঝাঁঝ থাকবে না? সে বলে সিকির দামইতো হ'ল

আট আনা—তার উপর শালা পুলিসদের নজর বাঁচিয়ে দিতে হবে। বুধনী ভয় পেয়ে বলে যে ঘুনসি করলে যদি পুলিসে ধরে, তবে অন্য একটা কিছু করে দাও সিকি দিয়ে। ভূপলাল হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—'জাহিল আওরৎ,' (৬) কিছু বুঝবে না কথাটা, আর করে দাও করে দাও। আমার কাছে সোজা কথা, সাত আনায় হবে না। সিকির উপর আবার ছেঁদা করার মেহনতানা আছে।

সে অন্য খদ্দেরের সঙ্গে কথা আরম্ভ করে। তখন আর কি করা যায়। বাওয়া বুধনীকে নিয়ে যায় 'ছত্তিস' বাবুর দোকানে সওদা করাতে। ঐ পুরো সাত আনা খরচ করে বুধনী সেখান থেকে কেনে "কজরৌটী" (৭)—পেটের ছেলের জন্য। এর দেড় দুমাস পরে ঢুখিয়া আসে ওর কোলে। বাওয়ার সেদিন কি দুঃখই হয়েছিল। অমন একটা গয়না ছেলেটা পেতে পেতে পেল না। রাগ করবে সে কার উপর। ভূপলাল সোনারও অন্যায় কিছু বলেনি। বুধনীকেই বা কি বলা যায়। দেড় মাস পরই কাজললতাটার দরকার; ওর নিজের কামানো পয়সা; আর মায়ের মনের শখ। ভূপলাল দিলে কি আর ও ঘুন্সির চাঁদি কিনতো না।

ঢোঁড়াইটারও সেই সময় যেন একটু চোখ ছলছল ছলছল করেছিল;—ও ছোঁড়া কাঁদতে তো জানে না।

বুধনী লোভে পড়ে আর ঝোঁকের মাথায় কাজললতাটা কিনবার পর, নিজেকে একটু দোষী দোষী মনে করে। ভাবে যে ঢোঁড়াই আর বাওয়ার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে সে। তার পেটের ছেলের জন্য কাজললতা, বাবুলাল নিশ্চয়ই কিনে দিত। তবে নিজের রোজগার করা পয়সা ও-কাজে খরচ করার দরকার কি ছিল।

আসলে ঢোঁড়াইয়ের উপর টান তার একটু কমেছে। ঢোঁড়াই ঠিকই ধরেছে—ছোট ছেলেপিলের মত এ জিনিস বুঝতে আর কেউ পারে না।

তাই মধ্যে মধ্যে বুধনী ঢোঁড়াইকে আর বিশেষ করে বাওয়াকে জানিয়ে দিতে চায়, যে তার ছেলের উপর ভালবাসা একটুও কমেনি—যেটুকু কম লোকে দেখে, তা বাবুলালের ভয়ে। এইটা জানানোর জন্যই বুধনী বাওয়াকে নিয়ে গিয়েছিল ভূপলাল সোনারের দোকানে।

নিজের দোষ কাটানোর জন্যেই না কি সে দিনকয়েকের মধ্যেই ঢোঁড়াইকে ডেকে পেট ভরে মেঠাই খাওয়ায়—একেবারে হঠাৎ। ভাইচেরমেন সাহেব ডিস্টিবোডে লড়াই থামবার জন্য ভোজ আর দেওয়ালী করেছিলেন। সেদিন মশার ছবির তামাসা দেখিয়েছিল সেখানে। সারা দেওয়াল জোড়া অত বড় বড় কখনও মশা হয়? "ভাগ!" ওসব দেহাতীদের বোঝাস। কিরাণীবাবু মোচ মুড়িয়ে 'কিষণজীভগবান' (৮) সেজেছিলেন। সে দেখলে প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়। কলস্টর সাহেব—তাকে ওখানে বলে চেরমেন সাহেব—(৯) তিনি পর্যন্ত দেখেছিলেন। ভাইচেরমেন সাহেব তাঁকে "নাটক" বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সেইদিন বাবুলাল বাড়ী আসবার সময় ভাইচেরমেন সাহেবের চিঠি রাখবার যে বেতের ঝুড়ি আছে, তাইতে করে এক ঝুড়ি ভরে কত রং বেরঙের মেঠাই এনেছিল। বুধনী সে সবের নামও জানে না। জানতে চায়ও না। তার বরাতটাই অমনি। সেবার 'দরবারের' তামাসার সময় ও ছিল আঁতুড়ে; আবার, এবার যুদ্ধ থামবার তামাসার সময়ও আঁতুড়ে। আঁতুড়েতো মেয়েছেলেদের মিষ্টি খেতে নেই, তা' এত মিষ্টি কি হবে। তাই ও নিজেই বাবুলালকে বলে, ঢোঁড়াইকে ডেকে নিয়ে আসতে। বাবুলালেরও মনটা খুশী ছিল—ছেলে হয়েছে নতুন। একটা দমকা উদারতার ঝোঁকে সে একখানা প্রকাণ্ড কচুরপাতা ভরে ঢোঁড়াইকে খাবার সাজিয়ে দেয়। বলে—"বাওয়া যে গলায় তুলসীর মালা দেওয়া "ভকত"। না হ'লেতো তাকেও খাওয়াতাম।"

বুধনী নতুন খোকাকে কোলে নিয়ে মাচার উপর বসে ছিল। সে বাবুলালকে বলে—তুমি একটু বাইরে বেরিয়ে এসো, তোমার সামনে ঢোঁড়াই খেতে পাচ্ছে না।

"লজ্জা আবার কিসের" বলে একটু বিরক্ত হয়ে বাবুলাল চলে যায়।

ঢোঁড়াইয়ের খাওয়া হলে বুধনী ঢোঁড়াইকে কাছে ডাকে, একটু আদর করবার জন্য। অতটুকু কচি ছেলে কোলে নিয়ে উঠেতো আর আসতে পারে না।

ঢোঁড়াই গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্য দিকে তাকিয়ে। তার একটুও ভাল লাগে না এই লাল খোকাটাকে, আর তার মা' টাকে; বাওয়ার কাছে

চলে যেতে ইচ্ছে করে। তার চোখ ফেটে কান্না আসবে বোধহয়। রাম রাম! সে কোন কথা না বলে দৌড়ে পালিয়ে যায় 'থানের' দিকে।

টীকা:—

(১) সোনার—সেকরা।

(২) গাহকীর ভরমার—দোকান খদ্দেরে ভরা।

(৩) ইজ্জৎবালা আদমী—সম্মানিত লোক।

(৪) কেরানীবাবুর স্ত্রী।

(৫) চাঁদীর জেবর—রূপোর গয়না।

(৬) জাহিল আওরৎ—নিরক্ষর স্ত্রীলোক।

(৭) কজরৌটি—কাজললতা।

(৮) কেষ্ট ঠাকুর।

(৯) তখন বেসরকারী লোক জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে পারিতেন না।

রেবণ গুণীর কৃপায় ঢোঁড়াইয়ের পুনর্জীবন লাভ

ঢুখিয়া হওয়ার পর থেকে বুধনী হয়ে যায় ঢুখিয়ার মা। পাড়ার সবাই তাকে ঐ নামেই ডাকতে আরম্ভ করে। আর সত্যি সত্যিই এর পর থেকে, ঢোঁড়াইয়ের কথা তার খুব কম সময়ই মনে পড়ে। একে ঢোঁড়াই মার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতে চায়, আর এদিকে ঢুখিয়ার মারও সংসারের নানান লেঠা। ঢুখিয়ার মার ছোট্ট মনের প্রায় সমস্ত জায়গাটুকুই জুড়ে থাকে ঢুখিয়া। এ সোজা কথাটা বাওয়াও মর্মে মর্মে বোঝে, আর সেই জন্যই আজ দরকারে পড়েও তাকে ডাকতে ইতস্ততঃ করছিল।

সেবার মাসখানেক থেকে তাৎমাটুলিতে চড়াইপাখী দেখা যাচ্ছে না। সবাই বলাবলি করে যে একটা বড় অসুখ শীগ্‌গিরই আসছে। তার উপর বাড়ীতে নম্বর দিয়ে লোক গুণে গিয়েছে (১)। সকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তারপর যা ভাবা গিয়েছিল তাই। জিরানিয়ায়, তাৎমাটুলিতে, ধাঙরটুলিতে, কি অসুখ! কি অসুখ! 'বাই উখড়োনোর' ব্যারাম,—বেহুঁস জ্বর—'ঝট্‌সে বিমার, পট্‌সে খতম' (২)।

কপিল রাজার বাড়ীশুদ্ধ সবাই উজাড় হয়ে যায় এই রোগে সেইবার। হবে না! বকড়হাট্টার মাঠের সব শিমূল গাছ সে কাটিয়েছিল, লা চালান দেওয়ার বাক্স তৈরী করার জন্য। শিমূল তূলো যে তাৎমানীদের রুজী সে কথা একবার ভাবলো না। কাটাচ্ছিলেন ওই নিরেট ধাঙ্গরগুলোকে দিয়ে। আহাম্মকগুলো বোঝে না যে ধাঙ্গরাণীদেরও শিমূল তূলো বেচে কিছু রোজগার হয়। সেই তো নির্বংশ হয়ে গেলি কপিলরাজা, কিন্তু যাওয়ার আগে "ঝোটাহাদের" রোজগার মেরে রেখে গেলি। থাকগে, সে যাদের স্ত্রী মেয়ে আছে তারা ভাবুককে যাক। কিন্তু তারতো সম্বল ঐ একমাত্র ঢোঁড়াই।

সকালে ঢোঁড়াই ঘুম থেকে ওঠেনি। মিলিটি ঠাকুরবাড়ীতে রামায়ণ শুনতে যাওয়ার সময় হ'ল তবুও ওঠে না। বাওয়া ত্রিশূল দিয়ে খোঁচা মারে। হল কি ছোঁড়ার। বাওয়ার মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কপিল রাজার বাড়ী থেকে একটার পর একটা 'মুর্দা' বের করেছে—পরপর চারটে। ঝুন্নুলাল নাহতো খতম হয়ে গিয়েছে গত সপ্তাহে।......

গায়ে হাত দিয়ে দেখতে ভয় ভয় করে। গায়ে হাত দিয়ে দেখে যা ভেবেছে তাই। ও ঢোঁড়াই কথা বল্—চুপ করে কেন? ভিক্ষেয় বেরুনো, রামায়ণ শুনতে যাওয়া মাথায় চড়ে। এ কি করলে রামজী, আমার! এ রোগে তো ভাববার পর্যন্ত সময় দেয় না। দুখিয়ার মাকে খবর দেবো কিনা, ডাকা উচিত হবে কিনা সেই কথাই বাওয়া ভাবছে। দুখিয়ার মাতো মনে হয় একেবারে ধুয়ে-মুছে ফেলে দিয়েছে ঢোঁড়াইকে মন থেকে। এক বছরের মধ্যে একটি দিন খোঁজ করেনি। বাওয়া ভেবে কূল-কিনারা পায় না।

শেষ পর্যন্ত গিয়ে খবরই দেয়। তার পেটের ছেলে, কিছু একটা ঘটে গেলে, হয়ত সারাজীবন দুঃখ থেকে যাবে। আসতে ইচ্ছে হয় আসবে, মন না চায় আসবে না। বাওয়া নিজের কর্তব্য করবে না কেন।

খবর দিতেই দুখিয়ার মা আঁতকে ওঠে। দুখিয়াকে বাবুলালের কোলে ফেলে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে আসে। আর লেন সেমাঝুমই না। পুরোনো বুধনী ফিরে এসেছে যেন। বাবুলাল পিছন থেকে হাঁ হাঁ করে। কে কার কথা শোনে। গোঁসাই নেমে এলেও তার পথ আটকাতে পারতেন না তখন। এসেই

ওই নেতিয়ে পড়া ছেলেকে কোলে তুলে নেয়। ঢোঁড়াই তখন বেশ বড়—বছর আষ্টেক বয়স হবে। ওই বুড়ো-ধাড়ী ছেলেকে, কোলে নিয়ে ছোটে রেবণগুণীর বাড়ীর দিকে। ওর গায়ে তখন মহাবীরজী তাকৎ জুটোচ্ছেন। বাওয়া তো গুণীর বাড়ী যেতে পারে না; গেলে, লোকে সে সন্ন্যাসীকে মানে না। তাই সে খানিকদূর সাথে সাথে গিয়ে পথের ধারে এক জায়গায় বসে পড়ে। সেখানে গিয়ে ঢুখিয়ার মা ঝাড়ফুঁকের কথা তুলতেই, রেবণগুণী ফুঁ দিয়ে তামাক ধরাতে ধরাতে বলে,—তুইতো বাসি পেটে আসিসনি।

ঢুখিয়ার মা হকচকিয়ে যায়। সকালে কি খেয়েছে মনে করতে চেষ্টা করে। গুণী যখন বলেছে নিশ্চয়ই কিছু খেয়ে থাকবে। ওমা, সত্যিইতো! খয়নিতো সে খেয়েছে। ঐ যে তখন, বাবুলাল ডলে নিজে খাওয়ার সময় তাকেও একটু দিয়েছিল। উৎকণ্ঠার জায়গায়—ভয়ের ছাপ পড়ে তার মুখে। রেবণগুণীতো চটে লাল। এই মারে তো এই মারে! তুই বুড়ো মাগী, জিন্দিগি গেল ছেলে বিইয়ে। সাতকাল তাৎমাটুলিতে কাটিয়ে তুই জানিস না ঝাড়ফুঁক করতে আসতে হলে খালি পেটে আসতে হয়, ভোর বেলাতে আসতে হয়।

রেবণগুণীর নামে পাড়ার লোকে কাঁপে। তাৎমাটুলির আইবুড়ো মেয়েরা তাকে দূর থেকে দেখলে পালায়। মায়েদেরও মেয়েদের উপর সেই রকমই হুকুম। একতো তুকতাকের ভয়; তার উপর থাকে চাব্বিশ ঘণ্টা নেশা করে। পরপর ছটা বিয়ে করেছে, এখনও ছুটোকে নিয়ে ঘর করে। গোসাইথানে যেদিন ভেড়া বলি হয়, সেদিন প্রতি বছর তার উপর গোঁসাই ভর করেন। সেই সময় সে ভেড়ার রক্ত কাঁচা খায়; মুখে গায়ে ভেড়ার রক্ত মেখে, সে হুঙ্কার ছাড়ে। সে কি আর করে? তার মধ্যে দিয়ে গোঁসাই কথা বলেন। তার হাতের বেতের ঘেরটা দিয়ে ছুঁয়ে সে যাকে যা বলবে, তা ফলবেই ফলবে। কুমারী মেয়েরা সে সময় পালায় সেখান থেকে। পাঁচবার সে একটা একটা মেয়েকে ছুঁয়ে, তার সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছে। কোনও মা বাবার সাধ্যি নেই যে, সেই সময়কার গোঁসাইয়ের কথার নড়চড় হতে দেয়।

পথে আসবার সময়ই ঢুখিয়ার মার এসব কথা মনে হচ্ছিল। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ঢোঁড়াইটাকে বাঁচাতে হ'লে ঐ গুণী ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক

নেই। চৌনের হাসপাতালে গেলে কোন লোক আর বাড়ী ফিরেই আসে না। কপিলরাজাতো "বাংগালী ডকটর" দিয়েও দেখিয়েছিল। কিছু কি হল?

রেবণগুণী গালাগালি দিয়ে চলেছে ঢুখিয়ার মাকে। "ভরা দুপুরে কি মন্তরের ধক থাকে নাকি? বেরো শীগগির এখান থেকে।" ঢুখিয়ার মা গুণীর পা জড়িয়ে ধরে, ডুকরে কাঁদে।—এটার বাবা নেই গুণী। তুমি একে পায়ে ঠেলো না।

গুণীর মেজাজ বোধহয় গলে। বলে, কালইতো শনিবার। কাল আসিস। কালতো আবার হাড়তাল না কি বলে, ওই কি একটা নতুন হয়েছে না আজকাল, —গত বছরেও হয়েছিল একবার —দিনের বেলা সওদা মিলবে না, সাঁঝের পরে দোকান খুলবে, কাল আবার তাই আছে। সাঁঝের পর দোকান খুললে পান সুপারি কিনে নিয়ে রাতে আসিস। 'সিন্দুর'তো তোর আছেই। 'ভানমতীর' (৩) দয়ায় সেরে যাবে এই বদমাসটা। বলে ঠোঁটের কোণে হাসি এনে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়।

ঢুখিয়ার মার মনটা একটু হাল্কা হয়ে ওঠে। রেবণগুণীর মন তা হলে গলেছে। সে বলেছে সেরে যাবে, তার দুশ্চিন্তা অর্ধেক দূর হয়ে যায়। কিন্তু কাল রাত্তির পর্যন্ত দেরী করা কি ঠিক হবে? চিকিৎসা আরম্ভ করতে তার সবুর সয়না। কালই কি আবার ঐ কি যে বলে ছাই, 'হাড়তাল' না কি না হলেই হতোনা। দুনিয়ার সকলের আক্রোশ কি তারই উপর? এখানে আসবার আগে রেবণগুণীকে যতটা ভয় ভয় করছিল, এখন কথাবার্তা বলার পর ততটা ভয় করে না।

সাহসে বুক বেঁধে গুণীকে জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা, আজকে পান সুপারি কিনে, কাল সকালে এলে হয়না—শনিবার আছে······"

"যা বললাম তাই কর"—চীৎকার করে ওঠে গুণী, "তোর বুদ্ধিতে আমি চলব, না আমার বুদ্ধিতে তুই চলবি?"

ঢুখিয়ার মা ভয়ে কাঁপে—গুণীর মুখের উপর কথা বলা তার অন্যায়ই হয়েছে।

গুণী একটু নরম স্বরে বলে "আজকের কেনা পান সুপুরিতে মন্তর ধরবে না। আর ছেলেকে আনবার দরকার নেই। এখান থেকেই কাজ হয়ে যাবে। তুই

একা এলেই চলবে। আজকের রাতে শোবার সময় ছেলেটার চোখে ধোঁদলের ফুলের রস দিয়ে দিস। আর মরণাধারের এই মন্তর দেওয়া মাটি নিয়ে যা ওর কপালে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে। ঢোঁড়াই তখন ঢুখিয়ার মার কোলে নেতিয়ে পড়েছে। ঢোঁড়াইকে নিয়ে ফিরে আসবার সময় ঢুখিয়ার মার কানে—আসে—রেবণগুণী আপন মনে বলছে···গত অমাবস্যাতে আন্ধেক রাত্তিরে যখনই দেখেছি মুরবলিয়া (৪) ফৌজের দল পাল্কী দিয়ে গিয়েছে, তখনই বুঝেছি যে উজাড় হয়ে যাবে গাঁ। কাটা গলার উপর একটা করে আবার পিদীপ জ্বলছিল।···ভয়ে তার প্রাণ উড়ে যায়।···যাক্ সে যাত্রা রেবণগুণীর কৃপায় ঢোঁড়াই বেঁচে যায়। ঝাড়ফুঁকের জন্য ঢুখিয়ার মাকে যে দাম দিতে হয়েছিল, তার জন্য সে কোনদিন দুঃখিত হয়নি। ঐ রোগে কত লোক মরেছিল গাঁয়ে, শুধু রেবণগুণীরই মন্ত্রের জোরে ঢোঁড়াই বেঁচেছে, এ উপকার ঢুখিয়ার মা ভুলতে পারবে না। এমন শনিবার রাত্রের মন্তরের ধক যে, জ্বর ছাডবার পরও যত বিস শরীরে ছিল, কালো কালো রক্তের চাপের মত হয়ে, নাকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়েছিল কদিন ধরে।

অসুখ সারবার পরও এক হপ্তা ঢুখিয়ার মা ঢোঁড়াইকে রেখেছিল বাড়িতে। এ ঢোঁড়াইয়ের এক নতুন অভিজ্ঞতা। তার শরীর তখনও দুর্বল। বাতায় গোঁজা কাজল-লতাটার দিকে শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ দেখলেই চোখ টন্ টন্ করে. হাঁড়ি ঝোলানোর শিকেগুলো বিনা হাওয়াতেও মনে হয় কাঁপে, ভাত আনতে দেরী হলে রাগে কান্না পায়। বাঁশের মাচার উপর, একদিকে শোয় ঢোঁড়াই, একদিকে ঢুখিয়া, আর মধ্যেখানে ঢুখিয়ার মা। ঢুখিয়ার মার গায়ের গরমের মধ্যে মুখ গুঁজে, গল্প শোনে ঢোঁড়াই···রাজপুত্তুর সদাবৃচ মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ছেন রাজকন্যা সুরঙ্গার মহলে যাওয়ার জন্য; অন্ধকার ঘুরঘুট্টি সুড়ঙ্গ, পিছল দেওয়াল, তার মধ্যে দিয়ে জল চুইছে টপ টপ করে।···(৫)

ঢোঁড়াইয়ের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে ঢুখিয়ার মার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে। অন্ধকারে ভয় পাচ্ছে নাকিরে ঢোঁড়াই, এইত আমি কাছে রয়েছি, কথা বলছি তবুও ভয় করছে। অসুখের পর এমনিই হয়।···

ওদিকে হিংসুটে ঢুখিয়াটা উঠে বসেছে হাতের মুঠো দিয়ে নাক রগড়াতে

রগড়াতে। ছোট্ট ছোট্ট হাত দুখান দিয়ে সে ঢোঁড়াইকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় আর ঢোঁড়াই বিরক্ত হয়ে ওঠে।

"ছি দুখিয়া, ঢোঁড়াই ভাইয়ার যে অসুখ," দুখিয়া কান্না জুড়ে দেয়। বাবুলাল অন্য মাচা থেকে চেঁচায়, "ও কাঁদছে কেন?"—শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে দুখিয়াকে নিয়ে যায় নিজের কাছে।

ঢোঁড়াই ছোট হলেও বোঝে যে, বাবুলাল রাগ করে দুখিয়াকে উঠিয়ে নিয়ে গেল, আর রাগটা বোধ হয় তারই ওপর। দুখিয়ার মাও চুপ করে গিয়েছে। তার চুলের গন্ধটা আসছে নাকে, বাওয়ার জটার গন্ধর মত না, অন্য রকম। কোথায় ভেবেছিল যে, আজ বিজা সিংএর গল্পটা শুনবে এর পর। বাবুলালটা সব মাটি করে দিল। ভারী ভাল লাগে বিজা সিংএর গল্পটা। ঘোড়া ছুটিয়ে, তরোয়াল নিয়ে যাচ্ছেন বিজা সিং—কার সাধ্যি তার সম্মুখে দাঁড়ায়—হাওয়া গাড়ির চাইতেও কি বেশী জোরে তাঁর ঘোড়া ছোটে? দুখিয়ার মাকে জিজ্ঞাসা করবে নাকি যে, এঞ্জিনের চাইতেও কি বিজা সিংয়ের গায়ে বেশী জোর। না দুখিয়ার মাটা বাবুলালের ভয়ে এখন কথা বলবে না, তাই চুপচাপ শুয়ে রয়েছে।

"কিরে ঢোঁড়াই ঘুমোলি নাকি?"

ঢোঁড়াই উত্তর দেয় না। চুপচাপ চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। এইবার দুখিয়ার মা ওঠে। ঢোঁড়াই জানে যে, তাৎমাটুলির প্রত্যেক মেয়েছেলেই রাত্রে পুরুষের পা টিপে দেয়—তেল থাকলে পায়ে তেল দিয়ে দেয়। তার বাওয়ার কথা মনে পড়ে। দুখিয়ার মা যদি বাওয়ার পায়ে তেল দিত, তাহলে বেশ ভাল হত। বাবুলালটাও ভাল না, দুখিয়ার মাটাও ভাল না, আর দুখিয়াটাও ভাল না। বাওয়া এখন কি করছে, কে জানে। আজও তো নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল—দুখিয়ার মা যেতে দেয়নি। কালই সে চলে যাবে 'থানে', বাওয়ার কাছে···বিজা সিংয়ের ঘোড়ায় চড়ে। ···তরোয়াল হাতে নিয়ে রাজপুত্তুর সদাবৃচের মত···

ঢোঁড়াই ঘুমিয়ে পড়েছে।

টীকা:—

(১) আদম-শুমারি।

(২) ঝট্‌সে বিমার পট্‌সে খতম—লোকে অসুখে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে মরে।

(৩) ভানুমতী—ভানুমতী যাদুবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

(৪) মুরবলিয়া—কন্ধকাটা ভূত। ঐ সময় কন্ধকাটা মিলিটারী উর্দী পরা ভূতের দল, গিয়েছিল কোশীসি-কগুড় রোডের উপর দিয়ে।

(৫) সুরঙ্গা সদাবৃচের, রূপকথা সবাই জানে এখানে। কিন্তু ওটা বলতে হয় গান করে, সেইটা সকলে পারে না।

গুরু-শিষ্য সংবাদ

বৌকাবাওয়া ঢোঁড়াইয়ের কদর বোঝে। ছোঁড়া বেশ বুদ্ধিমান। বাওয়া বোবা। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার একটুও অসুবিধে হয় না; চোখের ইশারাতেই সে সব মনের কথা বুঝে যায়। আর ওর জন্যে ভিক্ষেটাও পাওয়া যায় খুব, গলাটা ওর খুব ভাল কিনা। মাইজীরা ওকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে 'সীয়-রাম-পদ-অঙ্ক বরায়ে। লক্ষ্মণ চলাই মগু দাহিন বাঁয়ে॥' (১) শোনেন। কিছুদিন থেকে বাওয়া দেখছে, যে ঐ গানটায় আর সেরকম ভিক্ষে পাওয়া যায় না। সে ও ছোঁড়াও বুঝেছে। এই যবে থেকে 'হাড়তাল' টাড়তাল আরম্ভ হয়েছে, তবে থেকে 'বটোহীর' (২) গ্রাম্য গানের হাওয়া লেগেছে দেশে। কি যে গান বুঝি না—যে কোন কথার শেষে রে বটোহিয়া জুড়ে দাও, আর অমনি গান হয়ে যাবে। যখন যে হাওয়া চলে আর কি!

বাওয়া ঢোঁড়াইকে ইশারায় বলে "এই পাশের বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চল্লি কোথায়?"

"ও বাড়িতে অসুখ"

সব খবর ঢোঁড়াই রাখে। কোন বাড়িতে অসুখ, কোন বাসার মাইজীরা দেশে গিয়েছে দশহরার ছুটিতে, কোন্ কোন্ বাড়িতে দুপুর বেলায় যেতে হয় বাবুরা আপিস কাছারী গেলে, কোন বাড়িতে বিয়ে, পৈতে, পূজো সব ঢোঁড়াইয়ের

নখদর্পণে। বাওয়াকে সেই চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। বাওয়ার ভিক্ষের অভিজ্ঞতা দুপুরুষের। তবুও এতসব খুঁটিনাটি মনে থাকে না। ঢোঁড়াই গান গাইছে ·····

সুন্দরা আ সু। ভূমি ভাইয়া-আ।

। ভারাতা আ কে। দেশা-বাসে। '

মোরা প্রাণা-আ। বসে হিম-অ।

। খোহরে বটোহিয়া-আ-আ····। (৩)

বাওয়া বলে, "চল এখানথেকে, কেউ সাড়া দেবে না কঞ্জুসের দল। এক দুয়োরে কতক্ষণ গলা ফাটাবি।"

ঢোঁড়াই ভাবে, বাওয়া বোঝে না তো কিছুই, খালি চল্ চল্। হড়বড় করলে কি ভিক্ষে পাওয়া যায়। মাইজী এখন বসেছে পুজোয়। বাবু আফিসে গেলে, তারপর স্নান করে পুজোয় বসে। এখুনি উঠবে।

যা ভেবেছে ঠিক তাই।

বুড়ীমাইজী মটকার থান পরে ভিক্ষে দিয়ে গেলেন, সঙ্গে আবার একটা বেগুন।

বাওয়া অপ্রস্তুত হলেও মনে মনে খুশী হয়—এ ছোঁড়া উপযুক্ত চেলা হবে বড় হলে। একটু খালি শাসনে রাখতে হবে। বড় দুরন্ত ছেলে দিনরাত খেলার দিকে মন। রোজগারের দিকে মন বসে না। সকালবেলা ধরতে পারলে তো সঙ্গে আসবে। একটু নজরের বার করেছো কি ফুট করে কখন যে থান থেকে সরে পড়বে, তা কেউ বুঝতে ও পারবে না। তারপর কেবল সারাদিন টো টো, আজ এর সঙ্গে ঝগড়, কাল ওর সঙ্গে মারামারি। ঠিক যে সব কাজ বাওয়া পছন্দ করে না সেই সব কাজ। একদিন বাওয়া দেখে যে, একটা গাধা ধরে তার পিঠে চড়েছে। ঐ খৃষ্টান ধাঙ্গড়গুলোর ছেলেদের সঙ্গে পর্যন্ত ওর আলাপ। "মহতো" একদিন এ নিয়ে নালিশও করেছে তার কাছে। বুড়ো শুক্রা ধাঙ্গড়, যে ওকিলসাহাবের বাগানে মালীর কাজ করে, সে আবার ঢোঁড়াইকে বলে "ধন্ বেটা' (ধর্মছেলে)। রতিয়া ছড়িদার এই কদিন আগেও এসে বাওয়ার কাছে নালিশ করেছে ঢোঁড়াইয়ের নামে।

"গিয়েছিলাম চিমনি বাজারে রাঙ্গা আলু কিনতে। দেখি তোমার গুণধর

ছেলে ঢোঁড়াই, গলায় একটা দড়ি জড়িয়ে, বোবা সেজে, গেরস্থ বাড়িতে, গরু মরেছে বলে ভিক্ষা করছে। তাৎমাদের নাম হাসালো। তোমার সঙ্গে ভিক্ষায় বেরুলেই হয়—তাতে তো বেইজ্জতি নেই। এর বিহিত একটা করতেই হয় বাওয়া তোমাকে।"

বাওয়া চটে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে আলাদা রোজগার করতে শিখেছে লুকিয়ে। কি করেছিস সে চাল আর পয়সা বল। কল্কের তামাকটা পর্যন্ত শেষ করে টানি না, পাছে ঐ ছোঁড়াটা ভাবে যে, ওর জন্যে রাখল না কিছু, আর এ তলে তলে রোজগার করে খরচ করে—নেমকহারাম হারামজাদা কোথাকার। আংটা পরানো ত্রিশূলটা নিয়ে সে ঢোঁড়াইকে তাড়া করে যায় মারতে। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে দৌড়ে পারবে কেন? অনেকদূর যাবার পর, ঢোঁড়াই বাওয়ার নকল করে চলতে আরম্ভ করে—ঠিক যেন ত্রিশূল আর ঝোলা নিয়ে বাওয়া সকালে ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। রতিয়া 'ছড়িদার', হেসে ফেলে। বাওয়া আরও চটে যায়—হাসছো কি, তোমাদের ছেলেরা যায় রোজগারে খুরপি নিয়ে ঘাস ছুলতে, না হয় ঝুড়ি নিয়ে কুল কুড়োতে। এ ছোঁড়া যাবে তাদের সঙ্গে সমানে তাল দিতে, কিন্তু রোজগারের কথাও ওর কানে এনো না, তবে থাকবেন খুশী। আমি এনে দেবো, তবে চারটি খেয়ে উপকার করবেন। না, ছোঁড়াটা দেখছি ধাঙ্গড়টুলির পথ ধরেছে। যা তোর সাতজন্মের বাপদের কাছে।......

তারপর রাগটা একটু কমে এলে, বাওয়ার উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। বদরাগী পাগল ছেলেটা আবার কি না কি করে বসে। মরণাধারের ওপারে 'গোঁসাই' (সূর্য) ডুবে যায়। বকরহাট্টার মাঠের তালগাছ কটার উপরের আলোর রেশ মুছে যায়। গোঁসাইথানের অশথ গাছটির উপরের পাখীর কাকলী বন্ধ হয়ে যায়। তবুও ঢোঁড়াই আসে না। অনুতাপে বাওয়ার চোখ ছলছল করে; তামাকে স্বাদ পায় না। সে কি গিয়েছে এখন। তখন 'গোঁসাই' ছিল মাথার উপর। সে তালপাতার চাটাইটা ঝেড়ে, অসময়ে শুয়ে পড়ে। খানিক পরে কাঠের বোঝা ফেলবার শব্দে বুঝতে পারে যে, ঢোঁড়াই জ্বালানী কাঠ কুড়িয়ে ফিরেছে। ঢোঁড়াই আগে কথা বলবে না, বাওয়াও ওর দিকে তাকাবে না। কোনদিকে না তাকিয়ে ফুঁ দিয়ে উনুন ধরাবার চেষ্টা করে। বাওয়া শব্দ শুনে বোঝে যে এই

মাটির মালসাটাতে জল চড়ালো, এইবার ভিক্ষের ঝুলি থেকে চাল বের করছে। আর চুপ করে থাকা যায় না। বাওয়ার খাওয়ার জন্যে জিবছীর মা, গোটা কয়েক 'সুথনী' (৪) দিয়ে গিয়েছে। এখনও মাথার কাছে রাখা রয়েছে। ঢোঁড়াইটা জানে না—এখন ভাতে না দিলে সিদ্ধ হবে কি করে। বাওয়া ত্রিশূলটি নেড়ে ঝম্ ঝম্ শব্দ করে। এতক্ষণে ঢোঁড়াইয়ের অভিমান ভাঙ্গে,—বাওয়া তাহলে তাকে ডেকেছে।

"এত সকাল সকাল শুয়ে পড়লে কেন বাওয়া? খাবে না?"

রাতে আবার ঢোঁড়াই বাওয়ার চাটাইয়ের উপর তার কোল ঘেঁষে শুয়ে পড়ে। বাওয়া তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। এর মধ্যে সে কখন ঘুমিয়ে পড়ে বুঝতে পারে না।

এই হচ্ছে আজকালকার নিত্যকার ঘটনা। বাওয়া মধ্যে মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আবার ভাবে যে অল্প বয়স। যে বয়সের যা। ওর সমবয়সীদের সঙ্গে না খেললে ধুললে কি ওর এখন ভাল লাগে। হাঁ তবে খেলবি খেল। নিজের রোজগারের কাজটা করে তারপর খেল; আর ঐ দলের পাণ্ডামিটা ছেড়ে দে। এই এখনই থানে ফিরবে। আর কি ওর টিকি দেখবার জো থাকবে সেই গোঁসাই ডুববার আগে। আর কি জেদী, কি জেদী! বকে ঝকে কি ওকে সামলানো যায়। ঝোঁক একবার উঠলে হলো। এখন এই ঝোঁক থানের দিকে আর ভিক্ষের দিকে গেলে হয়, বড় হলে। তবে না আমার উপযুক্ত চেলা হতে পারবে। রামজীর মনে যা আছে তাইতো হবে। সিত্তারাম! সিত্তারাম! ঢোঁড়াই গেয়ে চলেছে সেই 'বটোহীর' গান। বুকের জোর আছে ছোঁড়াটার। গানের শেষে বটোহিয়ার আ টা যা ছেড়েছে একেবারে ভাইচেরমেন সাহেবের দারোয়ানের কুঠরির জানলা খুলিয়ে ছেড়েছে। ঐ যে তাঁর বিজলীঘরের মিস্ত্রিও জানলা দিয়ে তাকাচ্ছে দেখছি। ঝুলিটা ভরে গিয়েছেরে ঢোঁড়াই। চল্, ফেরা যাক থানে। আবার সাওজীর দোকান থেকে একটু নুন নিতে হবে।

টীকা :—

(১) রাম ও সীতার পায়ের দাগ এড়াইয়া লক্ষ্মণ একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ফিরিয়া রাস্তা চলিতেছেন।

(২) বটোহী—পথিক। এই নামের একটি গ্রাম্য সুর ১৯২০ সালের পর হইতে প্রচলিত হয়। এখন এ গান প্রায় লুপ্ত।

(৩) সুন্দর সুভূমি ভারত দেশটা,
আমার প্রাণ থাকে হিমালয়ের গুহায়,
রে পথিক!......

(৪) সুথ্নী—একপ্রকার কন্দ; কেবল গরীবরাই এই কন্দ খায়।

গানহীখাওয়ার বার্তা

কপিলরাজার বাড়িটা ভূতের বাড়ির মত পড়েছিল এক বছর থেকে। বাড়ির লোকরা মারা যাবার পর, তার জামাই এসেছিল, বাড়িটা বিক্রি করতে। খদ্দের জোটেনি। বাড়িতো তেমনিই, তার উপর সহর থেকে এতদূরে। জমির দাম এখানে নামমাত্র বললেই হয়। ঐ ভুতুড়ে বাড়ির, খড়ের চালা কিনবার জন্য কে আর পয়সা খরচ করতে যাবে। কপিলরাজার জামাইটা আবার ফিরে এসেছে, দিন কয়েক শোনা যাচ্ছে যে, চামড়ার ব্যবসা করবে। আজ বাদরা মুচির সঙ্গে নাকি সে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছে। কাল দু'গাড়ী নুন এসেছে তার বাড়িতে।

এই কথাই উঠেছিল সাঁঝের ভজনের আখড়ায়। ধন্নুয়া 'মহতো' বলে যে কথাটা ভাববার বটে। তা বাবুলালকে আসতে দে। একে সে পাড়ার পঞ্চায়তের একজন 'নায়েব', তার উপর 'অফসর আদমী'., হাকিম হুকুমের সঙ্গে কথা বলেছে। তার উর্দি পাগড়ির রং বদলেছে কিছুদিন আগে—কলস্টরের জায়গা নিয়েছে ওর ভাইচেরমেন সাহেব সেইজন্য। বাবুলাল বলেছে, যে ওর ভাইচেরমেন সাহেবকে এখন চেরমেন সাহেব না বললে চটে—আচ্ছা বাবা মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছো, যা বল তাই শুনতে রাজী আছি।

ঐ বাবুলালকে দিয়ে চেরমেন সাহেবকে বলাতে পারলে কপিল রাজার জামাইটার এ অনাছিষ্টি কাণ্ড বন্ধ করা যেতে পারে। বাদরামুচীটাকেই যদি চেরমেন সাহেব একবার বকে দেয়, তাহলেই এঁর চামড়ার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়।

ছি ছি ছি ছি, জাত-ধর্ম আর থাকবে না। দুর্গন্ধে পাড়ায় টেকা যাবে না, হাজারে হাজারে শকুন বসবে আমাদের ঘরের উপর। আর সেসব যা-তা চামড়া—নাম আনা যায় না মুখে। হ্যাক। থুঃ!, থুঃ! সিত্তারাম!

কিন্তু বাবুলাল আজ আসেই না, আসেই না অফিস থেকে। চেরমেন সাহেবের বাড়িতে চিঠির ঝুড়ি পৌছে, তারপর হাট করে রোজ সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই ফিরে আসে। আজ রাত দশটা বাজলো। আরে দুখিয়ার মার কাছ থেকে খবর নেতো ঢোঁড়াই, যে বাবুলাল কিছু বলে গিয়েছে নাকি বাড়িতে।

আমি যাই না ও-বাড়িতে।

মহতো বলে যে, বাওয়া ছেলেটার মাথা একেবারে খেল; নেমকহারাম কোথাকার; গত বছরও তো অসুখ হয়ে অতদ্দিন পড়ে থাকলি দুখিয়ার মার কাছে। আচ্ছা গুদর তুই-ই যা বাবুলালের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে আয়। তারপর বিকৃত উচ্চারণে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—'আমি যাই না ও-বাড়িতে। বদমাস কোথাকার'।

"কাহুহি বাদি ন দেহিয় দোষু" (১)—মিছে দোষ দিস না দুখিয়ার মায়ের আর বাবুলালের।

এরই মধ্যে বাবুলাল এসে পড়ে। সে আর কাউকে প্রশ্ন করার অবকাশ দেয় না যে, আজ দেরী কেন হল।

ডিস্টিবোড আফিসে আজ ভারী হল্লা ছিল। মাস্টার সাহেব নৌকরীতে ইস্তফা দিয়ে সব ছেলেদের ছুটি দিয়ে দিয়েছে। ছেলেরা ডিস্টিবোডের ঘড়িঘরের (২) সম্মুখে 'সাভা' (৩) করতে এসেছিল। মুফীলুদ্দীন 'সাহেব মোক্তার আছে না, ঐ যে সব সময় আফিং খেয়ে ঢোলে, সে লাল কিতাব হাতে নিয়ে সদর (৪) হয়েছিল।

"লে হালুয়া! (৫) মাস্টার সাহেবের......"

"ছুট্ গয়ী নৌকরী, সটক গয়া পান (৬)"

"কেন? মাস্টার সাহেবকে আবার পাগলা কুকুরে কামড়ালো কেন?"

"নৌকরী থেকে সরকার নিশ্চয়ই বরখাস্ত করেছে। টাকা পয়সার ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু আছে?"

বাবুলাল সকলকে বুঝিয়ে দেয়—না না ওসব কিছু নয়, মাস্টার সাব গানহী বাবার চেলা হয়েছে।

গানহী বাবা কে? গানহী বাবা?

"বড়া গুণী আদমী (৭)। বোকা বাওয়া আর রেবণ গুণীর চাইতেও 'নামী'। সিরিদাস বাওয়ার চাইতেও বড়, না হলে কি মাস্টার সাব চেলা হয়েছে। গানহী বাওয়া মাস-মছলী, নেশা-ভাঙ থেকে 'পরহেজ' (৮)। সাদি বিয়া করেনি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল (৯)।

বঙ্গালী রাবু চংড়ী মছলী খাবু। এত তকলীফ কি সইতে পারবে?

জমিজমা করে নিয়েছে বোধ হয়।

প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বাবুলাল অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বহু রাত পর্যন্ত নানারকম কথা হয়। বাঙালীরা বুদ্ধিতে এক নম্বরের, কিন্তু একটু পাগলাটে গোছের। ঠিক সাহেবদেরই মত। তবে তার চাইতে একটু কম বদরাগী। ভয় ভয়ই করে ওদের সঙ্গে কথা বলতে। বিজনবাবু ওকীলের ঘরের খাপড়া উল্টোবার সময় সেদিনও দেখেছি—জয়শ্রী চৌধুরী, ব্রাহ্মণ, অত বড় কিযাণ, বিজনবাবু ওকীল ছুঁড়ে ফেলেছে তার কাগজ। একবার বসতে পর্যন্ত বলল না ওকে। কি রাগ! কি রাগ! চাকতো দেখি টিকটবাবু রেলগাড়ীতে বাঙালীবাবুর কাছে টিকট। তবে বুঝবো। আর "বাজা ছাজা কেস, তিন বাঙ্গালা দেস।" (১০)

আজ সভায় সরকারকে, লাটসাহেবকে, বাদশাকে অনেক কথা শুনিয়েছে মাস্টারসাবু।

ও কেবল 'কথার তুলো ধোনা', বলতো দারোগা সাহেবের খেলাপে, তবে না বুঝতাম হিম্মং। বংতো টমাস সাহেবের খেলাপে, তো গুলী মেরে উড়িয়ে দিত। চাঁদমারীতে মক্স করা হাত ওর।

চেরমেন সাহেব কলস্টর সাহেবকে খবর দিতে গেলেন যে তাঁর হাতায় 'সাভা' করছে লোকে, মানা করলেও শোনে না।

তবে যে তুই বললি যে তোর চেরমেন সাহেব, কলস্টরের জায়গা নিয়েছে।

বাবুলাল এই বোকাগুলোর মূর্খতায় বিরক্ত হয়ে বলে—আরে সে তো কেবল ডিষ্টিবোর্ডে। জেলার মালিক তো কলস্টর আছেই।

"তাই তো বলি, কলস্টরের জায়গা কি করে নেবে।"

"কিন্তু চেরমেন সাহেব সেই যে গেলেম, আজও গেলেন কালও গেলেন। আর সন্ধ্যা পর্যন্ত এলেন না—না কলস্টর, না সেপাই, না কেউ, অপিসের বাবুরা তাদেরই এন্তেজারিতে এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে আলো জ্বালিয়ে বসে। তাইতেই তো এত দেরী।"

বাবুলালের খাওয়া হয়নি এখনও। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে গল্পে গল্পে। সকলে উঠে পড়ে, সে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে। ঢোঁড়াই সেই বকুনি খাওয়ার পর থেকে এতক্ষণ এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। কেবল সেই লক্ষ্য করে যে, যে চামড়ার নাম করতে নেই, সেই চামড়ার গুদাম পাড়ার কাছে হওয়ার কথাটা, এই গোলমালে একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছে। ঐ বেড়ালের মত গোঁফ বাবুলালটা কতকগুলো গল্প বললো তাতেই। গানহীবাওয়া রেবণগুণীর চাইতেও বড়, বৌকা বাওয়ার চাইতেও বড়, মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ীর মোহন্তর চাইতেও বড় ; এক নম্বরের গপ্পবাজ বাবুলালটা। 'ঝুটফুস' (১১) বললেই হল।

টীকা :—

(১) 'কাহুহি বাদি ন দেইয় দোষু',
কাউকে মিছে দোষ দিওনা—(তুলসীদাস)

(২) ঘড়িঘর—ক্লক টাওয়ার।

(৩) সাভা—মিটিং, সভা

(৪) সদর—সভাপতি

(৫) লে হালুয়া—আশ্চর্য !

(৬) এটি একটি অতি চলিত কথা তাৎমাদের মধ্যে। 'চাকরীও গেল পান খাওয়া ও শেষ হয়ে গেল।

(৭) বড় গুণী লোক—গুণীর মানে যাদুকর।

(৮) পরহেজ—সংযমী।

(৯) উলঙ্গ থেকে একেবারে

(১০) বাভ্রা ছাভা কেস, তিম্ব বাংগালা দেস—বাগু, ঘরছাউনি, মাথার চুল (মেয়েমানুষের) এই তিনটি জিনিস বাংলাদেশের ভাল।

(১১) ঝুটফুস—বাজে মিথ্যে

গানহী বাওয়ার আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য বর্ণন

'পাক্কীর' (১) ধারের বটগাছে মৌমাছির চাক হয়ত কতকাল থেকে আছে, কেউ তাকিয়েও দেখেনি; কিন্তু একদিন যদি দেখে ফেলে সেটা, তাহ'লে তারপর ওখান দিয়ে যতবার যাবে, নজরে পড়বে। গানহী বাওয়ার খবরের বেলায়ও হল এই রকমই। এমনি কেউ নামই শোনেনি। ঐ যে সেদিন রাতে বাবুলালের কাছ থেকে শুনলো, তারপর কিছু দিন চললো নিত্যি নূতন খবর। মাস্টার সাবকে মসজিদের 'সাভায়' গ্রেফতার করেছে দারোগা সাব। গা ম্যাজ ম্যাজ করলেও গানহী বাওয়ার চেলাদের দৌরাত্মে কালালীর (২) দিকে যাওয়ার উপায় নেই। চেলারা আজ কাছারীতে, কাল ছত্তিসবাবুর দোকানের সম্মুখে, কি বলে, কি করে, কি চেঁচায় কিছু বোঝাও যায় না। কত জায়গা থেকে কত রকম আজগুবি খবর আসে। এ কান দিয়ে শোনে, ও কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ব্যাপারটা মনের মত ভাবে জমলো একদিন হঠাৎ। ভোরে বৌকাবাওয়া সবে হাতের দাঁতনটা দিয়ে খোঁচা দিয়ে ঢোঁড়াইটার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে, এমন সময় শোনা গেল রবিয়ার গলা ফাটানো চীৎকার। কি বলছে ঠিক বোঝা যায় না। বাওয়া ঢোঁড়াই রবিয়ার বাড়ীর দিকে দৌড়োয়। রবিয়া পাগলের মত চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছে, গানহী বাওয়া,—কুমড়োর উপর। পাগল হয়ে গেল নাকি, ভাঙের সঙ্গে ধুতরোর বীচি টিচি খেয়ে। একদণ্ড দাঁড়িয়ে যে রবিয়া ঠাণ্ডা হয়ে কথার জবাব দেবে, তার সময় নেই ওর। রবিয়ার বাড়ীতে ঢুকে দেখে, যে তার উঠন ভরে গিয়েছে পাড়ার লোকে। নীচু চালের ছাঁচতলা থেকে একটা বিলিতি কুমড়ো ঝুলচে। সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেই খানটায়।

ঠিকই। যা বলেছে তাই। বিলিতী কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মূরত (৩) আঁকা হয়ে গিয়েছে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের। মুখের জায়গাটায় মোচের মতনও দেখা যাচ্ছে। আর কোন ভুল নেই। এখন কি করা যায়? এরকম করেতো গানহী বাওয়াকে হিমে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না। ঠাকুর দেবতার ব্যাপার। মহতো নায়েবরা বৌকা বাওয়াকেই সালিশ

মানে। ঢোঁড়াইয়ের ভারী আনন্দ হয় যে মহতো এসব ব্যাপারে বাওয়ার চাইতে ছোট। কুমড়োটার বোঁটা কাটার অধিকার বাওয়াই পেল; বাবুলালও না, মহতোও না। বোঁটাটা কাটবার সময় উঠনভরা লোকের ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বাওয়ার হাত ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপে। ঢোঁড়াই ভাবে, সেদিন বাবুলাল মিথ্যে বলেনি, গানহী বাওয়া, বৌকা বাওয়ার চাইতেও গুণী। না হ'লে কুমড়োতে আসে।

থানে কুমড়োটার পূজো হয়, পান সুপুরি গুড় দিয়ে। সেদিন ঢোঁড়াইয়ের কি খাতির! বাওয়া পূজা নিয়েই ব্যস্ত। ঢোঁড়াইকেই করতে হ'ল দৌড়োদৌড়ি পাড়ায়, বাজারে। সেদিন এরকম একটা মস্ত সুযোগ পেয়ে, বাওয়া সকলের সম্মুখে ঢোঁড়াইয়ের গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দিল। মালা গলায় দিলেই সে হয়ে যাবে "ভকত"। আর কেউ তাকে ঢোঁড়াই তাৎমা কিম্বা ঢোঁড়াই দাস বলতে পারবে না। সে আর কেউকেটা নয় এখন, তাকে বলতে হবে ঢোঁড়াই ভকত। বৌকা বাওয়ার সমান বড় হয়ে গিয়েছে সে, গানহী বাওয়ার আবির্ভাবের দিনেই। তাকে আজ থেকে প্রত্যহ স্নান করতে হবে। আর অন্য চ্যাংড়া ছেলেদের মত নয়, মাস মছলী থেকে পরহেজ (৪)। গুদরকে দেখে ঢোঁড়াইয়ের মায়া হয় সেদিন; বেচারার গলায় কণ্ঠি নেই।

তারপর সেই গানহী বাওয়ার 'মূরত' বালা (৫) কুমড়োটা মাথায় করে ঢোঁড়াই নিয়ে আসে মিলিটি ঠাকুরবাড়ীতে। পরনে সেই লাল কাপড়খানা। আগে আগে আসে ঢোঁড়াই আর বাওয়া, আর পিছনে সব তাৎমারা। মহতো পর্যন্ত পিছনে।

ঠাকুরবাড়ীতে পৌছে তাদের সব উৎসাহ জল হয়ে যায়। মোহন্তজী বলেন, "কি রে ঢোঁড়াই, তোর যে আর দেখাই নেই। যে ঠাকুরবাড়ীতে রামসীতার মূর্তি আছে সেখানে গানহী মহারাজের 'মূরত' রাখা ঠিক নয়। তুলসীদাসজী তাই বলে গিয়েছেন। – চুথিয়া সরকার !........"

তুলসীদাসজীর নির্দেশ পর্যন্ত তাৎমারা বুঝতে পেরেছিল; কিন্তু তার সঙ্গে চুথিয়া সরকারের কি সম্বন্ধ, তা তারা ঠিক ধরতে পারেনি।

'মূরতটাকে' নিয়ে মহা বিপদ। এখন কি করা যায়! কি করা যায় ওটাকে

নিয়ে! এমনভাবে মূর্তের 'দর্শন' পাওয়া গিয়েছে। রাম-সীতার পাশে যদি না রাখতে পারা যায়, তা' হলে 'থানেই' বা 'গোঁসাইয়ের' পাশে কি করে রাখা যাবে? বাওয়া ঘাড় নাড়ে—সে তো হতেই পারে না। তবে উপায়? একি পরীক্ষায় ফেললে রামজী। এত কৃপা করে, আমাদের ঘরে এলে গানহী মহারাজ, আর আমরা তোমাকে রাখবার জায়গা দিতে পাচ্ছি না। থাকতো টাকা সাহেবদের মত, বাবুভাইয়াদের মত, রাজ দ্বারভাঙ্গার মত, দিতাম একটা ঠাকুরবাড়ী বানিয়ে, গানহী বাওয়ার জন্যে। ঠিকই বলে গিয়েছে তুলসীদাসজী—"নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহী" (৬)। বাওয়ার চোখের কোণ জলে ভরে ওঠে। সারা জীবন তার ভিক্ষে করে কেটেছে। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত, কখনও শুকনো ভাত খেয়েছে বলে মনে পড়ে না। একবেলা 'জলপান', একবেলা ভাত—তাও জুটলে, এইতো সব তাৎমাই খায়। এ কেবল তার একার কথা নয়, তবুও 'নহি দরিদ্র সম দুখ জগমাহী" এই আবছা কথাগুলোর মানে, এই বিপদের ঝলকে হঠাৎ যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কপিলরাজার ঐ "পাখণ্ডী, চামড়াবালা" জামাই (৭) গানহী বাওয়ার নামে সিন্নি দেওয়ার জন্য যে গুড়, আটা আর কাঁচকলা পাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, তা অমনিই পড়ে থাকে?

এমন সময় রেবণগুণী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। আজকাল বিকালের দিকে গানহী বাওয়ার চেলারা 'কালালী'তে বড় জ্বালাতন করে। তাই সে দুপুরের দিকেই কাজটা সেরে আসে। সেখান থেকে ফিরবার সময় হঠাৎ লোকমুখে গানহী বাওয়ার আবির্ভাবের কথা শুনেছে সে। তাই সে হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছে। টোপা কুলের মত চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দৌড়ুবার মেহনতেও হতে পারে, আবার মদের জন্যও হতে পারে। সে এসে ঝুঁকে পড়ে কুমড়োটার উপর। অন্য কেউ হ'লে সকলে হাঁ হাঁ করে উঠে তাকে আটকাতে যেত; কিন্তু কার ঘাড়ে কটা মাথা যে রেবণগুণীর মুখের উপর কিছু বলে। ঢোঁড়াইয়ের বুক দুর দুর করে ভয়ে। এই বুঝি গুণী মুরতটাকে একটা কিছু করে বসে—যা মেজাজ। তাৎমা মেয়েরা রেবণগুণীকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দেয়।

"ঠিকই তো। টৌনে যা শুনেছিলাম বিলকুল ঠিক। ঠিক! ঠিক! ঠিক! গানহী বাবা ফুটে বেরুচ্ছেন কুমড়োটার গায়ে। কেবল হাত পা টা ওঠেনি—জগন্নাথজীর মত।"

রেবণগুণী কুমড়োটাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে, তারপর চীৎকার করে ওঠে "লোহা মেনেছি (৮); লোহা মেনেছি আমি গানহী বাওয়াব কাছে।"

অবাক হয়ে যায় সকলে। রেবণগুণী 'লোহা মেনেছে'! চাকের মৌমাছি নড়ে বসার মত একটা উত্তেজনার ঢেউ খেলে যায় দর্শকদের মধ্যে। রেবণগুণী যার 'লোহা মানে' সে তো প্রায় রামচন্দ্রজীর সমান। অত বড না হোক, অন্তত গোঁসাই কিম্বা ভানমতীর মত জাগ্রত দেবতা তো বটেই।

মৃদু গুঞ্জন উঠবার আগেই গুণী আবাব বলে ওঠে, "আজ থেকে কোন্ হারামীর বাচ্চা কালালীতে গিয়ে গানহী বাওযার কথার খেলাপ করে। আজকে যা করে ফেলেছি, তার তো আর চারা নেই। কাল থেকে গানহী বাওয়া, পচই ছাড়া আর কিচ্ছু খাবো না।" সে কেঁদে ফেললো বুঝি এইবার।

"দেখেংনিও মহতো"

এইবার মহতো বর্তমান সমস্যার কথটা তোলে।

গুণী যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়। গানহী বাওয়ার জয় হো, বলে লাফিয়ে উঠে মাথার পাগড়িটা সামলে নেয়। বাওয়া ঢোঁড়াইকে বলে, যা তুই পৌছে দিয়ে আয় মূরতটা ওর বাড়ীতে। সে ঠিক বিশ্বাস পাচ্ছে না গুণীটাকে। ঢোঁড়াইও সেই কথাই ভাবছিল। বাওয়া ঠিক তার মনের কথা বুঝতে পারে।

সে রাত্রে রেবণগুণীর বাড়ীতে ভজনের আসব জমে—যা গ্রামের ইতিহাসে আর কখনও হয়নি। ঢোঁড়াই 'ভকত' গানহী বাওয়ার নাম দেওয়া বাটোহীর গান গায়। গুণী তার সঙ্গে তান ধরে। সে রেবণগুণীর সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে গানহী বাওয়ার দৌলতে।

পরের দিন সকালে কুমড়োটাকে কাপড়ে ঢেকে গুণী চলে যায় মেলায়। অনেক দিনের মদের খরচ সে রোজগার করেছিল যাত্রীদের কাছ থেকে ঐ মূরতটা দেখিয়ে। একটা করে পয়সা দিলেই, কাপড়ের ঢাকা তুলে কুমড়োটাকে দেখাতো।

টীকা :—

(১) কোশী শিলিগুড়ি রোড
(২) কালালী—মদের দোকান
(৩) মুর্তি
(৪) পরহেজ—সংযমী : মাছ মাংস ছেড়ে দিতে হবে।
(৫) মুর্তি আঁকা
(৬) পৃথিবীতে দারিদ্রের মত দুঃখ আর নাই—(তুলসীদাস)
(৭) পাষণ্ড চামড়াওয়ালা
(৮) লোহা মানা—পরাজয় স্বীকার করা।

ঝোটাহা উদ্ধার

তাংমাটুলির পঞ্চায়তীতে সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, আলবং উঁচুদরের সন্ন্যাসী গানহী বাওয়া। মুসলমানকেও পিঁয়াজ গোস্ত ছাড়িয়েছে। একবার কপিলরাজার জামাইটার সঙ্গে দেখা করাতে পারলে হয়, তাঁকে আনিয়ে। ওরে আসবে না রে আসবে না। মাস্টারসাবদের মত বাবুভাইয়া চেলা থাকতে, তোদের এখানে আসবে না, না হ'লে চালার উপর এসে রবিয়ার ঘরে ঢোকে নি। থানের মত ঘর-দুয়োর আঙ্গন 'সাফসুৎরা' রাখতে পারিস তবে না সাধুসন্ত এসে দাঁড়াতে পারে। এ একটা 'মার্কা'র (১) কথা বলেছিস বটে। সকলের কথাটা মনে ধরে। মরগামার গয়লারা রবিবারে গরু দোয় না। সেদিন তারা তাদের ঘর-বাড়ি সাফ করে, তারা সিরিদাস বাবাজীর চেলা কিনা। ধন্নুয়া মাহতোর মাথায় ঢোকে যে আচ্ছা রবিবারে রবিবারে গানহীবাওয়ার নামে কাজে না গেলে বেশ হয়। রবিবার 'তোহারের' (২) দিন। সরকার বাহাদুর পর্যন্ত কাছারী বন্ধ রাখে, চেরমেন সাহেব ডিষ্টিবোড বন্ধ রাখে, পাদ্রীসাহেব দুধ বিলোয়—খৃষ্টান ধাঙড়দের। সকলেরই এ বিষয়ে খুব উৎসাহ। রবিবারে কাছারী বন্ধ থাকায় বাবুভাইয়ারা বাড়িতে থাকে, আর যতক্ষণ তাংমারা তাদের বাড়িতে কাজ করে, সঙ্গে সঙ্গে টিক্‌টিক্ টিক্‌টিক্ করে। অন্য কোন কাজ নেই তো ঘরামীর পিছনেই

লাগো। ঢোঁড়াইয়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। বাঁধা ঘরগুলোতে রবিবারের দিনই ভিক্ষে দেয় বিশেষ করে যারা আধলা দেয় তারা। বৌকা-বাওয়া যে পঞ্চায়তীতে আসে না। সে এলে এর প্রতিবাদ করতে পারতো। ঢোঁড়াইয়ের কথা তো কারও মনেই পড়ে নি। ছোকরা ঢোঁড়াই দূর থেকে বলে, আমাদের 'পেট কেটো' না মহতো (৩)। রবিবারের রোজগারই আমাদের আসল রোজগার। অর্বাচীনের ধৃষ্টতায় নায়েব মহতোরা অবাক হয়। এতটুকু ছেলে পঞ্চায়তীর মধ্যে কথা বলতে এসেছে।

তুই আবার কণ্ঠি নিয়ে 'ভকত' হয়েছিস না? গানহী-বাওয়া বড় না তোর রোজগার বড়?

কোন্‌টা বড় ঢোঁড়াই সত্যিই এ প্রশ্নের জবাব ঠিক করতে পারে না। কাঁচুমাচু মুখ করে সে বসে পড়ে। তার আর বাওয়ার রোজগারের কথাটা 'মুখিয়ারা' (৪) একবারও তো ভাবলো না। গানহীবাওয়া কর তাতে কিছু বলবার নেই, সে তো ঢোঁড়াই চায়ই, গানহীবাওয়া তো তারই দলের লোক, কিন্তু নিজের 'পেট কেটে' গানহী বাওয়া করা, এটা সে বুঝতে পারে না। রোজগারের কথাটা ঢোঁড়াই এই বয়সেই ঠিক বুঝেছে। বৌকা বাওয়া যতই ভাবুক না কেন যে ছোঁড়ার সেদিকে খেয়াল নেই।

ঢোঁড়াইয়ের সমস্ত আক্রোশটা গিয়ে পড়ে পঞ্চায়তীর ধনুয়া মহতো, আর বাবুলালটার উপর। কিন্তু তার বিষয় ভেবে পঞ্চায়তী এক মিনিটও সময় বাজে খরচ করতে রাজী না। ততক্ষণে একটা অনেক বড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, সেখানে 'ঝোটাহা'দের নিয়ে। খালি রবিবারে আঙ্গন সাফ করলেই হবে, না। ঝোটাহাদেরও একটু 'পাক সাফ' (৫) থাকতে হবে। মেয়েমানুষের জাতটাই এমন। হাজার ব'লেও ওদের দিয়ে কিছু করাতে পারবে না।

কে কথা শুনবে না, কোন 'ঝোটাহা' শুনি! মাসে একদিন করে সব 'ঝোটাহা'দের স্নান করে 'পাক সাফ' হতে হবে। গাঁটের পয়সা খরচ করে' বিয়ে করেছি না, না মাঙনা?

খোঁড়া চথুরী বসে ছিল দূরে। তার বৌ তার সঙ্গে থাকতে চায় না ব'লে মহতো নায়েবরা তার 'সাগাই' (৬) করে দিয়েছে ইসরার সঙ্গে। সে বলে মহতো

আর ছড়িদার ইসরার কাছ থেকে টাকা খেয়েছে। সে চেঁচিয়ে ওঠে, ঝোটাহাদের মাথায় চড়াওতো তোমরাই। 'পঞ্চ'রা যদি কড়া হয় একটু, তাহলে ঝোটাহাদের সাধ্যি কি যে তারা 'চুলবুল' করে। তার ভর দিয়ে চলার লাঠিটা মাথার উপর ঘুরিয়ে নিয়ে বলে—"তাহলে একটু চালের থেকে বেচাল হয়েছে কি……"। আর একদিক থেকে চেঁচামেচি ওঠায় তার শেষের কথাগুলো, বোঝা যায় না, তবে খোঁড়া চথুরীর ঠিকরে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো দেখে মনে হয় যে, সে একটা মারাত্মক রকমের ওষুধের কথা কিছু বলেছে। যেদিক থেকে গোলমালটা ওঠে, সেদিকে দেখা যায় কয়েকজন মিলে ইসরাকে ঠাণ্ডা করিয়ে বসাচ্ছে।

আরও কত রকমের প্রশ্ন ওঠে সেখানে। এত বড় একটা প্রশ্ন রেওয়াজের খেলাপ অমনি এক কথায় নিষ্পত্তি হয়ে যেতে পারে না। সবচাইতে বড় প্রশ্ন ঝোটাহাদের কাপড় শুকোবার। একখান করে তো কাপড়; গরমের দিনে না হয় গায়ে শুকোতে পারে। কিন্তু শীতকালে?

শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়—মাসে একদিন স্নান মেয়েদের করতেই হবে। কোন ওজর শোনা হবে না। 'গোঁসাই' হু-উ-উ, মাথার উপর আসবার পর, আর কোন মরদ 'কৌজী' ইদারার উত্তরে বাঁশঝাড়টার দিকে যেতে পারবে না—ওখানে 'ঝোটাহারা' কাপড় শুকোবে।

এর পর নিত্যি নতুন কাণ্ড। আজব আজব খবর গাণহী বাওয়ার। বৌকা বাওয়ারা দেখতে গেল কাঝা গণেশপুরে। ঢোঁড়াইকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না—সে অনেকদূর, সাতকোশ—অত দূর যেতে পারবি না তুই। তারপর তারা যখন বনভাগের সাঁকো পার হয়েছে, তখন দেখে যে ঢোঁড়াই ভকত লাল কাপড়খান পরে ছুটতে ছুটতে আসছে পিছন থেকে। কি জেদী ছেলে রে বাবা! ঢোঁড়াইকে জিরোবার ফুরসৎ দেবার জন্য বাওয়াকে কুলগাছতলায় বসতে হয়। তারপর কাঝা গণেশপুরের বেলগাছটার তলায় পৌঁছে দেখে, যে যা শোনা গিয়াছিল ঠিক তাই। প্রকাণ্ড বেলগাছের মগডালের পাতা তিরতির তিরতির করে নড়ছে—তিনটে করে পাতা একসঙ্গে। পাতাগুলোয় কি যেন লেখা লেখার মতই লাগে। ঠিকই গাণহী বাওয়ার নাম। জয়, জয় হো! নয়ন সার্থক, জীবন সার্থক বাওয়ার আজ। ঢোঁড়াইএর এত কষ্ট করে আসা সার্থক হয়েছে। জয় হো গাণহী

বাওয়া। তোমার নামের গুণেই না এত লোক বেলগাছটার ডালে ডালে হুঁকো বেঁধে দিয়ে গিয়েছে। ঐ বেলতলার ধূলো ঢোঁড়াই লালকাপড়ের খুঁটে করে বেঁধে নিয়ে আসে।

পরদিন ভোরে 'থানে' পৌছেই, না মুখ ধোযা না কিছু, বাওয়া তার নিজের কল্কেটা নিয়ে ঢোঁড়াইকে চড়িয়ে দিল মহতোর বাড়ির পাশের 'বরহমভুতবাবা' (৭) বেলগাছটায়। ঢোঁড়াই বেলগাছে বাওয়ার হুঁকোকল্কেটা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে এল।

তামাক না খেয়ে সেদিন বাওয়ার কি ছটফটানি! ঢোঁড়াই বুঝতে পেরে চুপটি করে বাওয়ার পাশে বসে থাকে। দুদিন রোজগার নেই, ঝুলি খালি। মেটে আলুর গাছের মত একরকম লতার, ওলের মত কন্দ ধাঙড়রা খায়। ঢোঁড়াই তাদের কাছ থেকেই শিখেছে, যে ওই আলুগুলোকে চুণ দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই তার তেতোটা কেটে যায়। এগুলো অযচ্ছল পাওয়া যায় আলের আশেপাশে, অথচ তাৎমারা ওকে বলে বিষ। ঢোঁড়াই অনেকক্ষণ ধরে ঐ আলু সিদ্ধ করে।. সময আর কাটতেই চায় না। অথচ আজকের মত দিনে বাওযাকে ছেড়ে দূরে থাকতে ঢোঁড়াইয়ের মন সরে না। বাওয়া ঢোঁড়াইকে ইশারা করে বলে—তোর ভালই হল,—আর আমার জন্য তোর তামাক সাজতে হবে না। বাওয়া মড়ার মত শুয়ে পড়ে থাকে। ঢোঁড়াইয়ের বড় মায়া হয় বাওয়ার উপর। নিশ্চয়ই গা হাতপা আনচান করছে। পা-টা একটু টিপে দি। বাওয়া আপত্তি করে না, বরঞ্চ বলে, গায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিতে।

বাওয়ার গা টিপে দিতে দিতে কেন যেন ঢোঁড়াইয়ের দুখিয়ার মার কথা মনে পড়ে। বেশ হতো সে যদি বাওয়ার পা টিপে আরাম করে দিত। তার অসুখের সময়ের সেই রাত্রের কথা মনে আসে। দুখিয়ার মা, বাবুলালের মাচায়, ওই বিড়ালের মত গোঁফওয়ালা বাবুলালের পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছে—শালা নবাব......

"পরণাম বাওয়া!"

"মহতো যে! হঠাৎ রাতে যে! ছড়িদারকেও সঙ্গে দেখছি।"

"এই সঙ্গত করতে এলাম। খুব ছেলের সেবা খাচ্ছ।"

ঢোঁড়াই লজ্জিত হয়ে যায় বাওয়ার চাইতেও বেশী—বাওয়ার গায়ের উপর পা দিতে বাইরের লোকে দেখে ফেলেছে বলে। চেলাতে দেবে গুরুর গায়ে পা! কালই হয়ত মহতো এই নিয়ে দশ কথা বলবে লোকের কাছে।

বাওয়া লজ্জিত হয়ে উঠে বসে। ছড়িদার আর মহতো বিনা মতলবে থানে আসার লোক নয়।

ঢোঁড়াই লজ্জা কাটানোর জন্য বলে,—আজ তামাক না খেয়ে বাওয়ার শরীরটা অস্থির অস্থির করছে। মহতো রসিকতা করে বলে "আর তোর?"

"আমি পেলে একটান মারতাম। না পেলে পরোয়া নেই।"

মহতো দুঃখ করে বলে আমারই হয়েছে বিপদ। তামাক বিড়ি না খেলে এক ঘণ্টাও চলে না। বুঝি অতি খারাপ জিনিস তামাক। তার উপর আজকাল আবার শুনছি, অনেক জায়গায় গরুর রোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে তামাকে···বলেই সে বারকয়েক কেশে থুতু ফেলে—যেন তার গলায় একটা রোঁয়া তখনও লেগে রয়েছে······

'ছড়িদার' বলে—"বুঝি তো সব! রামজীর দেওয়া শরীর, তামাকের পাতা দিয়ে তৈরি কোন রকম জিনিস, নিতে চায় না। খয়নি খাও - থুথুর সঙ্গে ফেলে দিতে হবে; নস্যি নাও নাক ঝেড়ে ফেলতে হবে; জর্দা খাও, পানের পিচ ফেলতে হবে; তামাক সিগ্রেট খাও, ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিতে হবে। এ হারামজাদার নেশা কিন্তু—ছাড়তে—পারবো না। বাওয়া, তোমারও আগে সাতদিন কাটুক তারপর বুঝবো।"

"সুরাজ (৮) অত সোজা না" বলে মহতো তামাকের প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে দেয়।

তারপর মহতো আসল কাজের কথাটা পাড়ে।—তাদের ইচ্ছে 'ভকত' হবার।

মহতো 'ভকত' হওয়ার সুবিধে অসুবিধে বেশ ভাল করে খতিয়ে দেখেছে। প্রথম অসুবিধে মাছ মাংস খেতে পাবে না। মাংস তো এক ভেড়া বলির দিন খায়—মাছ ন'মাসে-ছমাসে মরণাধারে জল এলে হয়ত এক আধবার জুটে যায়। কাজেই ওটা বড় কথা নয়। প্রত্যহ স্নান করা—এটা একটু গোলমেলে ব্যাপার বটে, কিন্তু এ কষ্টটুকু সে স্বীকার করতে রাজি আছে। একমাত্র সত্যিকারের অসুবিধা যে, সে ভকত ছাড়া আর কারও বাড়ি ভোজে কাজে খেতে পারবে না। কিন্তু এর বদলে সে পাবে অনেক কিছু। লোকের চোখে

সে বন্ধ হয়ে যাবে। এমনিই মহতো, ছড়িদার, নায়েবদের সম্বন্ধে লোকে কিছুদিন থেকে অল্প অল্প স্পষ্ট কথা বলতে আরম্ভ করেছে। এ জিনিস আগে ছিল না। ঐ তো সেদিন খোঁড়া চথুরী পঞ্চায়তীর মধ্যে চেঁচিয়ে কি সব বলে দিল। খারাপ হাওয়ার দিন আসছে। মহতো নিজের জায়গা আরও একটু মজবুত করতে চায়। বছরে একদিন মাছ খাওয়া ছেড়ে যদি লোকের মুখ বন্ধ করা যায়, তাহ'লে মহতোগিরি থেকে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে নেওয়া যেতে পারে। তাহ'লে তার সমাজে পসার প্রতিপত্তি অনেক বাড়বে, চাইকি সে তার আগের মহতো মুমুলালের সমান হয়ে যেতে পারে খ্যাতিতে।

তাই তারা এসেছে বাওয়ার সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে।

ঢোঁড়াইয়ের কথাটা একটুও ভাল লাগে না। এ যেন তাদের ঘরের জিনিসে বাইরের লোক হাত দিচ্ছে। রবিবারে রোজগার বন্ধ করবার সময় বাওয়ার সলার দরকার ছিল না, আর এখন নিজের গরজ পড়েছে, আর দরকার হয়েছে বাওয়ার সলার। বাওয়া যদি না বলে দেয় তো বেশ হয়।

বাওয়াও আবার অদ্ভুত ধরণের 'জীব'। সে খুব খুশী হয় ছড়িদার আর মহতোর প্রস্তাবে। তাদের পিঠ চাপড়ে হেসে অস্থির। আঙুলের করগুণে, আকাশের দিকে দেখিয়ে, মাথার চুল দেখিয়ে, বুঝিয়ে দেয়, রবিবারে সকালে স্নান করে এলেই, বাওয়া তাদের গলায় তুলসীর মালা দিয়ে দেবে।

ঢোঁড়াই বাওয়ার উপর রাগে গজরায়। ওঁর আবার পা টিপে দেবে! মহতোর মত লোক ভবত হলে আর সে চায় না ভকত থাকতে।

টীকা:—

(১) মার্কার কথা—কথার মত কথা।
(২) পর্বের দিন।
(৩) পেট কেটো না—রোজগার মেরো না
(৪) মুখিয়া—(মুখ্য শব্দ হইতে) মাতব্বর।
(৫) 'পাক্‌সাফ'—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন
(৬) সাগাই—সাঙা
(৭) বরহমভূতবালা—ব্রহ্মদৈত্য থাকেন যে গাছে।
(৮) সুরাজ—স্বরাজ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

তাৎমা ধাঙড় সংবাদ

ঢোঁড়াই ঠিক বোঝে না গানহী বাওয়াকে। মহতো আর ছড়িদার ভকত হবার পরদিনই দেখা গেল, গানহী বাওয়া তাদেরই উপর সদয়, ঢোঁড়াইয়ের উপর নয়।

সকালে স্নান করেই মহতো আর ছড়িদার তাৎমাটুলির মোড়ের উপর খানিকটা জায়গা বেশ করে লেপতে বসে, গোবর দিয়ে। সেখানে রাখে একটা ঘটি। তারপর ঘটিতে খানিকটা জল ঢেলে দেয় মহতো। রতিয়া 'ছড়িদার' ঘটির উপর গামছা ঢাকা দিয়ে তার উপর তিনটে তুলসীপাতা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মহতো মনে মনে গানহী বাওয়ার মন্তর পড়তে থাকে।

প্রণাম করে গামছা সরানোর পর দেখা গেল যে, গানহী বাওয়া ঘটির জলে এসেছেন ; জল বেড়ে গিয়েছে ; ঐ তো বেড়ে গিয়েছে, চোখে দেখছিস না। দু আঙ্গুল তো জল ঢালা হয়েছিল মোটে। সত্যিই তো ! ছুঁস না, ছুঁস না ঘটি ; ও জল আবার সৌরা নদীতে দিয়ে আসতে হবে।

ঢোঁড়াইয়ের হিংসে হয় মহতো আর ছড়িদারের উপর। অরা ভকত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গানহী বাওয়াকে আনাচ্ছে। সে নিজেও চুপি চুপি থানে চেষ্টা করে দেখে। কিন্তু তার ঘটিতে গানহী বাওয়া আসেন না—জল সেই যেমন তেমনিই আছে। গানহী বাওয়ার এই একচোখোমি তার মনে বড় আঘাত দেয়। কিন্তু সে একথা প্রকাশ করতে পারে না কারও কাছে ; তার 'ভকত'গিরির তাকৎ নেই, একথা লোকে জানলে, সে ছোট হয়ে যাবে পাড়ার লোকের কাছে।

কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সেদিনকার প্রার্থনা বোধ হয় গানহী বাওয়া শোনেন। মহতো আর ছড়িদারকে ধাঙড়রা 'আচ্ছা রকম' বেইজ্জত করে। রবিবারের দিন দুপুরে মহতোর দল গিয়েছিল, নতুন তুলসীর মালা দেখাতে ধাঙড়টুলিতে। ধাঙড়দের সঙ্গে আসল ঝগড়া তাৎমাদের রোজগার নিয়ে। তারা সব কাজ করতে রাজী। তার উপর সাহেব পাদ্রী, বাবুভাইয়ারা, কপিলরাজা সকলেই ছিল তাদের দিকে। কপিলরাজার জন্যে বড় শিমূলগাছগুলো একেবারে নির্মূল করে

দিয়েছিল তারা। লড়ায়ের আমলে লার জন্য কুলের ডাল্ কাটতো কপিল রাজার জন্য তারাই। শুয়োরখোর, মুর্গীখোর লোকগুলোকে গানহী বাওয়ার নামে নিজেদের প্রতিপত্তি দেখাতে গিয়েছিল দুই নতুন 'ভকত'। গিয়েই তাদের বলে যে, তোদের শুয়োর-মুর্গী ছাড়তে হবে—গানহী বাওয়ার হুকুম। মাস্টারসাবও সম্বরার (১) থেকে বেরিয়ে বলেছে। জয়সোয়াল সোডা কোম্পানীতে কাজ করে বুড়ো এতোয়ারী। সে কোকলা দাঁতে হেসেই কুটি কুট। আরে গানহী বাওয়া তোদের 'খত' (২) দিয়েছে নাকি রে? তাহলে ডাকপিয়ন এসেছে বল, তোদের পাড়ায়। শনিচরা ধাঙড় বলে—"লে ডিগি ডিগি! তাই বল! 'মহতো 'ভকত' হয়েছিস। ছড়িদারও দেখছি তাই। 'বিলি ভকৎ আর বগুলা ভকৎ'! (৩) তাই গানহী বাওয়ার হুকুম ফলাতে এসেছিস। পরশুও তো ছড়িদারকে 'কলালীতে' (৪) দেখেছি সাঁঝের পর।

"মিছে বলিস না খবরদার! জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেবো।"

"আয় না মরদ দেখি।"

এতোয়ারী শনিচরাকে চুপ করতে বলে। তারপর মহতোকে পরিষ্কার বলে দেয় যে, সাহেব-মেমদের কাছে শুয়রের মাংস, আর মুর্গীর ডিম বেচে তাদের পয়সা রোজগার হয়। গানহী বাওয়া যদি আমাদের 'পেট কাটেন', তাহলে তিনি তোমাদেরই থাকুন! আর 'পচই' আমাদের পূজোয় লাগে; ও ছাড়তে পারব না। মাস্টারসাব 'বাবুভাইয়া' লোক। তাঁদের যা করা সাজে, আমাদের তা করা সাজে না। ঐ যে সেবার "টুরমন"এর তামাসা (৫) হল ঝিকটিহার মাঠ ঘিরে, তাতে যে 'রংরেজ জার্মান লড়াই (৬) হল;—আমাদের ভিতরে যেতে দিয়েছিল? তোদের যেতে দিয়েছিল? 'গিরানী'র দোকানের (৭) সস্তা চাল, তোদের দিত সে সময়? এস. ডি. ও. সাহেবের সরকারী কাছারীর দোকানের 'লাট্টু মার', আর পেয়ারা মার্কা "রৈলী" (৮) আমাদের দিয়েছে কোন দিন? আর রোজ স্নান করা,—তোরা আজ 'ভকত' হয়ে করছিস। আমাদের মেয়েরা পর্যন্ত চিরকাল প্রত্যহ স্নান করে এসেছে। মহতো আর তার দল চটে আগুন হয়ে যায়। আমাদের মেয়েছেলেদের উপর ঠেস দিয়ে কথা। ঐ মেমসাহেব—ধাঙড়ানীদের দিস পাঠিয়ে সাহেব টোলায়, আর ঐ

মুসলমানদের বাড়িতে, যাদের সঙ্গে মিলে তোরা শিমূলগাছগুলো সাবড়ে দিয়েছিস। পাঠিয়ে দিস শনিচরার বৌটাকে, মর্লি সাহেবের পাকা চুল তুলে দিতে।

তুলমারী কাণ্ড আরম্ভ হয়ে যায়। কারও কথা বোঝা যায় না হট্টগোলের মধ্যে। তাৎমাদের সজীব গালির তোড়ে ধাঙড়রা থই পায় না। শেষকালে একরকম দিশেহারা হয়েই তারা তাৎমাদের তাড়া করে। চিরকালের অভ্যাস মত আজও তাৎমারা পালায়। সোজা 'পাক্কীর' দিকে, লাঠি ফেলে, টিকি উড়িয়ে, পাক্কীর পাথরে হোঁচট খেয়ে; পালা পালা! তারপর রাস্তা পার হয়ে, তারা পাক্কীর তাৎমাটুলির দিকের গাছের সারির নীচে,—রাস্তার মাটিকাটার গর্তর মধ্যে দাঁড়ায়। এখানে অ.ব.র নতুন 'মোর্চাবন্দী' করে (৯) তারা গালাগালির লড়াই আরম্ভ করে। ধাঙড়রা হাসতে হাসতে ফিরে যায়। তাদের চিরকালের নিয়ম, তারা পাক্কী পার হয়ে গিয়ে কখনও তাৎমাদের সঙ্গে মারপিট করে না। কেবল চীৎকার করে বলে যায়, "হাভেলী পরগণায়" (১০) পৌঁছে দিয়েছি সঙ্গে করে। 'সিন্দুর' লাগাস, 'সিন্দুর' (১১)। দুই ভকতে। "বিল্লি ভকৎ আর বগুলা ভকৎ। দু'জনের গলার হার দুটো দেখাতে ভুলিস না ঝোটাহাদের।" তারপর ধাঙড়রা ফিরবার সময় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, শালাদের রক্তর কি ঠিক আছে? সন্ধ্যার সময় দেখিস না কত বাবুভাইয়ারা, তাৎমাটুলির আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করে। সাহস আসবে কোথা থেকে? সব রক্ত পানি হয়ে যাচ্ছে। হত আমাদের টোলা, দিতাম বাবুদের মজা টের পাইয়ে। বাবুভাইয়ারা মিহি চালের ভাত খায়, গরু দেখলে ভয় পায়।

শনিচরা বলে, "বিয়ের আগে আমিও তো কত বাবুভাইয়ার বাড়ি ভাত খেয়েছি! এত সাদা চাল! একদম মিঠা না। সেরভরের কম ও চালে পেটই ভরে না। তারপর এক লোটা জল খাও। আধ ঘণ্টার মধ্যে সব ফুস্‌-স্‌স্‌।"—বলে সে একটি তুড়ি দেয়।

একমাত্র শুক্রা ধাঙড় এই অনধিকার চর্চার প্রতিবাদ করে। "জানিস, মিহি চাল খেলে বুদ্ধি খোলে। ঐ মিহি চালের জোরেই বাবুভাইয়ারা গেলে হাকিম

বসতে "কুর্সি" দেয়। তোকে আমাকে দেয়? তাৎমাদের দেয়? এসব টোলায় ডাক পিয়ন আসে চিঠি নিয়ে? যা রয় সয় তাই বলিস।"

তাৎমা খেদানোর উল্লাসের মধ্যে শুক্রা কি সব বাবুভাইয়াদের কথা এনে সমস্ত জিনিসটাকে তেতো করে তুলেছে।

বুড়ো এতোয়ারী লাল চাল খেলেও বেশ বুদ্ধিমান। সে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে বলে, "চল চল। সিঙ্গাবাদ থেকে শনিচরা নতুন মাদল এনেছে। মুচিয়ার মাদল কোথায় লাগে এর কাছে। চল শীগ্‌গির খেয়ে দেয়ে বাঙ্গা গাছের তলায়। ঘুঁটে ধরিয়ে আনতে ভুলিস না শনিচরা। শীগ্‌গির"।

বিরৌলীকে হাটিয়া—আ—

দৌড়ে দোকানিয়া—আ—

ঠস ঠস রে বোলে বুনিয়া—আ-আ-আ-আ...(১২)।

জলদিরে জলদি!

টীকা:—

(১) সাসুরার—শ্বশুরবাড়ী; এখানে জেলখানা

(২) চিঠি

(৩) বিড়াল তপস্বী আর বক ধার্ম্মিক

(৪) মদের দোকানে

(৫) টুরমনের তামাসা—১৯১৭ সালে কয়দিনব্যাপী একটি উৎসব হয় জিরানিয়াতে যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রচারের জন্য। ইহার নাম ছিল ডিষ্ট্রিক্ট টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্ট হইতে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়।

(৬) বুংরেজ—ইংরাজ; টুর্নামেন্টে ইংরাজ-জার্ম্মানদের mockfight হইয়াছিল।

(৭) যুদ্ধের সময়ের গভর্নমেন্ট ষ্টোরস; এখানে সস্তায় জিনিস পাওয়া যাইত।

(৮) লাট্টু মার্কা আর পেয়ারা মার্কা র‍্যালি ব্রাদার্সের কাপড়।

(৯) ব্যূহ রচনা করে

(১০) রাস্তার এ পারটা পড়ে হাভেলী পরগণাতে; আর হাভেলী কথাটার অর্থ অন্দর মহল; ইহা লইয়াই ধাঙ্গড়রা বিদ্রূপ করে।

(১১) সিঁদুর

(১২) ধাঙ্গড়দের দ্রুততালের গান। বিরৌলীর হাটে দৌড়ুচ্ছে দোকানদার, বোঁদে (মিষ্টান্ন) থেকে ঠস্ ঠস্ শব্দ হচ্ছে।

সামুয়রের ভৎ´সনা

ঢোঁড়াই বড় হয়ে উঠছে। আর সে তাৎমাটুলির অলিতে গলিতে "কনৈল খেলার ঘুচ্চী" (১) কাটে না, বাঁশের চোঙের মধ্যে দরদময়দার ফল দিয়ে বন্দুক ফোটায় না, মোরব্বার (২) পাতা দিয়ে ঘর ছাইবার খেলা খেলে না। ও সব বাচ্চারা করুক। সে এখন মোহরমের সময় ফুদীসিংয়ের দলে 'মাতুম' গায় (৩) ঢুল ঢুল ঘোড়ার মেলায়—

হিন্দু মুসলমান ভাঁইয়া, জোরহুঁ রে পীরিতিয়া

রে ভাই, হায় রে হায়! (৪)

বর্ষা শেষ হলেও যেমন মরণাধারে জল থেকে যায়, গানহী বাওয়ার হাওয়া পড়ে আসবার পরও সেই সময়ের রেশ রেখে যায় এই মাতুমগানে।

মরগামার তাৎমাদের 'ঘুগিরা' (৫) নাচের দলে তাকে নিয়ে টানাটানি। মরগামার ওরা 'মুঙ্গেরিয়া তাৎমা', আর তাৎমাটুলির তাৎমারা, 'কনৌজিয়া তাৎমা'। মুঙ্গেরিয়া তাৎমারা জাতে ছোট বলে, তাদের সঙ্গে এত মাখামাখি— তাৎমাটুলির লোকরা পছন্দ করে না।

কিন্তু, ও ছোঁড়া কি কারও কথা শুনবে। ধাঙ্গড়টুলির 'কর্মাধর্মার' নাচের মধ্যে পর্যন্ত গিয়ে বসে আছে। ধাঙ্গড়টুলিতে যাওয়াই ছাড়লো না—অন্য জায়গায় যাওয়া ছাড়লো কি না ছাড়লো—তাতে কি আসে যায়।

বাওয়া মনে মনে এক বিষয়ে খুশী, যে ধাঙ্গড়টুলি থেকে আম, লিচু নানারকম কল ঢোঁড়াই নিয়ে আসে—এমন এমন জিনিস যা তাৎমারা কোনদিন দেখেও নি। ধাঙ্গড়রা সাহেবদের বাগান থেকে এই সব কলম চুরি করে এনে লাগিয়েছে। তারা তাদের সনবেটাকে (৬) খাওয়ার জন্য দেয়। ঢোঁড়াই আবার সেসব, পাড়ার তার দলের ছেলেদের এনে দেয়, বাওয়ার জন্যে রেখে দেয়। কার সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের আলাপ না। 'কালো ঘাগরাওয়ালী' পাদ্রী মেম যিনি ধাঙ্গড়টুলিতে আসেন, তার সঙ্গে পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের আলাপ।

বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের সব দোষ সহ্য করে যায়, কিন্তু ঐ রোজগারে বার হওয়ার সময় যে অধিকাংশ দিনই তার টিকি দেখার জো নেই, এ জিনিসটা সে সহ্য করতে

পারে না। ভিক্ষের রোজগারে ঢোঁড়াইয়ের কেমন যেন একটু কুণ্ঠিত ভাব অন্তর কাছে, এটুকু বাওয়ার দৃষ্টি এড়ায়নি। সেইজন্যই বাওয়ার চিন্তা সব চাইতে বেশী। ভোরে উঠেই ছোঁড়া পালিয়েছে। তার বন্ধুরা তো সব রোজগারে বেরিয়েছে, ওটা কোথায় থাকে, কি করছে এখন, বাওয়া কিছুই ঠিক করতে পারে না। ঢোঁড়াই হয়ত তখন মরণাধারের কাঠের সাঁকোটির উপর পা ঝুলিয়ে বসে বকের পোকা খাওয়া দেখছে। মন উড়ে গিয়েছে কোথায় কোন স্বপ্নরাজ্যে ····বিজা সিং চলেছেন, ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন কুয়াশার রাজ্যের মধ্যে দিয়ে······অসংখ্য জোনাকি মিট্ মিট্ করে জ্বলছে অন্ধকারে······সে তার চাইতেও জোরে চালাবে রেলগাড়ি······কোথায় চলে যাবে এঞ্জিনের 'সিটি' দিতে দিতে। বাওয়ার দেখাশুনো করবে দুখিয়ার মা;······না ও মাগীর দায় পড়েছে।··বিজা সিং যদি তরোয়াল দিয়ে দুখিয়ার মা আর বাবুলালকে কেটে ফেলে।······

এমনভাবে বকগুলো পা ফেলে যে, দেখলেই হাসি আসে—'বগুলা চুনি চুনি খায় (৭)······মরগামার 'লছমী গোয়ারিন' (৮) যাচ্ছে ঐ দূরে পাক্কীর উপর দিয়ে। শুঁটকো হাঁটুর উপর কাপড় তুলে দিয়েছে—বোধ হয় রাস্তায় কাদা, ঠিক বকের চলার মত করে চলছে···"গে-এ এ···লছমী গোয়ারিন! বগুলা চুনি চুনি খায়।" বলে ঢোঁড়াই নিজেই হাসে। লছমী গোয়ারিন এদিকে তাকায়—বোধ হয় কথাটা বুঝতে পারে না। হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, যাচ্ছি টৌনে।····· বকটা ঘাড় কাত করে অতি মনোযোগের সঙ্গে কি যেন একটা গর্ত না কি লক্ষ্য করছে। ভিক্ষা পাওয়ার পর চলে আসবার সময়, বাওয়াও ঠিক অমনি করে, এক মুঠো চাল হাতে নিয়ে, ঘাড় কাত করে দেখে—চালটি ভাল না খারাপ। চাল খারাপ হলে বাওয়ার মুখ অমনি অন্ধকার হয়ে ওঠে। সে চাল কটিকে ঝুলির মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে, জোরে জোরে পা ফেলতে আরম্ভ করে। ত্রিশূলের সঙ্গে লাগানো পিতলের আংটাটা ঝমড় ঝমড় করে বাজে। ঢোঁড়াইয়ের মুখ দুষ্টুমির হাসিতে ভরে ওঠে।······

ছাই রঙের ডানাওয়ালা বকগুলিকে সাদা বকরা নিশ্চয়ই দেখতে পারে না। বাবুভাইয়ারা কি তাৎমা ধাঙ্গড়দের সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু ছাই রঙের ডানা হয়েছে বলে কি তার 'হুক্কা পানি' (৯) একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। 'বগুলা ভকৎ' (১০) দেখতে ঐ ভাল মানুষ, কিন্তু তার পেটে পেটে শয়তানী

"আরে বগুলা ভকৎ কি করছিস, বকের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে?"--- সামুয়র হাসতে হাসতে ঢোঁড়াইকে জিজ্ঞাসা করে।

ঢোঁড়াই চমকে উঠেছে। সামুয়রটা কোন দিক থেকে এসে গেল, ঢোঁড়াই অন্যমনস্ক থাকায় খেয়াল করেনি এতক্ষণ। এই খাঁকির হাফপ্যান্ট পরা কিরিস্তান ধাঙ্গড় ছেলেটা কি 'গুণ' (১১) জানে নাকি? না হলে হটাৎ তাকে বগুলা ভকৎ বলে ডাকলো কেন? সেও যে ঠিক ভকতের কথাটাই ভাবছিল। ঐ পাদরী সাহেবের 'টাট্টু' (১২) সামুয়রটা কি তাকে এক দণ্ডও নিরিবিলিতে থাকতে দেবে না। তার আসল নাম স্যামুয়েল, বয়সে ঢোঁড়াইয়ের চেয়ে দু'এক বছরের বড়; ফুটফুটে ফরসা, নীল চোখ, কটা চুল, মুখে বিড়ি, চোখে মুখে কথা, দরকারের চাইতে বেশী চটপটে; শুয়রের কুঁচির মত খাড়া অবাধ্য চুলগুলিতে জবজবে করে সরষের তেল মেখে টেড়ি কেটেছে। জেমসন সাহেব নীলকুঠিবহুল জিরানিয়াতে, নীলকুঠির পড়তি যুগে একটা পাঁউরুটির কারখানা খুলেছিল। পরে সে স্নানের ঘরে, ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটে আত্মহত্যা করে। তার ভিটের মিষ্টি কুলের গাছটা তাৎমা আর ধাঙ্গড় ছেলেদের লোভ আর ভয়ের জিনিস। মিষ্টি ফলের তুলনা দিতে গেলেই তারা বলে, 'গলাকাটা সাহেবের' হাতার কুলের মত মিষ্টি। দিনের বেলাতেও রাখাল ছেলেরা একলা সে গাছের তলায় বসতে ভয় পায়। সেই 'গলাকাটা' সাহেবের মেমকে পাঁউরুটি তৈরী করতে সাহায্য করত, সামুয়রের দিদিমা। 'গলাকাটা সাহেব' পান খেত, গড়গড়া টানতো। সামুয়রের দিদিমার স্নানের জায়গার জন্য চুনার থেকে নৌকোয় করে একটা চৌকোণা পাথর এনে দিয়েছিল। সেটা এখনও পড়ে আছে সামুয়রদের বাড়ির উঠনে। কালো ঘাগরাওয়ালী পাদ্রী মেম, ধাঙ্গড়টুলিতে এলে, ঐ পাথরখানার উপরেই তাঁকে বসতে দেওয়া হয়।

আবলুসের মত কালো সামুয়রের দিদিমার যখন ফুটফুটে মেমের মত রঙের মেয়ে হয়, তখন সেইজন্যে কেউ আশ্চর্য হয়নি।

সামুয়রও পেয়েছে মায়ের রঙ।

"কিরে বগুলা ভগৎ, আজকে রবিবার। আজ যে বড় বৌকা বাওয়ার সঙ্গে ভিক্ষে করতে বেরুসনি?"

প্রশ্নটিতে ঢোঁড়াইয়ের যেন একটু অপমান অপমান বোধ হয়।

"কারও চাকরও না, কারও পয়সাও ধার করিনি। তোদের মত তো নয় যে, আজকে গির্জায় যেতেই হবে, নইলে পাদ্রী সাহেব দুধ বন্ধ করে দেবে।"

"আরে যা যা! 'লবড় লবড়' (১৩) বলিস না। বাড়ি বাড়ি থেকে চাল ভিক্ষে করার চেয়ে পাদ্রী সাহেবের দেওয়া দুধ নেওয়া ঢের ভাল।"

"মুখ সামলে কথা বলিস। চুকন্দর (১৪) কোথাকার। সাধু সন্তকে কি লোকে ভিক্ষে দেয় নাকি? ও তো গেরস্তরা রামজীর হুকুম মত সাধুদের কাছে নিজেদের ধার শোধ করে। না হলে বাওয়া কি 'বরমভূত'কে দিয়ে মরণাধারের নীচ থেকে আশরফির ঘড়া বার করতে পারে না।"

"থাক থাক, তোর বাওয়ার মুরোদ জানা আছে। সেবার যখন টোলায় পিশাচের উপদ্রব হল, কোথায় ছিল তোর বাওয়া। রেবণ গুণী "তুক" করে, যেই না বালি ছুঁড়ে 'বাণ' মারা (১৫) অমনি সেটা একটা বিরাট বুনো মোষ হয়ে কাশবনের মধ্যে থেকে মরণাধারে ঝাঁপ দিল। তার চোখ দুটো দিয়ে আগুন বেরুচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করিস তোদের মহতোকে।"

এই অকাট্য যুক্তির সম্মুখে আর ঢোঁড়াইয়ের তর্ক চলে না, কিন্তু বাইরের লোকের মুখে বাওয়ার নিন্দা সে কখনই সহ্য করতে পারে না।

"থাম, থাম। ফের ছোট মুখে বড় কথা বলবি তো, পিটিয়ে তোর সাদা চামড়া আমি কালো করে দেবো। গির্জেতে যে টুপিতে করে পয়সা নিস তার নাম কি? তুই নিজেই তো দেখিয়েছিস।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানা আছে সব শালা তাৎমাদের।"

"বিল্লির মত চোখ, কিরিস্তান, তুই জাত তুলে গালাগালি দিস্!" ঢোঁড়াই সামুয়রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। "আর বলবি? বলবি? বল।"

সামুয়রকে "না" বলিয়ে তবে ঢোঁড়াই তাকে ছেড়ে দেয়। সামুয়র যেতে যেতে গায়ের ধূলো ঝাড়ে—আর যাওয়ার সময় বলে যায় যে, আজ রবিবার না হলে দেখিয়ে দিতাম।

এ ঢোঁড়াইয়ের জীবনের প্রতিদিনের ঘটনা; কিন্তু অন্য তাৎমার মত সে

গায়ে পড়ে ঝগড়া আরম্ভও করে না, আর ঝগড়া একবার আরম্ভ হয়ে যাবার পর সে পালায়ও না।

টীকা :—

(১) কঙ্কেফুলের বীচি দিয়ে খেলার জন্য গর্ত

(২) মোরব্বা—aloe—আনারসের মত পাতা দেখতে

(৩) মহরমের শোকের গীত—এর প্রতি লাইনের শেষে, হায়রে হায়, কথা কয়টি থাকে

(৪) হিন্দু-মুসলমান ভাই, প্রীতির বন্ধনে বাঁধোরে ভাই, হায়রে হায়

(৫) যুগিরা—একপ্রকার গ্রাম্য গীতিনৃত্য

(৬) সনবেটা—ধর্ম-ছেলে

(৭) বক বেছে বেছে খায়

(৮) লম্বী গোয়ারিন—লম্বা গয়লানী

(৯) হুঁকো জল। ইহার অর্থ একঘরে করা

(১০) বকধার্ম্মিক

(১১) গুণ—ইন্দ্রজাল

(১২) আদুরে গোপাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দার্থ টাট্টু ঘোড়া

(১৩) লবড় লবড় বলা—বাজে বকা

(১৪) চুকন্দর—বীটপালং

(১৫) যাদুবিদ্যার প্রক্রিয়া বিশেষ

পঞ্চায়েত কাণ্ড

ঢুখিয়ার মায়ের খেদ

অনেকে ঢুখিয়ার মা না ব'লে, বলে 'বাবুলালকা-আদমী' (১)। কথাটা খুবই ভাল লাগে ঢুখিয়ার মার, বিশেষ করে যখনই আপিসের উর্দিপাগড়ি পরা বাবুলালের চেহারা তার মনে আসে। এমন মানায় এ পোষাকে বাবুলালকে। বুধনী ভাবে পাড়ার সকলে হিংসেয় ফেটে পড়ছে। ঢুখিয়ার মাকে রোজগার করতে হয় না বলে সত্যিই পাড়ার মেয়েরা তাকে হিংসে করে। এত লোকের বিষের নজর এড়িয়ে ঢুখিয়াটা বাঁচলে হয়! বড় হ'লে সেও আবার উর্দিপাগড়ি পরে, বাবার জায়গায় কাজ কববে। ও কাজের কি সোজা ইজ্জৎ! ঢুখিয়ার মা বাবুলালের কাছে শুনেছে, যে চেরমেনসাহেবের ঘরে,—না না চেরমেনসাহেব বললে আবার আজকাল বাবুলাল চটে, আজকাল বলতে হবে রায়বাহাদুর, ঘণ্টায় ঘণ্টায় নাম বদলালে আর মনে না থাকার দোষ কি?—যে রায়বাহাদুরের ঘরে ঠিকেদার সাহেববা, গুরুজীবা পর্যন্ত ঢুকতে পায় না, সেখানে বাবুলালের অবারিত দ্বার। গর্বে ঢুখিয়াব মার বুক ফুলে ওঠে। আজ সে আপিস ফেরৎ বাবুলালকে ভাল করে খাওয়াবে। তাই সে তাল গুলতে বসে। তার ভিতব গুড় আর চুনের জল দিয়ে সে বরফি করবে। রায়বাহাদুরের ডেরাইভারই কত বড় লোক, না হ'লে কি আর তার বৌয়ের ছেলে হওয়ার সময়, বাবুলাল চাপরাশী রাতদুপুরে চামারনী ডাকতে ছোটে। ডেরাইভারসাহেবই তো ধন্‌্যা মহতোর সমান 'অকতিয়ারের' (২) লোক। সেই ডেরাইভারসাহেবকেও চাকর রাখে রায়বাহাদুর। এত বড় লোকটিকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে একবার ঢুখিয়ার মার। কত কথা সে শুনেছে তাঁর সম্বন্ধে বাবুলালের কাছ থেকে। যেই ঘন্টিতে হাত দেবে অমনি বাবুলাল চাপরাশীকে সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে 'হজৌর'। আজব ঢুনিয়াটা। বড়র উপরও বড় আছে।

রায় বাহাদুরের উপরেও আছে দারোগা, কলস্টর……ঢোঁড়াইয়ের বাপের কথা হঠাৎ বুধনীর মনে পড়ে—সেই ঢোঁড়াই যেবার হয় হয় সেইবার কলস্টর দেখে এসেছিল। বাবুলালের মত এত "ইজ্জৎদার আদমী" (৩) ছিল না বটে, কিন্তু ছিল বড় ভালমানুষ।……এক রত্তি ঢোঁড়াইকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে সুর করে গাইত—"বকড়হাট্টা; বরদ্ বাট্টা; সো যা পাঠ্ঠা"……। সে আর আজ ক'দিনের কথা।' তবু সে সব ঝাপসা মনে পড়ার দাগগুলো পর্যন্ত একরকম মুছে গিয়েছে। অনুতাপ নয়, তবুও কোথায় যেন একটু কি খচ্ খচ্ করে বেঁধে……

খাবারের লোভে দু'একজন করে দুখিয়ার বন্ধুরা এসে জড় হয়। সকলেই এক একটা তালের আঁটি চুষছে। কার তালের দাড়ি কত বড় তাই নিয়ে ঝগড়া জমে উঠেছে, কিন্তু নজর সকলেরই রয়েছে দুখিয়ার মার দিকে।

"নে দুখিয়া। নে নে তোরা সকলে আয়; একটু একটু নে। যা, এখন ভাগ্, জলদি!"

এক দণ্ড নিশ্চিন্দি নেই এদের জ্বালায়। পাড়া শুদ্ধ শুয়রের পালের মত ছেলেপিলেকে দুখিয়ার মা তালের মিঠাই খাওয়ালো। কিন্তু ঢোঁড়াই! ঢোঁড়াইয়ের কথা তার আজ বড্ড বেশী করে মনে পড়ছে অনেক দিনের পর। বহুদিন তার খোঁজখবরও করা হয় নি। পথে ঘাটে মধ্যে মধ্যে দেখা হয়। ছোঁড়া পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে। যাক ছোঁড়া ভাল থাকলেই হল। গোঁসাই থানের মাটির কল্যাণে আর বাওয়ার আশীর্বাদে ছেলেটা বেঁচে বর্তে থাকলেই হল। সে আর ও ছেলের কাছ থেকে কি চায়।

অনেকদিন ছেলেটাকে কিছু খাওয়ানো হয়নি। বাড়িতে ডেকে পাঠালেও আসবে কি না কে জানে। দুখিয়ার মা একখান কচুপাতায় করে খানকয়েক তালের বরফি নিয়ে, গোঁসাইথানে যাবে বলে বেরোয়।……সে ছোঁড়া কি আর এখন গোঁসাইথানে আছে। হয়ত মুখপোড়া ধাঙড় ছেলেগুলোর সঙ্গে 'পাক্কীতে', বিসারিয়া থেকে যে নতুন "লৌরী" (৪) খুলেছে, তাই দেখতে গিয়েছে। 'লৌরী' আসবার সময় ওরা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, না হয় রাস্তার উপর গাছের ডাল ফেলে পালিয়ে আসে। একদিন ধরবে তালে মহলদার 'রোড সরকার' তো মজা টের পাইয়ে দেবে।……ঢোঁড়াই এখন কত বড় হয়ে উঠেছে। কেমন

সুন্দর স্বাস্থ্য।……ওই তালে মহলদার, ডিষ্টিবোর্ডের রোড সরকার, যার নাম করে বাবুলাল 'পাক্কীর' পাকা অংশটির উপর দিয়ে গরুর গাড়ী যেতে দেখলে, গাড়োয়ানের কাছ থেকে পয়সা আদায় করে; তারপর দুজনে আধাআধি ভাগ করে নেয়,—সেই তালে মহলদার একদিন ঢোঁড়াইকে দেখে ধাঙড়দের ছেলে বলে ভেবেছিল, ভুল ধরিয়ে দিলে বলেছিল যে, এমন 'পাঠ্‌ঠা যোয়ান' তো তাৎমার ছেলে হয় না। লোকটা অন্ধ না-কি! ঢোঁড়াইয়ের রঙ ধাঙড়দের মত কালো নাকি? সামুয়রের মত ফর্সা না হলেও আখার মত কালোও তো না। মকস্থদনবাবুর রঙের সঙ্গে ওর রঙের মিল থাকতেও পারে; বলা যায় না……ঐতো বাগভেরেণ্ডা গাছের ফাঁক দিয়ে বৌকা বাওয়ার কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে গোঁসাইথানে।……আ মর, মহতোর ছাগল কিনা তাই সাধারণ লোক দেখে আর পথ থেকে সরবার নাম নেই! হট্‌! হট্‌!……

"আরে কোথায় চললি দুখিয়ার মা?"

"এই একটু ঐদিকে, কাজ আছে।" এতদিনের অনভ্যাসের পর ঢোঁড়াইয়ের কাছে যাচ্ছি বলতে সঙ্কোচ লাগে লোকের কাছে।··আজ আর কেউ তাকে ঢোঁড়াইয়ের মা বলে ডাকে না। অথচ ঢোঁড়াই হচ্ছে প্রথম ছেলে;—তার দাবিই সবার উপর। সেই প্রথম ছেলে হওয়ার আগের ভয়, আনন্দ, বুড়ো মুন্নুলাল মহতোর বৌয়ের আদর যত্ন বকুনি, কত নতুন অনুভূতি আকাঙ্ক্ষা মেশানো—ঢোঁড়াইয়ের পৃথিবীতে আসার সঙ্গে। সব সেই পুরোনো অস্পষ্ট স্মৃতিগুলোর হালকা ছোঁয়াচ লাগছে মনে।……না ঐতো দেখা যাচ্ছে ঢোঁড়াইকে, বাওয়ার লোটা মাজছে। আজ ভাগ্যি ভাল। বাওয়া আজ তাকে দুপুরে বেরুতে দেয়নি দেখছি।……

কিন্তু এ ভিক্ষে করে আর কতকাল চলবে?……

"এই বাওয়ার 'দর্শন' করতে এলাম"—বলে দুখিয়ার মা গোঁসাইথানের মাটির বেদীটাকে প্রণাম করে। তারপর বাওয়াকে বলে, "পরণাম"। বাওয়া আগেই আড়চোখে তার হাতের কচুপাতার মোড়কটা দেখে নিয়েছে। দুখিয়ার মা যে ঢোঁড়াইয়ের কাছে এসেছে সে কথা প্রকাশ করতে চায় না। ঢোঁড়াইও তার দিকে না তাকিয়ে একমনে নিজের কাজ করে যায়। লোটা মাজে,

বাওয়ার ত্রিশূল, চিমটে ছাই দিয়ে ঘষে ঝকঝকে পরিষ্কার করে রাখে। তার কাজের আর শেষ নেই। একবার যখন ধরা পড়েছে, এখন গাছতলাটা ঝাঁট দেওয়ার আগে আর বাওয়ার হাত থেকে নিস্তার নেই। তারপর আবার কোন কাজ বাওয়ার মনে পড়বে ঠিক নেই। দুখিয়ার মা-টা আবার এই অসময়ে কোথা থেকে এসে জমিয়ে বসলো! কি গল্পই করতে পারে এই মেয়েজাতটা। ধমুয়া মহতোর একদিনের কথা ঢোঁড়াইয়ের বেশ মনে আছে। ধমুয়া তার স্ত্রীকে বকছিল, "কাজের মধ্যে তো ঘাস ছেলা আর উমুনের পাশে বসে লবড় লবড় বকা (৫)। চাবুকের উপর রাখতে পারলে তবে তোদের জাতের চাল বিগড়োয় না।" মহতোগিন্নি গিয়েছিল মহতোর দিকে এগিয়ে—"রামজী মোচটা দিয়েছেন বলে যা ইচ্ছে তাই বলে যাবে নাকি? চাবুক! মরদ চাবুক দেখাতে এসেছো! এসো না দেখি!"……ধমুয়া মহতোর সেইদিনের কথা ঢোঁড়াইয়ের খুব মনে ধরেছিল। মেয়েজাতটাই এই রকম! কি রকম তা সে এখনও ঠিক বুঝতে পারে না, তবে খারাপ নিশ্চয়ই। আর বাবুলালের পরিবারের উপর সব তাৎমাই মনে মনে বিরক্ত। দুখিয়ার মার নাকি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না—চাপরাশীর বৌ বলে। সে ঘাস বিক্রি করে না, কোন রোজগার করে না, পারতপক্ষে বাবুলাল তাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না; বাবুভাইদের বাড়ির মেয়েদের মত সে তার নিজের স্ত্রীকে রাখতে চায়। যখন তখন দুখিয়ার মাকে চটে মারতে যায়—তোর তাৎমানী থাকাই ভাল—তোর আবার চাপরাশীর স্ত্রী হওয়ার শখ কেন। মাথা কাটা যায় নাকি তার, দুখিয়ার মার বেহায়াপনায়……

ঢোঁড়াই গাছতলা ঝাঁট দেওয়া আরম্ভ করে। রোজ ঝাঁট দেওয়া হয় তবু এত ময়লা কোথা থেকে যে আসে সে ভেবে পায় না। পাড়ার যত ছাগলের আড্ডা, বর্ষাকালে এই গাছতলায়!

চেরমেন সাহেবের ডেরাইভারের সামনে বাবুলাল চাপরাশী চুপচাপ চোরের মত থাকে, আর বাবুলালের স্ত্রী, গোঁসাইথানে প্রণাম করতে এসেও চুপ করে থাকতে পারে না। গোঁসাই উপর থেকে সব দেখছেন। …হঠাৎ দুখিয়ার মার গল্প কানে আসে……

"......আপনারা সাধুসন্ন্যাসী মানুষ; আপনারা ভিক্ষে করেন সে এক কথা; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটাও কি সারা জীবন ভিক্ষে করে জীবন কাটাবে? ও ছেলে কি কোনদিন আপনার চেলা হতে পারবে? কিরিস্তান ধাঙড়দের সঙ্গে আলাপ, না আছে কথার "ঢং" (৬), না আছে মনের ঠিকানা, উনি আবার হবেন সাধুবাবা। অন্য ঘরের ছেলে হলে এতদিন একটা রোজগারের 'ধান্ধা' দেখে নিত। বয়সতো কম হ'ল না। ওর বয়সী ঘোতাই, গুদরতো ঘরামির কাজে বেরুনো আরম্ভ করেছে। আপনি বাওয়া ছেলেটার মাথা খেলেন..."

ঢোঁড়াইয়ের কান খাড়া হয়ে উঠেছে। বাওয়ার মুখের উপর এতবড় কথা! .....

"বলেন তো, চাপরাশী সাহেবকে বলে ঢোঁড়াইকে ডিষ্টিবোডের পাংখা টানার কাজে বাহাল করিয়ে দিতে পারি। বছরে চারমাস কাজ। আট টাকা করে পাবে। তার মধ্যে থেকে দুটাকা করে বহালীর (৭) জন্য চাপরাশী সাহেবকে দিতে হবে। বাকি টাকা তোমার হাতে এনে দেবে। বছরের মধ্যে বাকি আট মাস, কেরাণীবাবুর বাড়ী কাজ করবে। তাঁর ছেলেমেয়ে রাখবে। ওজর না থাকে তো বাওয়া বলুন। কতলোক ঐ নিয়ে চাপরাশী সাহেবের কাছে ঘোরাঘুরি করছে।"......

ঢোঁড়াই লক্ষ্য করে যে বাওয়ার মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। ঢোঁড়াই আর বাওয়ার চোখোচোখি হয়ে যায়। দুজনেরই স্বস্তির নিশ্বাস পড়ে। প্রস্তাবটি কারও মনঃপূত নয়। বাওয়া ভাবে ঢোঁড়াই করতে যাবে চাকরী! পরের ছেলেকে আপন করে নিলাম কিসের জন্য? ওর জন্য এত কষ্ট সইলাম কেন?

আর ঢোঁড়াই ভাবে শেষকালে বাবুলালের খোসামোদ করে দিন কাটাতে হবে; তার দয়ায় রোজগার! এও রামজী কপালে লিখেছিলেন? বাওয়ার সেবা করে, বেশতো তার দিন কেটে যাচ্ছে। দুখিয়ার মা'টার 'বুকের উপর মুগের দানা রগড়াচ্ছে' (৮) কে এর জন্যে। সকলেই তাকে ভিক্ষের কথা নিয়ে খোঁচা দেয়। বাবুলালের পরিবারেরও এই কথা নিয়ে দুর্ভাবনার শেষ নেই। অন্তরের থেকে সকলেই তাদের ভিখিরী ছাড়া আর অন্য কিছু মনে করে না।

বাওয়া ভাবে, দরদ! এতদিনে মায়ের দরদ উছলে উঠলো!

সে আংটা লাগানো ত্রিশূলটা দুখিয়ার মার সম্মুখে মাটিতে তিনবার ঠোকে ; তারপর তিনবার মাথা নাড়ে—না, না, না।

অপমানে দুখিয়ার মার চোখে জল এসে যায়। সে কচুপাতায় মোড়া তালের বরফি ফেলে উঠে পড়ে। কার জন্যে এত ভেবে মরি !

কার জন্য তালের বরফিগুলো এনেছিল, সে কথা আর বলা হয় না।

সে চলে গেলে বাওয়া একটু অপ্রস্তুত হয়ে ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়। ঢোঁড়াই হঠাৎ কচুপাতার ঠোঙাটা তুলে নিয়ে দূরে ঝোপের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ঝোপের নীচের ভাদ্রের ভরা নালায়, একটা ব্যাং লাফিয়ে পড়ে।

"ভিখ দিতে এসেছেন, ভিখ ! তোর দেওয়া ভিখ যে খায়, তার বাপের ঠিক নেই। ডিষ্টিবোডের পয়সা দেখাতে এসেছেন ! অমন খাবারে আমি…"

তারপর ঢোঁড়াই আর বাওয়া চুপ করে মুখোমুখি হয়ে বসে থাকে। একই বেদনায় দুটো মন মিলে এক হয়ে যায়।

টীকা :—

(১) স্থানীয়-ভাষায় 'আদমী' মানে স্ত্রী। মানুষ অর্থেও ইহা প্রচলিত
(২) অকতিয়ার—অধিকার
(৩) সম্মানিত লোক
(৪) লরী—মোটরগাড়ী
(৫) বাজে বকা
(৬) ঢং - শ্রী ; আদবকায়দা।
(৭) বহালী—নিযুক্তি
(৮) 'পাকা ধানে মই দেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত

ঢোঁড়াইয়ের যুদ্ধ-ঘোষণা

পরের দিন ভোরে উঠেই ঢোঁড়াই যায় ধাঙড়টুলিতে শনিচরার কাছে। এত ভোরে তাকে দেখে শনিচরা অবাক হয়ে যায়।

"কি রে ? সব ভাল তো ?"

"ভালও, আবার মন্দও। আমি 'পাক্কী' মেরামতির দলে কাজ করতে চাই। আমাকে ভর্তি করে নেবে ?"

শনিচরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর হো হো করে হেসে ওঠে।

"এতদিনে তাহলে তাৎমাদের বুদ্ধি খুলেছে। গয়লার যাট বছরে, আর তাৎমার সত্তর বছরে বুদ্ধি খোলে। আরে এতোয়ারী, শুক্রা, আকলু, বিরসা, বড়কাবুদ্ধু, ছোটকা বুদ্ধু, শোন শোন, শুনে যা 'খুশখবরী' (১)। মজার খবর। ময়নার বাচ্চার চোখ ফুটেছে।"

সকলে এসে জড়ো হয়। হাসি মস্করাব মধ্যে মেযেবাও এসে যোগ দেয়।

"এতদিনে তাৎমারা 'বেলদার' (২) হযে গেল।"

"আরে বাবা, করবি তো মজুরি। যেখানে পয়সা পাবি সেখানে কাজ করবি। তার মধ্যে আবার বাছ বিচার।"

শুক্রা বাধা দিয়ে বলে, "তাই বলে নিজের মান ইজ্জৎ নেই। পয়সা পেলেই মেথর ডোমেব কাজও করতে হবে নাকি?"

এতোয়ারী শুক্রাকে ঠাণ্ডা করে—"কোথায় মেথরের কাজ, কোথায় মাটিকাটার কাজ।"

"কালে কালে কিন্তু সকলেব ফুটানি ভাঙ্গবে। দেখ অত বড গেবস্থ জৈশ্রী চৌধরী, বনেদী ব্রাহ্মণ পবিবার, পাড়া শুদ্ধ লোকেব সম্মুখে হাল চালিযেছে। জাতের মাথা দ্বারভাঙ্গাবাজ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে টুঁশব্দ করেন নি। একে শখেব হাল চালানো ভাবিস না। দিন আসছে; চনরচুড় খাঁ, এতকাল 'ফুটানি ছাঁটতো' (৩) যে সে গরুর গাড়ীতে চড়ে না। সেদিন দেখি কামিখ্যাথানেব মেলায় গরুর গাডী থেকে নামছে। লোটাতে কবে জমানো পযসা ঘবেব মেঝেতে পোঁতা থাকলে তবেই 'বিবিকে' কাজ করতে বাবণ করা যায়।"

"এসব তো অনর্থক হল। এখন 'বেটা' (৪) তুই বল, তুই যে রাস্তামেরামতির কাজ করবি, পাড়াব মহতো নায়েবদের জিজ্ঞাসা করেছিস?"

"তারা কি আমায় খেতে দেয়? জিজ্ঞাসা কবতে যাব কেন? আর জিজ্ঞাসা করলে জানাই আছে যে, তারা মাটিকাটার কাজ আমাকে করতে দেবে না।"

"দেখিস না, পঞ্চাযেত তোর কি করে। নোখে বেলদার কবে পচ্ছিম থেকে এসে, এক কুড়ি বছরের উপর এই এলাকায় আছে। তাকে কি তোর জাতভাইরা মানুষ বলে ভাবে? সে বেচারা বোজ কাজ করার সময় এই নিয়ে দুঃখু করে।"

সেই দিন থেকেই ঢোঁড়াই কোশীশিলিগুড়ি রোডের একুশ থেকে পঁচিশ মাইলের গ্যাংএ বাহাল হয়।

সব ধাঙড়রা তাকে ঠাট্টা করে বলে যে তোকে এবার থেকে 'বাচ্চা বেলদার' বলবো। শুক্রা ধাঙড় তার বাবুর বাড়ীর মাইজীর কাছ থেকে, মাইনের থেকে এক টাকা আগাম নেয়; তার 'সনবেটার' কোদাল কিনবার জন্য। বুড়ো এতোয়ারী ধাঙড়ের দল নিয়ে বেরোয় বকরহাট্টার মাঠের থেকে ময়নার ডাল বাছতে,—বাচ্চা বেলদারের কোদালের বাঁটের জন্য।

বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ফিরবার সময় ঢোঁড়াইয়ের দেখা হয় ধাঙড়টুলির ডাইনীবুড়ী আকলুর মার সঙ্গে। সে মাটি খুঁড়ে একটা কি বার করছিল, মাটির ভিতর থেকে। ঢোঁড়াইকে দেখে হেসেই আটখান। ছালটা পোকায় খাওয়া খাওয়া গোছের, একটা প্রকাণ্ড শাঁক আলু ঢোঁড়াইয়ের হাতে দেয়। "নে নাতি, অসময়ের জিনিস।" সবাই একে ডাইনী বলে ভয় করে। কিন্তু এর চোখে একটা অননুভূত কোমলতার আভাস দেখে, ঢোঁড়াই ভয় করবার অবকাশও পায় না সেদিন।

টীকাঃ—

(১) সুখবর

(২) বেলদার আর মুনিয়া, এই দুটো জাতই কেবল এই অঞ্চলে মাটিকাটার কাজ করে।

(৩) বড়াই করতো

(৪) ঢোঁড়াই শুক্রার সনবেটা অর্থাৎ ধর্মছেলে; সেইজন্যই অন্য ধাঙড়রাও তাকে ছেলে বলে।

মহতো নায়েব আদির মন্ত্রণা

সেই রাতেই ধনুয়া মহতোর বাড়ীতে পঞ্চায়েৎ বসে। অন্য সময় হ'ত তার বাড়ির সম্মুখের মাদার গাছটার নীচে, বাঁশের মাচার পাশে; দুই একজন বিশিষ্ট দর্শক বসত মাচার উপর। এখন ভাদ্র মাসের টিপটিপুনি বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বসা যায় না। তাই সবাই বসেছে একচালাটির ভিতর। ছড়িদার আর নায়েবেরা বাঁশের চাটাইয়ের উপর, আর ধনুয়া মহতো বসেছে ঘরের জিয়লের

খুঁটিটাতে হেলান দিয়ে। খুঁটিটা থেকে এক গোছা পাতা বার হয়েছে; বুড়ো তাৎমাদের মত জিম্মলের খালও মরতে জানে না। মহতোর সম্মুখে একখান ঘুঁটে থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে,—বাবুলালের তামাকের খরচ আজ বাঁচবে। তেতর কাশছে, বোধ হয় এইবার কথা বলবে। ঠিকই সে কথা বলে—"চাটাইটায় দেখছি আর কিছু নেই।"

জবাব দেয় রতিয়া ছড়িদার, "বাবুদের বাড়ি থেকে যে বাঁশের টুকরোগুলো নিয়ে আসো, সেগুলো তো পঞ্চায়েতের পাওয়ার কথা। চিরকাল তাই হয়ে এসেছে, ঝুমলাল মহতোর সময়ে। সেখান থেকে আনা "ঔজার" (১) আর ঘাস দড়ি হবে, যে আনবে তার; আর বাঁশ আনলে আদ্ধেক হবে পঞ্চায়েতের, এই ছিল চিরকালের নিয়ম। কেউ দিয়েছে দুবছরের মধ্যে, যে চাটাই নতুন থাকবে।"

সকলেই দোষী; কেউ আর কথাটা বাড়াতে চায় না। লাল্লু বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আরম্ভ করে "কেবলই টিপটিপুনি বৃষ্টি এ বছর। আবে হবি তো জোরে হ। এ জলে আর কে চালের খাপড়া বদলাবে। অথচ ব্যাঙের ডাকের কামাই নেই।"

বাবুলাল বলে, "হয় একদিন তিস্থর সালের (২) মত জল। এক বৃষ্টিতে বাঁধার যরনাথায়ের কাঠের পুল ডুবে গিয়েছিল।"

"বাবুভাইয়াদের সে কি দৌড়োদৌড়ি তাৎমাটুলিতে সেদিন! অমন আর কখনও দেখিনি। মহতো সেবার খুব হিম্মৎ দেখিয়েছিলে বাবুভাইয়াদের কাছে।"

মহতো এই প্রশংসায় খুশী হয়ে সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলে—বৃষ্টিতে যে কতদিন বাড়িতে বসে থাকি, সেটা দেখবে না, এক আনা বেশী চাইলেই চালার মাপের হিসেব দেখাবে। মৌকা পেলে বাবু ভাইয়াদের কাছ থেকে চুটিয়ে নেবো। ছাড়াছাড়ি নেই আমার কাছে। "খাইতো গেঁহু, নহিতো এহু" (৩)

মহতো হুঁকোটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে বসে। স্ত্রীকে বলে "গুদরমাই (গুদরের মা), বাইরের শুকনো ঘাসগুলো তুলিসনি তো? কি যে তোদের আক্কেল তা বুঝি না," যেমন মা তার তেমনি ছেলে। আমার খটাশের মত

তাকাচ্ছিস কি? ওগুলো যে পচে গলে যাবে। হরনন্দন মোক্তারের বাড়িতে কাজ করার দিন এনেছিলাম, আজও সেই পড়ে রয়েছে। কত ধানে কত চাল তাতো আর বুঝিস না। আমাদের কাজ শেষ হওয়ার সময় তারা লোক রেখে দেয় পাহারায়। সেইগুলোকে ভিজোচ্ছিস। ও ঘাসে উই লাগতে কদিন। গতবার ঠিকেদারবাবুর বাড়িতে কাজ করবার সময় এনেছিলাম "উপর করে" (৪) এই এত বড় দা, তিনপোয়া ওজন হবে, সেটাকেও হারিয়েছে ওই মায়ে বেটায় মিলে। করে নে ফুটানি যে কটা দিন এই মহতো বেঁচে আছে। পরমাৎমা কি পদার্থ দিয়ে যে আজকালকার ছেলেদের গড়েছে! এই দ্যাখো না ঐ ঢোঁড়াইটার কাণ্ড!

পয়স পীলি অহি অতি অনুরাগা।
হোহিঁ নিরামিষ কবহুঁ কি কাগা॥ (৫)
উনি আবার গলায় তুলসীর মালা নিয়ে সাধুবাবাজী হবেন।"

সকলে এই বিষয়টারই প্রতীক্ষা করছিল এতক্ষণ থেকে। আজ আর ছাড়াছাড়ি নেই।

"বাওয়ার ছেলে হয়েছেন তো মাথা কিনেছেন।"

"পঞ্চ"এর কথার খেলাপ গিয়েছে অতটুকুনি ছোঁড়া! হারামজাদা!"

আজকের "পঞ্চায়তী" থেকে মহতো নায়েব ছড়িদার কারও এক পয়সা রোজগার নেই (৬)। কেবল জাতের ভালর জন্য, আর দশের মঙ্গলের জন্য, আজকের পঞ্চায়তের বৈঠক করা হচ্ছে। ঢোঁড়াইকে ডাকা হয়েছিল "পঞ্চায়তীতে"! ঢোঁড়াই আসেনি এখনও।

তাৎমাটুলিতে 'পঞ্চায়তী, নিত্যি লেগেই আছে—এর বৌ ওকে দেওয়া, কোন্ পক্ষের কোন ছেলেটা মড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখাগ্নি করে নিয়েছে, মৃতের বাড়ির বেড়া আর বাঁশগুলো পাবে বলে; কে জোর করে স্বামীর সাক্ষাতে তার স্ত্রীর কপালে সিঁদুর লাগিয়ে তাকে স্ত্রী বলে দাবী করছে; আরও কত রকমের দৈনন্দিন জীবনের খুচরো মামলা।

কিন্তু এতটা বয়স হল, "পঞ্চ"রা কখনও দেখেনি, যে জাতের 'পঞ্চায়তী'তে কাউকে ডেকে পাঠিয়েছে, আর সে আসেনি। কথায় বলে 'পঞ্চ' যদি সাপকে

ডাকে তো সাপ আসবে, বাঘকে ডাকে বাঘ আসবে, মানুষ তো কোন ছার।
এত বুকের পাটা ঐ একরত্তি ছেলেটার! এ অপমান 'পঞ্চ'দের পক্ষে অসহ্য।

সব আসামীই তাৎমাটুলির 'পঞ্চায়তী'তে (৭) আসতে ভয় পায়। শাস্তির প্রথম দফা পঞ্চায়তের বৈঠকের মধ্যেই হয়ে যায়। মোটামুটি 'ফয়সালা' হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসামীর উপর চড়চাপড় পড়তে আরম্ভ করে। এগুলো কিন্তু আসল শাস্তির ফাউ। এই উপরি পাওনার পর অন্তিম রায় বেরোয়;—জরিমানা, গাধার পিঠে চড়ানো, ভোজ—খেলা নয় 'ভাতকা ভোজ', (৮) আরও কত কি। ছোটবেলা থেকে ঢোঁড়াই এ সব কত দেখেছে।......পুরণ তাৎমাকে সেবার অর্ধেক মাথা নেড়া করে, অর্ধেক গোঁফ কামিয়ে একটা বড় রাম ছাগলের পিঠে বসানো হয়। ঢোঁড়াইয়ের বেশ মনে আছে, সে, গুদর, আরও সব ছেলেরা কালকাসুন্দি আর ভাঁট গাছের ছড়ি নিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এক! দু! তিন! সকলে রামছাগলটির উপর ছড়ি চালাচ্ছে, সপাসপ! বাবুলাল বললো থাম তোরা একটু। চেরমেন সাহেবের হাওয়া গাড়ীর "পিট্রোল" (৯) সে একটা শিশিতে করে রাখে, বাথায় মালিশ করার জন্য। সেই শিশি থেকে একটু পেট্রল দেয় রামছাগলটার পিঠের কাছে। ব্যা ব্যা করে পরিত্রাহি চীৎকার করছে রামছাগলটা। সেটা অনবরত ঘুরপাক খাওয়ার চেষ্টা করে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড! রামছাগলটা শেষকালে ছটফট করতে করতে শুয়ে পড়ে। সকলে মিলে জোর করে পুরণ তাৎমাকে সেটার উপর চেপে ধরে রাখবে; নে নে পুরণা, সখ মিটিয়ে নে, শুঁকে নে কেওড়ার গন্ধ। সে কথা ঢোঁড়াই কোনদিন ভুলতে পারবে না।...

মহতো, নায়েব, ছড়িদার সকলেরই হাত নিশপিশ করছে—ঢোঁড়াইটাকে একবার হাতের কাছে পেলে হয়।

ধম্মুয়া মহতো হুঁকোটায় কয়েকটা টান মেরে, তার উপরের নালটা মুছে লাল্লুর হাতে দেয়; তার মনের মত ধোঁয়া এখনও বের হচ্ছে না।

"নে লাল্লু তামাকটা টেনে ভাল করে ধরিয়ে দে! এখনও তোরা জোয়ান মরদ আছিস, বুকের জোর আছে; আমাদের মত বুড়ো হয়ে যাসনি। তোদের মত বয়সে আমাদের এককোশের মধ্যে দিয়ে কোন মেয়েছেলে যেতে সাহস করতো না।"

মহতোর রসিকতায় সকলে হাসে। মহতোর বয়সকালের অনেক কাণ্ড সকলের মনে আছে। মহতো গিন্নী আর তার পঙ্গু মেয়ে ফুলঝরিয়া বাইরে আড়ি পেতে ছিল। মা গর্বপ্রসন্ন দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে,—এমন এমন কথা বলবে যে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে।

ধন্নুয়া মহতোর উচ্চ হাসি ব্যাঙের এক ঘেয়ে ডাকের মধ্যেও কানে বাজে। হঠাৎ সে উদ্গত হাসিটা ঢক করে গিলে ফেলে গম্ভীর আর সোজা হয়ে বসে। মহতোর পদের একটা মর্যাদা আছে তো। সকলেই বোঝে যে এইবার আসল কাজের কথা আরম্ভ হবে। বৈঠকের আবহাওয়া থমথমে হয়ে ওঠে।

"ছেলে বাপের হয় না; ছেলে হয় জাতের। তারপর ছেলের উপর দাবী হয় টোলার। এই জিয়লের ডালের খুঁটি লেগে গিয়েছে তো; এ এখন সমস্ত চালাটাকে শুদ্ধ ঠেলে নিয়ে উঁচুতে উঠবে। সেই রকমই দ্যাখ, এই বাবুলাল তাৎমা জাতটার ইজ্জৎ কত বাড়িয়েছে। 'হৈজার ডাক্তার, (১০) যখন তাৎমাটুলীর 'ফৌজী কূয়ো'তে লাল রঙ, (১১) দিতে আসে, তখন আমার বুক, সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ে দুর দুর করে। বাবুলাল দেখি মোচে তা' দিতে দিতে তার সঙ্গে কথা বলে; তবে না ও তাৎমা জাতটাকে একা এতটা এগিয়ে দিতে পেরেছে।"

বাবুলাল, আত্মপ্রশংসা নিজের কানে শোনেনি এমনি একটা ভাব দেখায়।

"আর একদিকে দ্যাখো, "সারা বদমাইসির জড়" (১২) এই ঢোঁড়াই।"

সকলে ঢোঁড়াইয়ের নামে সোজা হয়ে বসে। লাল্লু শব্দ করে থুথু ফেলে; বাসুয়া চিক্ করে একটা শব্দ করে। বাবুলাল বলে, ছি ছি ছি ছি! তারপর গোঁফের একটা অবাধ্য চুলকে দাঁত দিয়ে কাটবার বৃথা চেষ্টা করে।

"সেই কুত্তার বাচ্চাটা কি না মাটি কাটার কাজ করবে, যা আমাদের সাত পুরুষে কেউ কোনদিন করেনি! তাৎমা জাতের মুখে কালি দিল! এর থেকে মুসলমানের এঁটো খাওয়া ভালো ছিল। আর লোক সমাজে মুখ দেখানোর জো রাখলো না তাৎমাদের। এখানে এলো না পর্যন্ত সে নবাব পুত্তুর। কি ছেলেই মানুষ করেছে বৌকাবাওয়া! বাওয়ার নাই দিয়ে মাথায় চড়ানোর জন্তেই তো ও এত বাড় বেড়েছে। দেখ দেখি কাণ্ড! নোখে বেলদার, আর শনিচরা ধাঙড় তাৎমার সঙ্গে সমান হয়ে গেল। আরে, মাটি কেটেই যদি পয়সা রোজগার করতে

হয়, তাহলে আমরা এতদিন ফুলে "ভাঁতি" (হাপড়) হয়ে যেতাম। আজ এই তিনকুড়ি বছর থেকে দেখছি এই 'পাকী' মেরামতের জন্য মাটি কাটার লোক, কত দূর দূরান্তর থেকে আসে। ধহুয়া মহতো আঙুল উঁচোলে এখনই তিনশ তাৎমা রাস্তা মেরামতির কাজে দিতে পারে। বাপ ঠাকুরদার নাম হাসালি। এই চোখের পর্দাটুকুর জন্যেই তো ধাঙড়দের পোয়াবারো। রাতদিন পচই খেয়েও দুবেলা ভাত ডালের উপর আবার তরকারি খায়, আর আমাদের বরাতে মকাই মাকয়ার দানাও জোটে না। একখান দা কিনতে হলে অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে দু টাকা ধার করতে হয়, দু আনা করে রবিবাবে রবিবারে তাকে সুদ দেবো এই কড়ারে। এই দেখো না আমাব দাখানা এই আঙুলের মত পাতলা হয়ে গিয়েছে, ধার দেওয়ার জায়গা নেই। নারকেলের দড়িটা কাটা যায় না এ দিয়ে। পয়সা না থাক একটা ইজ্জৎ, প্রতিষ্ঠা আছে। একটা ছোঁড়াব বদ খেয়ালের জন্য আমাদের সেটাও খোয়াতে হবে?"

পঞ্চরা সকলে বেশ তেতে উঠেছে, এতক্ষণে।

"বন্ধ কর শালার 'হুক্কা পানি' (১৩)।"

"তাড়াও ওটাকে গোঁসাই থান থেকে।"

"বাওয়াটাই যত নষ্টের গোড়া"

"জাকে নখ অরু জটা বিসালা।

সোই তাপস প্রসিদ্ধ কলিকালা॥" (১৪)

"নুটিস দাও, বাওয়াকে"

"চল সকলে থানে। ছোঁড়ার খাল ছিঁড়ে আজ হাড় মাস আলাদা করবো।"

চল, চল।

বাইরে তখন বেশ জোরে বৃষ্টি এসেছে।

"পড়তে দে জল",—বলে হেঁপো রুগী তেতর বের হয়ে পড়ে ঘর থেকে। আর কারও বৃষ্টির কথা খেয়ালই নেই।

"লাঠি নিয়েছিস তো?"

টীকা :—

(১) ঔজার—যন্ত্র, হাতিয়ার

(২) গত বছরের আগের বছর।

(৩) খাই তো গম, না হলে কিছুই খাই না। মারি তো গণ্ডার লুট তো ভাণ্ডার এই অর্থে।

(৪) যোগাড় করে।

(৫) অতি আদরের সহিত পায়স খাওয়াইয়া পালন করিলেও কাক কি কখনও নিরামিষ আহারী হয়। (তুলসীদাস)

(৬) সাধারণতঃ কেহ পঞ্চায়তের কাছে নালিশ করিলে তাহাকে দুইটাকা ছয় আনা জমা করিতে হয়। ইহার ছয় আনা ছড়িদারদের প্রাপ্য, এক টাকা মহতোর, আর এক টাকা বারোয়ারী ফণ্ডের। ইহাই ছিল নিয়ম। কিন্তু আজকাল এ নিয়ম চলে না। নায়েব মহতো ছড়িদার ইহারা মিলিয়া সব টাকাই নিজেরা আত্মসাৎ করে। ইহার জন্য নিত্য নূতন মিথ্যা মোকদ্দমাও তাহারা তৈয়ার করে।

(৭) স্থানীয় ভাষায় কোন বিষয় পঞ্চায়তে দেওয়া হয় না, 'পঞ্চায়তী'তে দেওয়া হয়।

(৮) ভাতের ভোজ; অন্য শুকনো জিনিসের ভোজে খরচ কম পড়ে।

(৯) পেট্রল।

(১০) হৈজার ডাক্তার, শব্দার্থ কলেরার ডাক্তার, আসলে তাহারা অ্যাসিষ্টেন্ট স্যানিটারী ইন্সপেক্টর।

(১১) পারমাঙ্গানেট অব পটাশ।

(১২) যত নষ্টের গোড়া।

(১৩) একঘরে কর।

(১৪) যার নখ আর জটা বড়, সেই কলিকালে প্রসিদ্ধ তপস্বী। (তুলসীদাস)

ঢুথিয়ার মার বিলাপ ও প্রার্থনা

আগে আগে চলেছে বড়রা—মহতো, নায়েব চারজন, আর ছড়িদার। এর পিছনে আছে ছেলে বুড়ো সকলে। এরা সব এতক্ষণ ছিল কোথায়! বোধ হয় মহতোর বাড়ির আশে পাশে সবাই জড়ো হয়েছিল সেই জল বৃষ্টির মধ্যেও আজকের পঞ্চায়তীর জম জমাট 'তামাসা' দেখবার জন্য। জল কাদা ব্যাঙ, কাঁটা মাড়িয়ে, অর্ধোলঙ্গ বীরের দল নৈশ অভিযানে বেরিয়েছে। তাদের জাত্যাভিমানে আঘাত লেগেছে। অন্ধকারে সরু পথের উপর আন্দাজে পা ফেলে চলছে সকলে;

পায়ের নীচের চটকানো কেঁচোগুলো থেকে আলোর আভাস ফুটে বেরুচ্ছে; গুগলি শামুক গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে খড়মড় করে। ক্ষ্যাপা শেয়ালের মত তারা হন্যে হয়ে ছুটেছে; কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই তাদের এখন,—যেমন ক'রে হোক তাদের জাতের এ অপমানের একটা প্রতিকার তারা করবেই করবে।

পাড়ার মেয়েরাও একে একে ধনুয়া মহতোব সদ্য খালি করা একচালাটিতে এসে জড় হয়। বাইরে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। তবু সকলে ভিজে কাপড় নিঙড়োতে নিঙড়োতে বাইরে কি যেন দেখতে চেষ্টা কবে। সকলেই এক সঙ্গে কথা বলতে চায়। মুখে কারও ভয ডব মায়া মমতাব ছাযাও নেই; আছে কেবল অভিযানের নিশ্চিত সাফল্যের জন্য উল্লাস, আর কযেকটা অনিশ্চিত মজার খবরের জন্য কৌতূহল। ঐ একবত্তি ছোঁডাব এই কাণ্ড! অসীম উৎসাহেব সঙ্গে গুদরের মা আজকের পঞ্চায়তের সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী, অন্য সকলকে বুঝোতে চেষ্টা করে। কুপীর আলোয় তার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কে তাব কথা শুনছে? তাদেব মধ্যে এত উত্তেজনা বোধ হয এক কেবল ধাঙ্গড়টুলিতে আগুন লাগার সময় ছাড়া আর কখনও হয়নি। বাসুয়া, লাল্লু, তেতর এই তিন নায়েবের স্ত্রীরাও মহতো গিন্নীর চেয়ে গৌরবেব অংশীদার হিসাবে কম বলে মনে কবে না নিজেদের। তারাও সমস্বরে চীৎকাব করছে। পাযগুদলনে বীবেবা বেরিয়েছেন, বীরজায়ারা যাত্রার আগে কপালে জযতিলক কেটে দিতে পারেননি, সেইটা পুষিয়ে নিচ্ছেন চেঁচামেচি গালাগালির মধ্যে দিয়ে।

কেবল ঢুখিয়ার মা এদের মধ্যে নেই। সে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। ঢুখিয়াটা চাটাইয়ের উপর একটা কচি বাতাবীলেবু নিয়ে খেলতে খেলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ রান্নাবাড়ী করাব মত মনের অবস্থা ঢুখিয়ার মার নেই। সন্ধ্যায় বাবুলাল বাড়ি থেকে বেরুবার পব থেকেই, তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে। সে কান পেতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিল—যদি কোন চেঁচামেচি শোনা যায়; পঞ্চায়তী কখনও বিনা হট্টগোলে শেষ হয না। কেন মরতে গিয়েছিল সে কাল তালের বরফি দিয়ে ছোঁড়াটার জন্য। সেই থেকেই তো এত কাণ্ড! কাল গোঁসাইথানে না গেলে আজ হয়ত ছেলেটা এ কাণ্ড করত না। চিরকাল বদরাগী ঢোঁড়াইটা—সেই যখন কোলে তখন থেকেই; কিন্তু রাগেরও তো একটা সীমা

আছে! বলতে গেলাম ভাল কথা, বাওয়া আর ঢোঁড়াই দুজনেই মানে করে নিল উল্টো। মহতো নায়েবরা, বিশেষ করে চাপরাসী সাহেব, আজ আর ঐ একরত্তি ছেলেটাকে আস্ত রাখবে না। দেবে হাড়গোড় ভেঙে। চাপরাসী সাহেব কোন দিন ছেলেটাকে দেখতে পারে না।—পঞ্চায়তীর চেঁচামেচি মহতোর বাড়ী থেকে এতদূরে পৌঁছোয় না, কেবল বৃষ্টির একটানা রিমঝিম শব্দ শোনা যায়।

টপ্ টপ্ করে চালের ছাঁচতলা থেকে জল পড়ছে তার সম্মুখে। জলের ফোঁটা পড়েই একটা একটা টুপির মত হয়ে যাচ্ছে। একটা নেপালী 'ফৌজ' চাপরাসী সাহেবকে একটা টুপি দিয়েছিল। সে তার পেন্সনের টাকা তুলতে পারছিল না সরকারী অফিস থেকে। বাবুলাল টাকায় চার আনা করে নিয়ে টাকাটা তুলে দিতে সাহায্য করে। তাই সে বাবুলালকে দিয়েছিল পুরানো টুপিটা। দুখিয়ার মা আবার একদিন সেই টুপির মধ্যে বাবুলালের জন্তে কাঁঠাল ছাড়িয়ে রেখেছিল। কি মারই না মেরেছিল সেদিন বাবুলাল দুখিয়ার মাকে। আবার চাপরাসীর বৌ হতে সখ যায়; থাক তুই তাৎমানী।······

বাবুলালের উপর বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে ওঠে। ঢোঁড়াইয়ের কথা মনে করে, তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নীচে জলের ফোঁটা পড়ে টুপি হচ্ছে কি না, সেদিকে আর খেয়াল থাকে না। খেয়াল থাকলেও ঝাপসা চোখে তখন দেখতে পেতো না।

ঐ! এইবার একটা হট্টগোল শোনা যাচ্ছে! তারা বোধহয় পঞ্চায়তীতে ঢোঁড়াইকে মারছে! রামজী! গোঁসাইজী, তোমার থানের ধূলোবালি মেখে ছেলেটা এত বড় হয়েছে। দোষ করে ফেলেছে বলে তাকে পায়ে ঠেলো না।··· ছোঁড়াটা হয়ত এখন চীৎকার করে কাঁদছে।·····না কাঁদবে কেন? ঢোঁড়াইকে তো কেউ কোন দিন কাঁদতে দেখেনি।·····হট্টগোল যেন দূরে সরে যাচ্ছে, বোধ হয় গোঁসাই থানের দিকে। এ আবার 'পঞ্'রা কি ফয়সলা করলো? বাওয়াকে আবার কিছু করবে না তো? হয়ত ঢোঁড়াইকে এত মেরেছে যে তার চলবার ফিরবার ক্ষমতা নেই; নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে বেহুঁস হয়ে গিয়েছে; তাই বোধ হয় সকলে মিলে ধরাধরি করে তাকে বৌকাবাওয়ার কাছে পৌঁছুতে যাচ্ছে।

চেঁচামেচির আওয়াজ বাড়তে থাকে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই—না হলে হয়ত কথাবার্তা কিছুটা শোনা যেত। ঝাঁপের সম্মুখে কুপির আলো পড়ে বৃষ্টির ধারা সাদাটে রঙের দেখাচ্ছিল,—চোখের জলে তাও ঝাপসা হয়ে গেল।...... মাইয়া গে, তোর চুলে বাওয়ার জটার মত গন্ধ নেই কেন?......দূরে থেকে আপিস ফেরৎ বাবুলালকে দেখে, ধূলোকাদা মাখা ছেলেটা রাংচিতের বেড়ার মধ্যে দিয়ে পালাচ্ছে চোরের মত।......

হঠাৎ পায়ের শব্দ হয়। ছপ্ ছপ করে কাদার মধ্যে দিয়ে কে যেন এদিকে আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বাবুলাল এসে ঘরে ঢোকে। সে যেন ধাক্কা দিয়ে ঢুখিয়ার মাকে দোরগোড়া থেকে সরিয়ে দেয়। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জলের স্রোত বইছে। উনুনের পাড় থেকে কুপিটা উঠিয়ে, সে ঘরের কোনার দিকে এগিয়ে যায়। আর একটু হলেই ঘুমন্ত ঢুখিয়াকে মাড়িয়ে ফেলেছিল আর কি! সবুজ আর গোলাপী রঙে রঙানো বেনাঘাসের কাঠাটির ভিতর থেকে বাবুলাল টেনে বের করে পেট্রলের শিশিটা। যত্ন করে তুলে রাখা ঢুখিয়ার কাজললতাটা, কাঠা থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। বাইরের দমকা হাওয়ার মত বাবুলাল আবার বেরিয়ে পড়ে জলের মধ্যে। ঢুখিয়ার মা সশঙ্ক জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে, একবার শিশিটির দিকে একবার বাবুলালের মুখের দিকে তাকায়। দোর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বাবুলাল বলে যায় "শালা থানে নেই"...।

ঢুখিয়ার মার মনে হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তোমার পায়ের ধূলোর ইজ্জৎ রেখো, গোঁসাই। ঢোঁড়াইকে আমার, এই 'চামার' গুলোর হাত থেকে আজ বাঁচিও। বাওয়ার মত 'ভকত' যাকে আগলে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা, তাকে এই বাবুলাল, তেতর, লাল্লু, বাসুয়া, কি করতে পারে? বিশ্বাস নেই বাবুলাল চাপরাসীকে। ও আগের জন্মের জমানো "সুকৃতের" (১) ফলে, সব কাটিয়ে উঠতে পারে, এ বিশ্বাস ঢুখিয়ার মার আছে। তার উপর 'পঞ্চ্' এর ন্যায়, দশের ফয়সলা। তার 'তাকৎ' গোঁসাই আর রামজীর তাকতের সমান। 'পীপর' (২) গাছের আওতায় মানুষ হয়ে, ছেলেটা কি করে 'পঞ্চ'এর কথার খেলাপ যেতে পারলো। ওর ঘাড়ে এখন শয়তান সওয়ার হয়েছে। নিশ্চয়ই ধাঙড়টুলির আকলুর মা, কিম্বা লম্বী গোয়ারিনের মত কোন 'ডাইন' (৩) জানা

মেয়েমানুষ ওর উপর "চক্কর" (৪) দিয়েছে। তা' নাহলে কি কখনও কেউ এমন করতে পারে। কত পাপই না আমি করেছি, গোঁসাই তোমার কাছে! ..... 'পিট্রোল'এর শিশি নিয়ে বাবুলাল আবার এখন কি করতে গেল? .. ..

দুখিয়ার মা কিছু ভেবে ঠিক করে উঠতে পারে না।...কি একটা পোড়া পোড়া গন্ধ না? ঠিকই তো!......ধোঁয়ার গন্ধ; বর্ষার ধোঁয়া উঁচুতে ওঠে না; মেঝেতে পড়া কেরোসিন তেলের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়ায় চারিদিক ভরে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখতেও ভয় হয়, কি জানি আবার কি দেখবো। বৃষ্টি ধরে এসেছে। ঘন আঁধার ভেদ করে, থানের দিকে আকাশে উগ্র লাল আলোর ঝলক লেগেছে।

টীকা:—

(১) সুকৃত—পুণ্য
(২) অশথগাছ
(৩) ডাকিনীবিদ্যা
(৪) যাদুমন্ত্রের প্রক্রিয়া বিশেষ

বাওয়া ও ঢোঁড়াইয়ের অগ্নিপরীক্ষা

ঢোঁড়াইকে গোঁসাই থানে না পাওয়ায় তাৎমা ফৌজের দল প্রথমটা কি করবে ভেবে পায় না।

শালা, এত রাতেও বাড়ি ফেরে নি। এই ঝড়বৃষ্টির দিনেও শয়তানী করে নিশ্চয়ই ধাঙড়টুলিতে বসে আছে, তাৎমাদের বেইজ্জৎ করার জন্য। ঐ ধাঙড়, আর মুসলমানের বাড়ির ভাত খাওয়াটুকুই বাকি ছিল। তা সে সখটুকুও মিটিয়ে নে। খেয়ে নিস তার সঙ্গে মুরগির আণ্ডা। ওটাকে হাতের কাছে এখন পেলে,—যেমন করে ধাঙড়রা শুয়োর মারে, এই তেমনি করে...

কয়েকজন বাওয়াকে ঘরের ভিতর থেকে টেনে বার করে। সে কোন বাধা দেয় না। বাওয়ার দোষী মন, এই রকমই একটা কিছুর আশা

করেছিল। কিন্তু এত উত্তেজিত হওয়া সত্ত্বেও, বাওয়াকে মারপিট করতে তাদের সাহস হয় না। তাকে কাদার মধ্যে টেনে এনে ফেলা হয়। তারপর চলে জেরা—কোথায় আছে ঢোঁড়াই, বল্। কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিস? শুক্রা ধাঙড়ের বাড়ি? নোখে বেলদারের বাড়ি? কোথায় লুকিয়ে আছে বল্? 'পাক্কী'র গাছতলায়?

বাওয়ার ঘাড় নেড়ে জবাব দেবার কথা। কিন্তু সে নির্ব্বিকারভাবে পিট্ পিট্ করে করে তাকায়, কিম্বা কি ইসারা করে বলে, অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় না।—আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পাবে না, কোন দিকে গিয়েছে। দে ঐ জটাটায় আগুন লাগিয়ে। হাঁ বলেছিস ঠিক; মাথার চাঁদিতে একটু গরম লাগলেই পেটের কথা বেরুবে।

—এই যে বাবুলাল 'পিট্রৌলের' শিশি আর দেশলাই নিয়ে এসেছে।

বাওয়ার ভিজে চালাটিকে জ্বালাবার পর এই পাগলের দলের আক্রোশ একটু কমে আসে। মহতো নায়েবরা বুদ্ধিমান। তারা বুঝতে পারে যে যতটা করা উচিত ছিল, তার চাইতে একটু বেশী করা হয়ে গিয়েছে। বাবুলালের ভয় হয় যে সে-ই পেট্রোলের শিশি এনেছিল। এক এক করে তারা সরে পড়ে। বাকি সকলে গোঁসাইথানে নানা রকম গালগল্প আরম্ভ করে।

আলবৎ বটে 'পিট্রৌলের' ধক। তা না হলে কি আর এ দিয়ে হাওয়াগাড়ী চলে। মাদারঘাটের বুড়ী মুদিয়াইন সেবার শীতকালে গেঁটে বাতের ব্যথায় মর মর হয়েছিল। ডেরাইভার সাহেব তাকে দিয়েছিল একটু 'পিট্রৌল'। শীতে জবুস্থবু হয়ে, পায়ে পেট্রোল ঢেলে যেই 'ঘুর'এর (১) আগুনের উপর পা তুলে ধরেছে, অমনি গিয়েছে পায়ে আগুন লেগে; চামড়া টামড়া ঝলসে একাকার।

তুই যে আবার সেই "শাঁখড়েল"এর (২) গল্প আরম্ভ করলি।

খবরদার, মুখ সামলে কথা বলিস। আমি বলছি মিছে কথা। বাসুয়া নায়েবকে জিজ্ঞেস কর, 'মুদিয়াইন'এর কথা সত্যি কিনা।

"এই বাসুয়া!"

বাস্থয়াকে খুঁজে পাওয়া যায় না। সকলে তাকিয়ে দেখে যে মহতো নায়েবরা কেউ নাই। বহুদূর থেকে হেঁপো তেতরের কাশির শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তাৎমাসুলভ ভয় ও নিজের প্রাণটা বাঁচানোর প্রয়াস সকলকে পেয়ে বসে। এক এক করে দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

প্রেতের দলের মধ্যে থেকে কেবলমাত্র একজন থেকে যায়—রতিয়া 'ছড়িদার' (৩)।

বাওয়া তার সম্মুখে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। ছাই আর আগুনের স্তূপের মধ্যে থেকে তখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছে। রতিয়া বাওয়ার কাছে ঘেঁসে বসে। হাতের লাঠিটা দিয়ে খানিকটা পোড়া খড় আর ছাই সরিয়ে দেয়। নীচে থেকে আধপোড়া হাড়িকাঠটা বেরিয়ে আসে। এ কি! হাড়িকাঠ পুড়ে গিয়েছে। কৃত পাপের ভার তার বুকের উপর চেপে বসে। সকলে চলে গেলেও সে থেকে গিয়েছিল, বাওয়ার কাছে একটা প্রস্তাব আনবার জন্য। ভিক্ষের জমানো পয়সা যদি কিছু থাকে তাই দিয়ে 'পঞ্চ'দের ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করা উচিত, এই সোজা কথাটা বাওয়ার মাথায় ঢুকানোর জন্য, সে কাছে ঘেঁষে বসেছিল। কিন্তু হাড়িকাঠ পুড়ে গিয়েছে। পাপের গ্লানিতে আর রেবণগুণীর ভয়ে তার বুক দুর দুর করে। এই হাড়িকাঠের পাশেই সর্বাঙ্গে রক্তমাখা রেবণগুণীর উপর প্রতি বছর গোঁসাই ভর করেন। ভয়ে ছড়িদার ঘেমে ওঠে। বাওয়ার পা জড়িয়ে ধরতে পারলে হয়ত কিছুটা পাপের বোঝা কমতো। ঝোঁকের মাথায় এ কি কাণ্ড করে বসেছে সকলে। রেবণগুণী তো সবই জানতে পারে। এই হাড়িকাঠ জ্বালানের কথা সে নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গিয়েছে। এখন তার রাগ কার উপর পড়বে সেইটাই হল কথা…

আগুন আর ধোঁয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত পাখীগুলো অশথগাছের উপর এখনও শান্ত হতে পারে নি। অশথগাছের ঝলসানো পাতাগুলো ধোঁয়ায় কাঁপছে। এমন সময় দূরে চেঁচামেচি শোনা যায়। সাপের ভয়ে হাততালি দিতে দিতে কারা যেন আসছে।

কি হয়েছে রে? আগুন কিসের? বাওয়া কোথায়? ধাঙড়ের দল আগুন দেখে এসে পড়েছে।

ঢোঁড়াই দৌড়ে গিয়ে বাওয়ার পাশে বসে। সে সমস্ত ঘটনাটা আন্দাজ করে নিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। বাওয়ার কাদামাখা হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে নেয়। কেউ কোন কথা বলে না। বাওয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। ঢোঁড়াইও জীবনে কাঁদে নি বলেই নিজেকে সামলে নিতে পারে। সব ধাঙড়রা তাদের গোল হয়ে ঘিরে বসে। রতিয়া ছড়িদার পালাবার পথ পায় না।

শনিচরা উঠে তার দুহাত চেপে ধরেছে।

"বল কে কে ছিল? রগচটা বেড়াল রাগের জ্বালায় খুঁটি আঁচড়ায়। এ হয়েছে তাই। মুনিয়া পাখীর মত ফুড়ুং ফুড়ুং করছিস কেন? বেশী নড়াচড়া করেছিস কি দেবো ফেলে ঐ আগুনের ভিতর।"

বিরসা বলে—"পঞ্চায়তীর ভোজের ফয়সালা করতে এসেছিলে নাকি বাওয়ার কাছে। দেড় টাকা পেলেই তো ভাতের ভোজ মাপ করে দেবে এখুনি।"

এতোয়ারী বলে—"বাজে কথা যেতে দে। বল্ কে কে ছিল? আগুন লাগিয়েছে কে? বাওয়াকে মেরেছিস নাকি? বাওয়া তুমিই বল না।"

বাওয়া মাথা নেড়ে বলে যে না, কেউ তাকে মারে নি।

ঢোঁড়াই বাওয়ার গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে দেখে কোন মারের দাগ আছে কি না। সারা গা একেবারে ছড়ে গিয়েছে। "চামার চণ্ডালের দল।" ঢোঁড়াইয়ের চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। তারই জন্য বাওয়াকে এই জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। শনিচরা রতিয়া ছড়িদারের চুলের গোছা ধরে বলে—"সব সত্যি কথা বল। তা না হলে তোকে আজকে এইখানে আধপোড়া হাড়িকাঠে বলি দেব। এখনও বললি না? দাঁড়া তোর 'ছড়িদার'গিরি ঘোচাচ্ছি।"

ছড়িদার ভয়ে ভয়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটি বলে। শনিচরা আর বিরসার রক্ত গরম হয়ে ওঠে সব শুনে। "দাঁড়া, ধন্নুয়ার মহতোগিরি, আর বাবুলালের চাপরাসীগিরি বের করছি। চললাম থানায়।"

এতোয়ারী, আর শুক্রা তাদের থানায় যেতে বারণ করে। জানিস না দারোগা পুলিসের ব্যাপার। মাথা গরম করিস না, গর্ত খুঁড়ে সজারু বের করতে গিয়ে শেষকালে গোখরো সাপ বেরিয়ে যাবে। পালানোর পথ পাবি না তখন। বুড়ো হাতীর কথা শোন। আমার বাবা আমাকে বলে গিয়েছিল

কোনদিন বুড়ো আঙুলের ছাপ দিস না। তার কথা মনে না রেখে সেবার কি বিপদেই পড়েছিলাম, সেই অনিরুধ মোক্তারের ব্যাপারটা মনে আছে না শুক্রা ভাই।"

বিরসা বলে "বুড়োদের কোন কথা চলবে না এখানে। সে সব শুনবো নিজের টোলায়। চল্‌রে শনিচরা।"

"কথা যখন রাখবি না, তখন যা ভাল বুঝিস তাই কর। বুড়োর কথা আর গুণীর কথা না রাখ ফল ভাল হবে না, ঠোকর খাবে।"

শুক্রা সায় দেয়—"যত আক্কেল ঘরের বেড়ার মধ্যে। পুল পার হলেই সব বুদ্ধি বেরিয়ে যাবে। ঘর বৈঠে বুদ্ধ পঁয়তিস; রাহ চলতে বুদ্ধ পাঁচ; কচহরী গয়ে তো একো ন সুঝে; যে হাকিম কহে সো সচ।" (৪)

সকলে হেসে ওঠে।

সত্যি হলও তাই।

বিরসা আর শনিচরা যখন পাঁচ মাইল্ দূরের সদর থানায় পৌছুল তখন বেশ রাত। দারোগাসাহেব দুজনই ঘুমিয়ে পড়েছেন। বহু ডাকাডাকির পর ছোট দারোগা সাহেবের ঘুম ভাঙে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে তিনি কনস্টেবলকে জিজ্ঞাসা করেন—কোন 'শ্বশুর' আবার এত রাতে জ্বালাতন করতে এসেছে। কেয়া হ্যায় কুলদীপ সিং? আবার এখন এই রাতে "আউয়ল ইতলায়" (৫) লিখতে হবে? কুলদীপ সিং বেশ করে 'সম্বুরা'টাকে (৬) একটু পেটো তো। বেটা মিছে কথা বলতে এসেছে নিশ্চয়।

শনিচুরা উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। বিরসা থানার কম্পাউণ্ডে ঢোকেই নি। থানা পর্যন্ত আসবার পর দারোগার নামে তার ভয় ভয় করে। শনিচরার হাজার টানাটানি সত্ত্বেও তার সাহসে কুলোয় নি। সে কম্পাউণ্ডের বাইরে বসেছিল। হঠাৎ শনিচরাকে পালাতে দেখে সেও প্রাণপণে দৌড়োয়—কি জানি আবার কি হল! শহরের কাঁকরভরা রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে, প্রায় সেখানে গিয়ে তারা থামে। যে ঘিয়েভাজা খেঁকী কুকুর দুটো ডাকতে ডাকতে তাদের তাড়া করেছিল, সে দুটো আগেই থেমে গিয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সারা ঘটনার হিসাব নিকাশ করে। তারপর গাঁয়ে ফেরে।

শুক্রা আর এতোয়ারী সারা বৃত্তান্ত শুনে বিশেষ কিছু বলে না। এই রকম যে একটা কিছু হবে, তা তারা আশাই করছিল। ধাঙড়ানীরা বলে যে, যাক্ দারোগার হাত থেকে যে বেঁচে এসেছিস সেই ঢের।

টীকা:—

(১) ঘুর—শীতে আগুন পোয়ানোর স্থান

(২) শাঁখড়েল—এক শ্রেণীর পেত্নীর নাম

(৩) ছড়িদার—তার কাজ পঞ্চায়েতের নোটিশ, বাদী, বিবাদী, সাক্ষী নায়েব সকলকে জানানো, জরিমানার টাকা আদায় করা, ইত্যাদি। আসলে কিন্তু সে মাতব্বরদের ঘুষের দালালী করে।

(৪) বাড়ীতে থাকলে বুদ্ধি থাকে পঁয়ত্রিশ; পথে বেরুলে বুদ্ধি হয়ে যায় পাঁচ; কাছারী পোঁছে একও দেখতে পায় না, যা হাকিম বলে তাই সত্যি মনে হয়।

(৫) আউয়ল ইতলায়—First Information Report

(৬) শ্বশুরটাকে—সাধারণ গালি

পুলিশের নামে ঢোঁড়াইয়ের পাপক্ষয়

এতোয়ারী পরের দিনও প্রত্যহের মত জয়সোয়ালদের সোডা-লেমনেডের কারখানায় কাজ করতে যায়। সেখানে ম্যানেজার সাধুবাবুকে সব কথা বলে। পুলিশ সাহেবের গাড়ি, সোডা আব তার আনুষঙ্গিক পানীয়ের বোতলের জন্য জয়সোয়াল কোম্পানীর দোকানে থামলে সাধুবাবু ইংরেজি মিশানো হিন্দীতে গত রাত্রের তাৎমাটুলির ঘটনাটির কথা তাঁকে বলেন। সাহেবের মাথা তখনও ঠিক ছিল; দিনের বেলা কোন কোন দিন থাকত।

"তাই নাকি। আমার চোখের উপর এই ব্যাপার! চ্যাপ্যাসী, কোটি পর বড়া ডারোগাকো সলাম ডেও। আগাগোড়া পচ ধরে গিয়েছে সার্ভিসের নীচের অঙ্গগুলিতে। সব ঠিক করতে হচ্ছে।"

সাহেবের রাগ দেখে কারখানার ঘরে এতোয়ারী ঘামতে থাকে।

সাধুবাবু এসে বলেন, "এবার খাওয়াও এতোয়ারী, তোমার কাজ করে দিয়েছি।"

"আমার নাম বলেন নি তো বাবু?"

"আরে না, না, সে আর আমায় বলতে হবে না। ও কি! বুরুশ না নিয়ে, এমনিই বোতল পরিষ্কার করছিস কেন? বুড়ো হয়ে এতোয়ারী তোর কাজে ফাঁকি দেওয়া আরম্ভ হয়েছে।"

এতোয়ারী অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

সেই রাত্রেই বড় দারোগাসাহেব দুজন কনস্টেবল নিয়ে গোঁসাইথানে পৌঁছান। আলো দেখে বাওয়া হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। চাটাইখানা বের করে পেতে দেয়। এত বড় হাকিমকে সে কি করে খাতির দেখাবে। চাটাইটার উপর দুই চাপড় মেরে ধূলা ঝাড়বার অছিলায় দারোগা সাহেবকে বসবার জায়গা দেখিয়ে দেয়।

কনস্টেবল ঢোঁড়াইকে বলে—কিরে দারোগা সাহেবের জন্য একখান খাটিয়াও যোগাড় করতে পারিস না?

হাঁ, কপিল রাজার জামাইয়ের কাছ থেকে একখান আনতে পারি।

দারোগা সাহেব বারণ করেন—না না অত 'খাতিরদারি'র (১) দরকার নেই।

গাঁয়ের চৌকিদার লম্বা সেলাম করে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ সাহেবের গালাগালির কথা, দারোগাবাবুর তখনও বেশ স্পষ্ট মনে আছে—সার্ভিসবুকে কালো দাগ পড়বার ভয়;—সব এই নচ্ছার চৌকিদারটা খবর দেয়নি বলে। খবর না দেওয়ার জন্যে চৌকিদারকে দুটি চড় মেরে দারোগাবাবু কাজ আরম্ভ করেন। আরম্ভ দেখেই সবাই বুঝতে পারে যে, আজ আর কারও রক্ষে নেই। চৌকিদারের মত 'অফসর' এরই যদি এই হালৎ হয়, তাহলে সাধারণ লোকের কপালে আজ কি-যে আছে, তা গোঁসাই-ই জানেন।

চৌকিদার যায় ধাঙড়টুলি থেকে সকলকে ডাকতে, আর কনস্টেবলরা যায় তাৎমাটুলি থেকে আসামীদের ধরে আনতে। ঢোঁড়াই এত কাছ থেকে দারোগা-পুলিশকে কখনও দেখেনি। তার ভয় ভয় করে। তাই চৌকিদারের সঙ্গে সঙ্গে ধাঙড়টুলির পথ ধরে।

ধাঙড়টুলিতে হুলস্থুল পড়ে যায়। আজ আর কারও নিস্তার নেই। কাল রাতের ছোটা দারোগার মারের হুমকির কথা শনিচরা আর বিরষার মনে আছে।

ছোটা দারোগাতেই ওই কাণ্ড। এতো আবার বড়া দারোগা। বাপরে বাপ! পালা, পালা; চল সব গাঁ ছেড়ে পালাই। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো উর্ধ্বশ্বাসে অন্ধকারে পালাতে আরম্ভ করে; কুলের জঙ্গলে, পুলের নীচে, বাঁশঝাড়ে। কেবল এতোয়ারী থেকে যায়, একজনও না গেলে দারোগা সাহেব চটবে। শুক্রা পালায় সবার শেষে। 'সনবেটা'কে ফেলে পালাতে শুক্রার মন সরে না—আসবি নাকি ঢোঁড়াই? ঢোঁড়াইয়েরও ধাঙ্গড়দের সঙ্গে পালাতে ইচ্ছে করে। আবার ভাবে যে, না বড় দারোগা আবার বাওয়াকে কি-না-কি করবে; বাড়িতে দারোগা। এই বিপদের সময় বাওয়াকে দারোগার হাতে একলা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আর তার জন্যই তো এত কাণ্ড। না হলে এতে বাওয়ার আর কি দোষ ছিল।

যাওয়ার সময় শুক্রা চৌকিদারের হাতে চার আনা পয়সা গুঁজে দিয়ে যায়। এতোয়ারী আর চৌকিদারের সঙ্গে ঢোঁড়াই ফিরে আসে। পথে এতোয়ারীর সঙ্গে চৌকিদারের ঠিক হয় যে, সে যেন দারোগা সাহেবকে বলে যে, ধাঙ্গড়েরা সকলে আজ ভোজ খেতে নীলগঞ্জে গিয়েছে। কেবল এতোয়ারী ছিল পাড়া পাহারা দেবার জন্য। সিকিটা ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে চৌকিদার ঢোঁড়াইকে বলে, তুই আবার যেন অন্য কিছু বলে টলে দিস না ছোঁড়া, বুঝলি।

ধাঙ্গড়দের উপর চৌকিদারের এই অভাবনীয় করুণায় ঢোঁড়াইয়ের মন তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

সমবেত তাৎমার দল সকলে একবাক্যে বলে যে, তারা কেউ কিছু জানে না। বাবুলাল পিটৌল এনেছিল। সে, তেতর নায়েব আর ধনুয়া মহতো ঘরে আগুন লাগিয়েছে।

কনস্টেবলরা বাবুলাল, তেতর, আর ধনুয়াকে গালাগালি দিতে দিতে সম্মুখে টেনে নিয়ে আসে। কোথায় গিয়েছে তেতর নায়েবের কাল রাতের প্রতাপ, কোথায় গিয়েছে ধনুয়া মহতোর জিয়লগাছে হেলান দিয়ে বসা ন্যায়াধীশের গুরুগাম্ভীর্য, কোথায় গিয়েছে চাপরাসী সাহেবের পদগৌরব। দারোগা-পুলিশের হাতে বেইজ্জৎ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার, জেল থেকে বাঁচবার, হাকিমের হাত থেকে রক্ষা পাবার। বাবুলাল করুণ দৃষ্টিতে

ঢোঁড়াইয়ের দিকে তাকায়, মহতো দেখে বাওয়ার দিকে—ত্রস্ত চাউনির ভিতর থেকে মিনতি আর কৃপাভিক্ষা ফুটে বেরুচ্ছে। তেতর উদ্‌গত শ্লেমা গিলে দারোগা সাহেবের সম্মুখে কাশি চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় আর কাশি চাপবার উৎকট প্রয়াসে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছে।

ঢোঁড়াইয়ের মনের ভিতর আগুন জ্বলছে;—এইবার ঠেলা বোঝো। দেখে যা দুখিয়ার মা, যে চাপরাসী সাহেবের জন্য তুই নিজেকে বাবুভাইয়াদের বাড়ির মাইজী মনে করিস, দেখে যা তার দশা। দেখিয়ে যা তালের বরফি দারোগা সাহেবকে, পিট্রৌলের শিশির মালকাইন।

হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের বাওয়ার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়; বাওয়ার মনের ভিতরটা সে পরিষ্কার দেখতে পা। সে ঢোঁড়াইকে অনুরোধ করছে—আসামীদের বিরুদ্ধে কোন কথা ব'লো না—যা হবার হয়ে গিয়েছে, জাতের লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি জীইয়ে রাখা ঠিক নয়।......

দারোগা সাহেবের জেরা আর গালাগালির বিরাম নেই। সব কটাকে জেলে পাঠাবো, সব কটার উপর 'চারশ ছত্তিস দফা' (২) চালাবো। সমস্ত গাঁটাকে পিষে একেবারে ছাতু ছাতু করে দেব, মুনেসোয়ার সিং দারোগাকে চেনোনা তাই। হিঁদু হয়ে থানের ইজ্জৎ রাখো না। মুসলমান হলেও না হয় কথা ছিল—তারা সব করতে পারে......

সব আসামীই বলে যে, তারা হুজুরের কাছে মিথ্যা বলবে না, হুজুর মা-বাপ। আকাশে চাঁদ আছেন, গোঁসাই আছেন। রামচন্দ্রজীর রাজ্য চলছে। হাতের পাঁচ আঙুল সমান নয়—তাদের মধ্যে যে খারাপ লোক কেউ নেই, তা বলছে না; তবে সরকারের নিমক খেয়ে সরকারের কাছে মিথ্যে বললে তাদের গায়ে যেন কুষ্ঠ হয়। তারা আগুন লাগিয়েছিল ঠিক।...

কেন? শয়তানের বাচ্চা কোথাকার!

বাবুলাল সামলে নেয়। হুজুর বাওয়ার ঐ চালাটার উপর একটা শকুন বসেছিল। শকুনবসা ঘর রাখতে নেই, তাতে পাড়ার অমঙ্গল, থানের অমঙ্গল, আর যে ঐ ঘরে থাকবে, তার তো কথাই নেই। এখানে একটা চামড়ার গুদাম আছে হুজুর, সেইটাই আমাদের জেরবার করলো, শকুন-টকুন পাড়ায় এনে।

সকলে প্রথমটায় অবাক হয়ে যায়। আসামী আর অন্য তাৎমাদের ধড়ে প্রাণ আসে। এখন সব নির্ভর করছে বাওয়া আর ঢোঁড়াইয়ের উপর—এই বুঝি তারা সব মিথ্যে ফাঁস করে দেয়। .

দারোগা সাহেব বাওয়াকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এরা যা বলছে তা সত্যি কি না।

বাওয়া উত্তর দেয় না। সে প্রথম থেকে দারোগা সাহেবের সম্মুখে একইরকমভাবে বসে আছে। কোন কথায় সাড়া দেয়নি।

দারোগা ভাবেন লোকটা কেবল বোবা নয়, কালাও। যাব সাধাবণতঃ তাই হয়। একবার যেন মনে হয়েছিল যে, সে শুনতে পাচ্ছে—তাই না খটকা লেগেছিল দারোগা সাহেবের মনে।

তুই বল ছোকরা।

ঢোঁড়াইয়ের সব ঘুলিয়ে যায়। মুখ থেকে কথা বেরুতে চায় না। জিব যেন জড়িয়ে আসছে। এত বিপদেও কি লোকে পড়ে। প্রাণপণ শক্তিতে সে কথা বলতে চেষ্টা করে।

জোরে বল্। ভয় করিস না। তুই এখানেই থাকিস নাকি? বাপকা নাম?—এক নিশ্বাসে দারোগা সাহেব বলে যান।

ঢোঁড়াই মাথা নেড়ে জানায় যে, হাঁ সে এখানেই থাকে।

"এরা যা বলছে তা কি সত্যি?"

এতগুলো লোকের ভবিষ্যৎ এখন তার হাতে। একবার মাথা নাড়লে সে এখনই তাদের জাতের সেরা 'লোকক'টির পঞ্চগিরি ঘুচিয়ে দিতে পারে, জেলের হাওয়া খাইয়ে আনতে পারে, অন্ততঃ পুলিশকে দিয়ে মার খাইয়ে বেইজ্জৎ তো করাতেই পারে। তার মনও তাই চায়। এই পঞ্চায়েতের অত্যাচারের মাথাগুলোকে নীচু করাতে, এমন নীচু করাতে যাতে তারা আর কোনদিন মাথা উঁচু করে বাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে না পারে—যাতে তারা ঢোঁড়াইকে আর তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখতে পারে।

কিন্তু বাওয়ার চাহনির আদেশ সে অমান্য করতে পারে না।…বাওয়া নীরবে তাকে বলছে, যে জেলে ধরে নিয়ে গেলে এদের এখন ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া ভাত

খেতে হবে, কোথায় থাকবে, তাৎমা জাতের গৌরব, কোথায় থাকবে 'কনৌজি তন্ত্রিমা ছত্রিদের' সুযশের সৌরভ।...

এতোয়ারী উস্‌খুস করে। বয়সের অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারে যে বাওয়া আর ঢোঁড়াই কেউই সত্যি কথা বলবে না। এতক্ষণ সে মনে মনে ভাবছিল, যে গোঁফমোটা জেলরবাবু রবিবারে রবিবারে আসেন জয়সোয়াল কোম্পানীতে, সওদা করতে, সাধুবাবুকে দিয়ে তাঁকে বলিয়ে, বাবুলাল আর মহতোর হাতে বোনা একখানা সতরঞ্চি সে জেলখানা থেকে আনাবে; এনে একবার তার উপর বাওয়াকে বসাবে; তার জন্য যত খরচ হয় হোক: অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে কর্জও যদি নিতে হয়, তাও স্বীকার...কিন্তু সব 'চৌপট' (৩) করে দিল ঐ ঢোঁড়াইটা।

সে বলে যে, হাঁ বাবুলালের কথা সত্যি।

"কবে বসেছিল শকুন?"

"কাল সকালে।"

"মদ্দা না মাদী।"

ঢোঁড়াই ঢোক গেলে।

"দুদিন পরে মোচ উঠবে এখনও শকুনের মদ্দা মাদী চেনো না—বদমাস ছোকরা। অশথগাছে না বসে চালার উপর বসলো কেন শকুনটা—মিথ্যাবাদীর ঝাড় সব!"

ঢোঁড়াই এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারে না। সে মনে মনে ভাবে, এইবার বোধহয় দারোগাসাহেব তাকে মারবার জন্য উঠবেন।

"আর কেউ কিছু জানিস, এ সম্বন্ধে। এই বুড্‌ঢা!"

এতোয়ারীর সাদা ভুরুর নীচের ঝাপসা চোখজোড়া আর নির্বিকার মুখ দেখে, তার মনের কিছু বুঝবার উপায় নেই। সে ভেবেছিল তাৎমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলবে; কিন্তু থানা পুলিশের ভয়ে সব কথা চেপে যায়। ঢোঁড়াইয়ের সাক্ষ্যেই যদি এই 'চোট্টা'গুলিকে সায়েস্তা করা যেত, তাহলে, মাছও উঠতো, ছিপও ভাঙতো না। কিন্তু এমন সুযোগ পেয়েও এই নোংরা কুড়ের বাদশা, 'বিলকুল চোট্টা' পঞ্চগুলিকে ছেড়ে দিল ঢোঁড়াই। এ জাতটাকেই বিশ্বাস নেই। ও

ছোঁড়ার শরীরেও তো এদেরই রক্ত।·· ···কাল সাধুবাবুর কাছে মুখ দেখানো শক্ত হবে তার।

"না হুজুর, আমি থাকি ধাঙ্গড়টুলিতে।"

দারোগাবাবু সাক্ষী না পেয়ে বকে ঝকে চীৎকার করে উঠে পড়েন। চৌকিদারকে বলেন—এ শালাদের উপর ভাল করে নজর রাখবে। না হলে তোমার চাকরি থাকবে না।

চৌকিদার ঝুঁকে কুর্নিস করে। দারোগাসাহেব কপিলরাজার জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করে, তারপর শহরে ফেরেন।

একজন কনষ্টেবল কেবল থেকে যায়। সে ছড়িদারকে দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিসব কথাবার্তা বলে। ছড়িদার এসে মহতো নায়েবদের বলে যে, সিপাহীজী জানে যে ঢোঁড়াই বাবুলালের স্ত্রীর ছেলে। সব খবর পুলিশ রাখে। সে এখনি গিয়ে দারোগাসাহেবকে বলে দেবে যে, এই জন্যেই ঢোঁড়াই বাবুলালের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। তারপরই সবকটাকে জেলে পুরবে।

"পঞ্চরা" চাঁদা করে কিছু কিছু দিয়ে ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করে ফেলে, সিপাহীজীর সঙ্গে।

টীকা :—

(১) সম্মান দেখানোর

(২) ফৌজদারী আইনের চারশ ছত্রিশ ধারার মোকদ্দমা

(৩) মাটি করে দিল

ঢোঁড়াই ভকতের মর্যাদা বৃদ্ধি

এই ঘটনার পর ঢোঁড়াইকে মহতো নায়েবরা আর কিছু বলতে পারে না। মনে মনে নিশ্চয়ই সেই আগেকার মতই বিরূপ তার উপর, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিস আছে। আর রাগ না চাপলে উপায় কি, মোকদ্দমা আবার, 'খুলে যেতে' কতক্ষণ। পুলিশকে খবর দিয়েছিল কে তা তাৎমারা বুঝতে পারে না। সে লোকটাকেও খুশী করে রাখতে হবে।

বাওয়ার চালাঘর তাৎমারাই আবার তুলে দেয়। বাওয়া কিন্তু তার মধ্যে আর কখনও শোয় না। কেবল বর্ষার সময় ঢোঁড়াই বাওয়াকে ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে যায়।

পাড়ার সকলে ঢোঁড়াইয়ের প্রশংসা করে। এতবড় বিপদের থেকে, এতবড় বেইজ্জতি থেকে, সে জাতটাকে বাঁচিয়েছে। তাকে আর কিছু হোক, তাচ্ছিল্য করা চলে না। পাড়ার ছেলেরা ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলে ধন্য হয়, মেয়েরা ডেকে কথা বলে। তার বয়সী অন্য ছেলেদের গাঁয়ের বয়স্ক বয়স্থারা "ওরে ছোঁড়া" বলে ডাকুক; কিন্তু তাকে এখন ঢোঁড়াই ছাড়া আর অন্য কিছু বলে ডাকতে বাধে—দুখিয়ার মার পর্যন্ত। এতটা সম্মান বাওয়া আর ঢোঁড়াই নিজের পাড়ায় কখনও পায়নি।

কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের মাটি কাটার কথাটা যেমন এই সূত্রে চাপা পড়ে যায়, তেমনি আবার একটা চার বছরের পুরনো কথা হঠাৎ বেরিয়ে আসে—ঐ "চামড়াগুদামবালা" কপিলরাজার জামাইয়ের কথাটা। ওটা চাপা পড়ে গিয়েছিল সেবার গানহী বাওয়ার "সুরাজ"এর (১) তামাসার হিড়িকে।

বাবুলাল যে সেদিন দারোগাসাহেবের কাছে চামড়াগুদামের কথাটা তুলেছিল সেটার মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচানো ছাড়াও অন্য কথা ছিল। এমনিই তো সবাই ছিল 'চামড়াবালা মুসলমান'টার উপর চটা। তার উপর কিছুদিন থেকে সে জিরানিয়ার একজন মেথরানীকে বাড়িতে এনে রেখেছে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে যে, তাকে মুসলমান করে বিয়ে করবে।

কি যে পছন্দ ও জাতটার বুঝি না। একটা বৌ থাকতে আবার ঐ মেথরানীকে বিয়ে করতে ইচ্ছেও হয়। বলিহারি প্রবৃত্তির! গা দিয়ে সেটার ভক ভক ভক ভক করে নিশ্চয় দুর্গন্ধ বেরোয়। এনে রেখেছিলি তাও না হয় বুঝেছিলাম; কিন্তু তাকে মুসলমান করে নিয়ে বিয়ে? কভ্‌ভী নহী!— হেঁপো রুগী তেতর পর্যন্ত তাল ঠুকে বলে।

সেদিন দারোগাসাহেব রাতে ওর ওখানে গিয়ে কি বলেছেন, কি করেছেন জানতে পারা যায়নি। নিশ্চয়ই 'তাড়া টাড়া দিয়ে থাকবেন,—যা চটেছিলেন থানের থেকে যাওয়ার সময়।

এই মেথরানীর ব্যাপার নিয়ে গ্রামে বেশ সোরগোল পড়ে যায়। এমনি তো থানা পুলিশের ভয় ছিলই, তার উপর আবার গোঁসাইথানে হয়ে গেল ঢোঁড়াইকে নিয়ে কাণ্ড; তাই কেউ আর কিছু করতে সাহস পায় না।

মেথরানীটাকে মুসলমান করে বিয়ে করা জিনিসটা, ধাঙড়রাও পছন্দ করে না। তারা নিজেরা হিঁদু কিনা, এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামানো দরকার মনে করেনি; তবে তারা যে মুসলমান নয় এ কথা তারা জানতো। এই মেথরানীর বিয়ের ব্যাপারটাতে তাদের কেন যেন মনে হয় যে, তাদের হিঁদু জাতের উপর জুলুম করা হচ্ছে। মেথরানীকে তারা ছোঁয় না ঠিক; তা হলেও সে তাদেরই মেয়ে। সেই মেয়েকে নিয়ে যাবে গরুখোরে? ছেলে হলেও না হয় অন্য কথা ছিল; এ মেয়ের ব্যাপার; বিলকুল বেইজ্জতির কথা। আর যখন লা'র ব্যবসা ছিল, শিমুল গাছ কাটার কাজ ছিল, তখন না হয় কপিলরাজার সঙ্গে রোজগারের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই জামাইটা "পরদেশী শুগা" (২), আজ নিমফল খেতে বসেছে এখানকার নিমগাছে, কাল থাকবে না। করে চামড়ার ব্যবসা, যার সঙ্গে ধাঙড়দের রোজগারের কোন সম্বন্ধই নেই। এটার সঙ্গে কিসের খাতির?

কিন্তু কি তাৎমাটুলির, কি ধাঙড়টুলির বড়রা কেউ থানা পুলিশের ভয়ে এবিষয়ে এগুতে রাজী নয়। ঢোঁড়াই এখন ছেলেদের মধ্যে একটু কেষ্ট বিষ্টু গোছের হয়ে উঠেছে। ধাঙড়টুলি তাৎমাটুলি দুই জায়গার ছেলেরাই তার কথা শোনে। 'পঞ্চ'রা ঢোঁড়াইকেই বলে চুপি চুপি—রাতে মধ্যে মধ্যে ঢিল ফেলিস চামড়াগুদামে। খুব সাবধানে; এসব ছেলেপিলের কাজ। তোদের বয়সে আমরাও অনেক করেছি।

'পঞ্চ'রা মনে মনে ভেবে রেখেছে যে, এ নিয়ে বিপদ আপদ কিছু হলে, ঢোঁড়াইটার উপর দিয়েই যাবে।

ঢোঁড়াইরা মুসলমানটাকে একটু জব্দ করুক বাওয়াও তাই চায়। শোনা যাচ্ছে যে, 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ির' মোহন্তজীরও এতে সমর্থন আছে। টোলার মহতো নায়েবদের কাছ থেকে, এত বড় দায়িত্ব আর বিশ্বাসের পদ পেয়ে ঢোঁড়াই বর্তে যায়। কিন্তু একাজ তাদের বেশীদিন করতে হয় না। হঠাৎ শোনা যায় গানহী বাওয়া জিরানিয়ায় আসছেন, 'সাভা' (৩) করতে। তাঁকে কি কেউ জেলে ভরে

রাখতে পারে। এক মন্তরে তালা পাঁচিল ভেঙ্গে বাইরে চলে আসেন। গানহী বাওয়া মেথর মেথরানীদের খুব ভালবাসেন। তিনি এখানে এলে তাঁকেই বলা যাবে—এই জুলুম আর বেইজ্জতির একটা কিছু বিহিত করতে।

বন্ধ করে দে এখন ঢিল ফেলার কাজ, ঢোঁড়াই। কদিন দেখই না।

ঝিকটিহার মাঠে গানহীবাবার 'সাভা'য় পৌঁছে তারা দেখে কি ভিড়! কি ভিড়! বকড়হাট্টার মাঠে যত ঘাস, তত লোক; ই-ই-ই এখানে থেকে মরণাধারের চাইতেও দূর পর্যন্ত লোক হবে। গানহীবাবার "রস্‌সি ভর" এর (৪) মধ্যেই তারা যেতে পারেনি, তার আবার তাঁর সঙ্গে কথা বলা। গানহী বাওয়ার কাছে বসেছিলেন মাস্টার স্যাব, বুধনগরের রাজা সাব, আরও কত বড় বড় লোক সব। কপিলরাজার জামাইয়ের কথাটা না বলতে পারায়, তাৎমাদের দুঃখ হয় খুব। একবার বলতে পারলেই কাজ হয়ে যেত। কিন্তু এই 'বেশুমার' লোকের সকলেরই হয়ত নিজের নিজের কিছু কিছু কাজের কথা বলার আছে। যাঁর ধর্ম তিনি নিজেই যদি রক্ষা না করেন তাহলে আমরা কি করতে পারি। যাক গানহী বাওয়ার, 'দর্শন'টাতো হলো। ঢোঁড়াই দেখে যে, তার চাইতেও বোধহয় বেঁটে—কিন্তু কি লরম, ঠাণ্ডহা (৫) চেহারা—ঠিক মিসিরজীর মত। ঢোঁড়াই শুনেছে যে ঘি খেলে নাকি অমনি চেহারা হয়। কিন্তু এ কিরকম 'সন্ত আদমী' (৬), দাড়ি নেই। ঢোঁড়াইদের সব চাইতে খারাপ লাগে, সৌখীন বাবুভাইয়াদের মত এই সন্ত আদমীর আবার চশমা পরার শখ। গানহী বাওয়ার চেলারা সকলকে বসতে বলে। দর্শন হয়ে গিয়েছে, আর তারা বসে। কেবল বৌকা বাওয়া বসে থাকে—দূর থেকে সে দেখে কম, তাই সাভা শেষ হলে একবার ভাল করে দর্শন করবে বলে।

কিন্তু আজব ব্যাপার! ঢোঁড়াইদের কাজ হাসিল হয়ে গেল এর দিন কয়েকের মধ্যে। চামড়া গুদামটা উঠে গেল ইস্টিশানের কাছে। আসল কথা ইস্টিশানের কাছে না গেলে চামড়া চালান দেবার স্থবিধে হচ্ছিল না, কিন্তু তাৎমাটুলি ধাঙড়টুলিতে এর ব্যাখ্যা হল অন্য রকম। ঢোঁড়াইয়ের দলের ঢিলের জোর, গানহীবাওয়ার অদৃশ্য প্রভাব, আর সেদিনের দারোগাসাহেবের হুমকি,

তিনটে মিলে যে কপিলরাজার জামাইকে এখান থেকে ভাগিয়েছে, এ সম্বন্ধে আর কারও কোন সন্দেহ নেই।

এই ঘটনার পর গাঁয়ে ঢোঁড়াইয়েব প্রতিষ্ঠা যেমন বাড়ে, তাব আত্মপ্রত্যয় বাড়ে তার চাইতে অনেক বেশী। সে মনে মনে অনুভব করে যে রামজী আর গোঁসাই তার দিকে,—ঐ এমনি বোঝা যায় না, মনে হয় তাঁরা ঘুমুচ্ছেন, কিন্তু দেখছেন সব উপর থেকে, যিনি অন্যায় কবেছেন তাঁকে ঘা খেতেই হবে।

রামজী ঢোঁড়াইয়ের তবফে, আব এখন সে কাব পবোয়া করে দুনিয়ায়?

টীকা:—

(১) স্বরাজ শব্দের বিকৃত উচ্চারণ
(২) বিদেশী টিয়াপাখী
(৩) সভা, মিটিং
(৪) এক রশি অর্থাৎ সিকি মাইল
(৫) নরম, ঠাণ্ডা
(৬) সন্ন্যাসী মানুষ

তন্ত্রিমাছত্রিদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ

ভাগলপুর জেলার সোনবর্ষা থেকে মরগামায় এসেছিল মহগু দাস। তা বলে মরগামার মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের ওখানে নয়। মুঙ্গেরিয়া তাৎমারা রাজমিস্ত্রির কাজ কবে, ওদের 'ঝোটাহারা' মইয়ে চড়ে। তাদের ওখানে হেঁজিপেঁজি কনৌজী তাৎমাও জলস্পর্শ করে না, তার আবার মহগুদাসের মত লোক উঠবে সেখানে। ওাব বলে কত হাল বলদ জমি জিরেৎ, তিন তিনটে সাদী (১), ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেবা আঙ্গিনা, 'জনানী'রা (২) বাড়ির বাহিরে যায় না, ছেলেপিলে নাতিপুতি, বাড়বাড়ন্ত সংসার।

সিরিদাস বাওয়ার কুর্মী চেলারা মরগামায় একটা সাভা করেছিল। সেই কুর্মী গুরুভাইদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে মহগুদাস এসেছিল;—আর সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের দর্শনটাও হয়ে যাবে, এটাও ছিল ইচ্ছা।

সেই সময় মহংগুদাস কিছুক্ষণের জন্য এসেছিল তাৎমাটুলিতে। অত বড় একটা লোককে এরা 'খাতিরদারী' কি করে করবে, তাই তাকে এরা থাকতেও বলেনি। কেবল ডিস্টিবোড অপিস থেকে ডেকে আনিয়েছিল বাবুলালকে। গাঁয়ের মধ্যে ভালা আদমীর সঙ্গে কথা বলা লোক, বাবুলাল ছাড়া আর কে আছে। সেই সময় মহংগুদাসই কথা পাড়ে, জাতের সম্বন্ধে—তাৎমারা যে সে জাত নয়। রামচরিতমানসে তুলসীদাসজী বলে গিয়েছেন যে, তারা তন্ত্রিমাছত্রি, একেবারে ব্রাহ্মণ না হলেও ঠিক ব্রাহ্মণের'পরেই। পচ্ছিমে সব জায়গায় কনৌজী তাৎমারা এই' নাম নিয়েছে, আর নিয়েছে জনৌ' (৩)। এই দেখো, বলে মহংগুদাস তুলোর কুর্তার ফিতে খুলে বের করে দেখায় তার গলার পৈতেটা—আঙ্গুলের মত মোটা, সোনাব মত হলুদ রঙের।

মহংগুদাস তো গেলেন চলে, কিন্তু জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন আগুন তাৎমাটুলিতে।

ঢোঁড়াই, রবিয়া, আরও অনেকে তখনই পৈতা নিতে চায় কিন্তু মহতো নায়েবরা রাজী না। এসব জিনিস হটু করে করে ফেলা কিছু নয়। বুড়োরা ভয় পায়—'ধরম' নিয়ে ছেলেখেলা করা ঠিক নয়। পচ্ছিমে করছে, পচ্ছিমের লোক তোকে হাতের আঙ্গুল কেটে দিতে বল্লে দিবি? পচ্ছিমে এক সের আটার রুটি হজম হয়, এখানে হয়? 'গোঁসাই'কে ঘাঁটাস না খবরদার!—যেমন আছেন তেমনি তাঁকে থাকতে দে; খুশী না হন, অন্ততঃ তোর উপর চটবেন না।

তাৎমাদের পুরুত মিসিরজী, গত দুবছর থেকে প্রতি রবিবারে গোঁসাইথানে রামায়ণ পড়ে শুনিয়ে যান, আর এর জন্য এক আনা করে পয়সা দক্ষিণা পান পঞ্চায়তের কাছ থেকে। তাঁরই কাছে 'পঞ্চ'রা জিজ্ঞাসা করে পৈতা নেওয়ার কথা। তিনি বলেন যে, মহংগুদাস বাজে কথা বলেছে—রামায়ণে তন্ত্রিমাছত্রির কথা লেখা নেই। কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করে না। ঢোঁড়াই পরিষ্কার তাঁর মুখের উপর বলে দেয় যে, তিনি অন্য জাতের নতুন করে পৈতা নেওয়া পছন্দ করেন না, তাই সত্যি কথাটা চেপে যাচ্ছেন। তুমি খামকা ভয় পাচ্ছ মিসিরজী; তুমি এলে গায়ের কম্বল চার পাট করে মুড়ে, ইয়াঃ 'গদ্দাদার' (৪) আসন পেতে দেবো বসতে—যেমন এখন পেয়েছো। চির-অ-কা-আল……

বাওয়া ঢোঁড়াইকে থামিয়ে দেয়।

'সুভ আচরণ কতহুঁ নেহি হোই।
দেব বিপ্র গুরু মানই ন কোঈ॥' (৫)

বলে, মিসিরজী চটে শালুর খোলে রামায়ণটি বাঁধতে আরম্ভ করেন।

তারপর ঢোঁড়াইরা মরগামায় সিরিদাস বাওয়ার কুর্মী চেলাদের সঙ্গে, এই পৈতা নেওয়া নিয়ে অনেকবার দেখাশুনো করেছে। তারাও পৈতা নিতে বারণ করে তাৎমাদের। ঢোঁড়াই চটে আগুন হয়ে যায়;—কুর্মী কূর্মছত্রি হতে পারে, কিন্তু আমরা পৈতা নিলেই পৃথিবী ফেটে জল বেরিয়ে যাবে; না?

আমাদের কথা পছন্দ না, তা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলি কেন?

তাৎমাটুলি যখন এই ব্যাপার নিয়ে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখন ধন্নুয়া মহতোর বাড়ীতে এল তার শালা মুঙ্গীলাল, 'কুটমৈতি' (৬) করতে। তাৎমাটুলির তাৎমাদের মধ্যে মহতোই প্রথম বিয়ে করেছিল নিজের গাঁয়ের বাইরে ডগরহাতে, জিরানিয়া থেকে ন' মাইল দূরে। আজকাল 'কুটমৈতি'তে কেউ এলেই বাড়ীর লোকে বিরক্ত হয়। কুটুম এসেই বলবেন 'ভেটমুলাকাৎ' (৭) করতে এলাম। কিন্তু বাড়ীর লোক সবাই জানে যে, 'ভেটমুলাকাতে'র তখনই দরকার হয়, যখন নিজের বাড়ীতে খাওয়া জোটা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কুটুম এলেই দিতে হবে পা-ধোবার জল, খড়ম থাকলে খড়ম, বসতে বলতে হবে বাইরের বাঁশের মাচাতে, নিজেরা খাও না খাও তাকে দুবেলা ভাত খাওয়াতেই হবে, আর আঁচানোর জল তার হাতে ঢেলে দিতেই হবে; কিন্তু এবার মুঙ্গীলালের খাতির বেশী, সে পৈতা নিয়েছে; ডগরাহার সব তাৎমাই নিয়েছে। পৈতাটা কানে জড়িয়েই, সে তার দিদির বাড়ীর দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল। পা ধুয়েই সে পৈতার কথাটা পাড়ে। মহতোর ছেলে গুদর ডেকে নিয়ে আসে ঢোঁড়াইকে। পাড়াশুদ্ধ সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে কুটুমের মাচার উপর। খাসা মানিয়েছে পৈতাটা কানে জড়িয়ে! আরে হবে না এ যে আমাদের নিজেদের জাতের জিনিস। সেকালে আমাদের বাপঠাকুরদাদারা যখন কাপড় বুনতো, তখন মাড় দিয়ে সুতো মাজবার সময় সব্বাই কানে জড়িয়ে রাখতো এক একটা গোছা সুতো। মাজতে গিয়ে সুতো ছিঁড়ছে কি কানের থেকে একগাছ খুলে নিয়ে ছেঁড়াটা জুড়ে দাও। পৈতা কি আর আমাদের নতুন জিনিস।

সেকালের তন্ত্রিমাছত্রিদের পূত-গৌরবের উত্তরাধিকারীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পচ্ছিমের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এ জেলায় চার কোশ দূরের তাৎমারা পৈতে নিয়েও যখন তাদের মাথায় 'বজ্জর' (৮) পড়েনি, তখন আমরা নেবোনা কেন? মুঙ্গীলালও এতে সায় দেয়। মহতো শালাকে কিছু বলতে পারে না। মনে মনে ভাবে যে, তাৎমাটুলির লোকদের দলে ভিড়াতে না পারলে, ডগরাহার তাৎমাদের 'বিয়াসাদী কিরিয়াকরম'-এর অসুবিধা হবে, তাই মুঙ্গীলালটা এই সব ছোকরাদের নাচাচ্ছে।

খালি ছোকরাদের মধ্যে জিনিসটা সীমাবদ্ধ থাকলে না হয় মহতো তাড়াতাড়ি দিয়ে ব্যাপারটা সামলে নিতে পারতো। লাল্লু নায়েবও ছেলেদের দিকে হয়ে গেল, বাবুলালেরও নিমরাজি নিমরাজি ভাব, এই পৈতা নেওয়ার সম্বন্ধে। হেঁপো তেতর হাঁ না কিছুই বলে না। ঠিক হয় পৈতে নেওয়া হবে। তবে এটা "কানফুকনেবালা গুরুগোঁসাই" (৯) এর অনুমতি সাপেক্ষ।

তিনি থাকেন অযোধ্যাজীতে। সেই একবার এসেছিলেন তাৎমাটুলিতে, যেবার জিরানিয়ায় "টুরমন"এর তামাসা (১০) হয়। সকলের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয়েছিল তাঁকে দেবার জন্য। অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে কিছু কর্জও করতে হয়েছিল, তাঁর 'গন্ধীবালা কিলাসের টিকস' (১১) কাটিয়ে দেবার জন্য; এগারো টাকা সাড়ে তিন আনা ভাড়া; না না মহতোর বোধহয় ভুল হচ্ছে ন' টাকা সাড়ে তিন আনা, সে কি আজকের কথা; সাড়ে তিন আনাটা ঠিক মনে আছে, তবে টাকাটা এগার কি ন'……বাবুলাল তুমিই বলনা, 'অফসুর আদমী'—তোমরা……হিসেব টিসেব জানো ...

বাবুলাল বলে, দশটাকা সাড়ে তিন আনা। সকলেই জানতো যে বাবুলাল দশ টাকাই বলবে; পরিমাণ, মাপ, সংখ্যা প্রভৃতি নিয়ে ঝগড়া উঠলে মাঝামাঝি একটা নির্ণয় দেওয়াই ভাল 'পঞ্চ'দের নিয়ম।…

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—মহতো কেশে গলা পরিষ্কার করে নেয়—'গুরুগোঁসাই'কে একখানা 'পোসকার্ট' (১২) লেখা যাক।

গ্রামে সাড়া পড়ে যায়—অযোধিয়াজীতে পোসকার্ট লেখা হবে। গাঁয়ে এর আগে কখনও চিঠি লেখা হয় নি। তবে মহতো নায়েবরা খবর

রাখে যে, ডাকঘরের মুন্সীজী চিঠি লিখতে নেয় এক পয়সা। মিশিরজী লেখে ভাল। কিন্তু সে কি দু'পয়সার কম কাজ করবে। যেমন জায়গায় পূজো দিতে যাবে, তেমনি খরচ হবে। 'থানে' এক পয়সার গুড়ে পুজো হতে পারে, কিন্তু অযোধিয়াজীতে পূজো দেওয়া তো দূরের কথা, পৌছুতেই দশ টাকা খরচ হয়ে যাবে।

মহতো পোসকার্টের দাম দিতে চায় না, বলে পঞ্চায়তের ত'বিলে 'খড়মহড়া' ও (১১) নেই।

ঢোঁড়াইয়ের দল জ্বলে ওঠে—"কি করেছো জরিমানার সব পয়সা?"

ছড়িদার পঞ্চদের বাঁচিয়ে দেয়—"পঞ্চরা তাব হিসেব দেবে কি তোমাদের কাছে?"

"হ্যা দিতে হবে হিসেব", "কেন দেবে না?"

একটা বড় রকমের ঝগড়া আসন্ন হয়ে ওঠে।

ঢোঁড়াই নিজের বাটুয়া থেকে একটা পয়সা বার করে দেয়—"এই আমি দিলাম পোসকার্টের দাম।" সকলে অবাক হয়ে যায়—ঢোঁড়াইটা পাগল হল নাকি! দশের কাজ, একজন দিয়ে দিচ্ছে কি? আর একটু অপেক্ষা করলে মহতো নিজেই দিয়ে দিত। বোকা কোথাকার!

বাবুলাল ঢোঁড়াইকে বলে "আর এক পয়সা লাগবে পোসকার্টে"। ডিষ্টিবোডের অফসর—পৃথিবীর সব খবর তার নখদর্পণে। ঢোঁড়াই আরও একটা পয়সা ফেলে দেয় সকলের মধ্যে।

মহতো বলে, বাবুলাল তুমিই তাহলে কিনো পোসকার্ট, দেখেশুনে। ঢোঁড়াই তুই মিসিরজীকে রবিবারে দোয়াত কলম আনতে বলে দিস।

রবিবারে মিসিরজী রামায়ণ পাঠের বদলে চিঠি লিখে দেন; আজ মেয়েরা পর্যন্ত রামায়ণ শুনতে এসেছে। কি জোর দিয়ে দিয়ে লেখে! এখানে পর্যন্ত খস্ খস্ করে শব্দ শোনা যাচ্ছে; দেখতে দেখতে কালি ফুরিয়ে যাচ্ছে কলমের। পৈতে নেওয়াটা মিসিরজীর মনঃপুত নয়, কে জানে আবার ভুলটুল না লিখে দেয় পোসকার্টে ...

ঠিক হয় বাবুলাল চিঠি ডাকে দেবে। সকলে ডাকঘর পর্যন্ত তার সঙ্গে যায়।

তারপর চলে কত জল্পনা-কল্পনা, ডাক পিয়নের জন্য প্রত্যহ প্রতীক্ষা। কি চিঠি মিসিরজী লিখে দিয়েছিল কে জানে। একমাস অপেক্ষা করেও চিঠির জবাব আসে না গুরুগোঁসাইয়ের কাছ থেকে।

ঢোঁড়াইদের আর ধৈর্য থাকে না। আবার গাঁয়ে চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে যায় এ নিয়ে।

ঢোঁড়াই বলে—"আর কেউ না নিক, আমি একাই পৈতা নেবো। কালই যাব সোনবর্গা।"

অন্তরের থেকে সকলেই এই জিনিসটাই চাইছিল। কেবল মনে মনে একটু ভয় ছিল,—কি জানি কি হয়; ডগরাহার তাৎমারা পৈতে নেওয়ার পর সেখানে অনেকগুলো গরুমোষ, দু' তিন দিনের অসুখে মারা গিয়েছে—গরুগুলো খায়ও না দায়ও না, দু তিন দিন গোবরের সঙ্গে রক্ত পড়ে, তারপর মরে যায়।

যাক্, তাৎমাটুলির লোকদের চাষবাস গরুমোষের বালাই নেই। গুরুগোঁসাইয়ের নাম নিয়ে তারা পৈতা দেওয়ানোর জন্য বামুন ডেকে পাঠায় সোনবর্গা থেকে।

তারপর একদিন গাঁশুদ্ধ ছেলেবুড়ো একসঙ্গে মাথা নেড়া করে আগুনের ধারে ব'সে, গলায় কাছির মত মোটা পৈতে নেয়। দুদিন গাঁয়ের মেয়ে পুরুষরা আলাদা থাকে; তারপর একসঙ্গে ভাতের ভোজ খেয়ে নিজের নিজের বাড়ী ফেরে। সেদিন থেকে তাৎমারা হয় 'দাস'—ঢোঁড়াই ভকত হয়ে যায় ঢোঁড়াইদাস।

মহতো নায়েবদের বিরুদ্ধে পৈতা নেওয়ার দলের নেতৃত্ব কবে কি করে এসে পড়েছিল ঢোঁড়াইয়ের উপর, তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। লোকে বোধ হয় বুঝেছিলো যে মাটিকাটা নিয়ে তার দেওয়া আঘাত সমাজ সহ্য করে গিয়েছে। হিম্মৎ আছে ছোকরার। আর পৈতার ব্যাপারে ওটা বলে ঠিক সবার মনের কথাটা। তার একটা জিনিস সবাই লক্ষ করেছে যে, যে যতই ঢোঁড়াই 'পঞ্চ'দের বিরুদ্ধে কথা বলুক, মহতো সেরকম কড়া হতে পারে না আর ঢোঁড়াইয়ের উপর। কেন যে তা, বোঝে কেবল মহতো গিন্নী আর মহতো—আর অল্প-সল্প আন্দাজ করে ঢোঁড়াই।

টীকা :—

(১) বিয়ে

(২) মেয়েছেলেরা

(৩) জনৌ—পৈতা

(৪) গদিমুক্ত

(৫) ভাল আচরণ আর কোথাও থাকিল না। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুকে কেহই আর মানে না। (তুলসীদাস)

(৬) কুটুম্বিতা

(৭) দেখাসাক্ষাৎ

(৮) বজ্র

(৯) কানফুকনেবালা গুরুগোঁসাই—দীক্ষাগুরু

(১০) ডিষ্ট্রীক্ট টুর্ণামেণ্ট (১৯১৭), যুদ্ধে সাহায্যই ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য

(১১) ইণ্টার ক্লাশ টিকিট

(১২) পোষ্টকার্ড

(১৩) কানাকড়ি

ঢোঁড়াই দাসের নূতন জীবিকা

ঢোঁড়াই "পাক্কী"তে (১) কাজ করে। তার পাথরে কোঁদা হাতের পেশীগুলি গত দেড় দু বছরে আরও সবল হয়ে উঠেছে। গানের সময় গলার স্বর ভারি ভারি ঠেকে। রাস্তা মেরামতের কাজের সব রহস্যই এখন সে জেনে গিয়েছে। বর্ষার আগে "ডিরেসিং"এ কি করে ফাঁকি দিতে হয়, কি করে কেবল উপরের ঘাস চেঁচে নিয়ে রাস্তার গর্তর উপর চাপা দিতে হয়, সড়কের ধারের চৌকোণা মাটিকাটা গর্তগুলির মাটি উপর উপর কেটে কি করে অফিসার ঠকাতে হয়, ভাঙ্গা পাথরের স্তূপ মাপবার সময় কেমন করে কাঠি ধরলে মাপে বাড়ে, সব তার জানা হয়ে গিয়েছে। শেষের কাজটাতেই লাভ সবচেয়ে বেশী। এইসব কাজে "ওরসিয়র" বাবু আর ঠিকেদার সাহেব তাদের বকশিশ করেন; কেবল সর্ত হচ্ছে যে এনজিনিয়র সাহেব কি চেরমেন সাহেব হঠাৎ এসে জেরা করতে আরম্ভ করলে, তাদের গুছিয়ে জবাব দিতে হবে। জেরায় মচকেছো কি গিয়েছো। তাহলেই "জিলা-খারিজ" (২)। আর জেরায় উৎরে গেলেই পেটভরে "দহিচূড়া"র ভোজ;

—চূড়াদহির নয় দহিচূড়ার,—দই বেশী, চিড়ে কম। নুন দিয়ে খাও, কাঁচালঙ্কা পাবে; মিঠা দিয়ে খেতে চাও গুড় পাবে—ইয়াঃ দানাদার গুড়, একেবারে লসলস্ লসলস্।

রাস্তার পাকা অংশটির উপর দিয়ে গরুর গাড়ি গেলে শনিচরারা গাড়োয়ানদের ভয় দেখিয়ে পয়সা আদায় করে। ঢোঁড়াই এ কাজ করতে পারে না, তার ভয় ভয় করে;—গোঁসাই আর রামজী সব দেখতে পাচ্ছেন উপর থেকে। বরঞ্চ একলা থাকলে গাড়োয়ানকে সাবধান করে দেয়। ঢোঁড়াই জানে যে গাড়োয়ানের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া পাপ; ঠকাতে হয় সরকারকে ঠকাও, চেরমেন সাহেবকে ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করে।

এই সেদিনও দুটো ছেলে গাড়ির রেস দিচ্ছিল। একজনের ছিল বলদের "শ্যাম্পনি" (৩), আর একজনের খোলা গরুর গাড়ি। তুমুল উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা দুজনে পাল্লা দিচ্ছে, আর শ্যাম্পনির গাড়োয়ানটা হাসতে হাসতে বলছে, "এই ও! যে গাড়ির স্প্রিং নেই সে গাড়ি মাটির উপর দিয়ে চালাও, পাকা রাস্তা থেকে নামো শীগগির"।

"ওরে আমার হাওয়াগাড়িওয়ালারে!"

"জলদি নীচে ভাগো, 'কাচ্চীতে (৪)"।

"—দুটো চাকাতেই যে 'ফুলে কুপো' (৫)। চারটে চাকা থাকলে না জানি কি করতিস। একখান হাওয়া গাড়ি আসুক না পিছন থেকে; অমনি "সটকৃদম" হয়ে যাবে। গুড় গুড় করে নেমে আসতে হবে এই 'নালায়েক'এর (৬) পাশে।

ঢোঁড়াই তাদের দুজনকেই রাস্তার কাঁচা অংশটিতে নেমে আসতে বলে।

—"তুই কোন ডিস্টিবোডের নাতি যে আমাদের মানা করতে এসেছিস? প্রত্যেক বছর আমরা বলে জিরানিয়া বাজারে ফসল নিয়ে আসি বেচতে। তোদের সর্দারকে পয়সা দিয়ে এই আসছি, এখান থেকে কোশভরও হবে না; আর তুই কোন "ক্ষেতের মুলো" (৭) লাল চোখ দেখাতে এসেছিস আমাদের উপর।"

ঢোঁড়াই তাদের বুঝোয়—আরে কথাটাই শোন আমার। খানিক আগেই রোডসরকার আছে; তালে মহলদারের নাম শুনেছিস। রোডসরকার

আর সর্দারের মধ্যে সাট আছে। একজন 'পয়সা নিয়ে যেতে বলে দেয় "পাক্কী"র উপর দিয়ে; আর একজন খানিক আগেই আবার ধরে পয়সা নেওয়ার জন্যে।"

"তাই নাকি"!

দু জোড়া সশঙ্ক চোখ আরও বিস্ফারিত হয়ে ওঠে "সত্যি?"

"তোমার নাম কি ভাই?" "আর তোমাদের?" "ধূসর? সোনৈলী থানায়?" প্রশ্ন জমে ওঠে। খয়নি বেরোয়। সেখানে রাজভারভাঙ্গার তহশীল কাছারি আছে, প্রকাণ্ড গাঁ......গুরুজীর ইস্কুল আছে।

এদের গাড়ি চলে যায়। আবাব অন্য গাড়ি এসে পড়ে ক্যাঁচর ক্যাঁচব শব্দ করতে করতে, বলদের গলার ঘণ্টা বাজিয়ে, উড়ন্ত ধূলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে।

ঢোঁড়াই গান বন্ধ করে আবার তাদের সঙ্গে কথা বলে। কত গাঁয়ের কত আজব আজব খবর শোনে। কোথা থেকে কোথায় চলে গিয়েছে রাস্তা। এ রাস্তার আরম্ভ কোথায়, আর শেষ কোথায় সে জানে না। কেউ জানে না বোধ হয়। কোন গাড়ি আসছে ভুট্টা নিয়ে, কেউ গাড়িতে আসছে কাছারিতে মোকদ্দমা করতে, কেউ আসছে রুগী দেখাতে। দেশের বিরাটত্বের একটা আবছা ছায়া পড়ে তার মনের উপর; তার রাস্তা তোয়ের করার সঙ্গে এত লোকের এত গাড়ির আসা যাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে মোটামুটিভাবে এ জিনিসটা সে বোঝে। "পাক্কী"তে কাজ না করলে এ জিনিস বোঝা যায় না।

কিন্তু এসব কথা মনে হতে পারে ন'মাসে ছ'মাসে, এক আধ মুহূর্তের জন্য। এ সবের সময় কোথায়! তার গ্যাংএর কেউ কেউ গাড়িতে মেয়েছেলে দেখে হয়ত ততক্ষণ রাজকন্যা সুরঙ্গা আর রাজপুত্র সদাবৃচের প্রেমের গান আরম্ভ করেছে। কেউবা হেসে ঢলে পড়ে, এ ওর গায়ে; খোয়ার টুকরো ছুঁড়ে মারবার ভান করে। ঢোঁড়াই সব বোঝে, দেখে মুচকে মুচকে হাসে। একটা রহস্যের কুয়াশায় ঘেরা এই মেয়ে জাতটা, তার জানতে ইচ্ছা করে, বুঝতে ইচ্ছা করে। সে মুখে একটা নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়ে তার কৌতূহল চাপা দিতে চায়। আর মেয়েদের কথা ভাবতে গেলেই কোথা থেকে কখন যে এসে পড়ে বজ্জাতের

গোড়া ঐ ঢুখিয়ার মা'টার কথা সে বুঝতেই পারে না। ঢুখিয়ার মা তার কোন অনিষ্ট করেনি একথা ঠিক; কিন্তু তার উপর যে কোথাও অবিচার করা হয়েছে এ কথা বুঝবার মত বুদ্ধি তার হয়েছে। আর মহতো গিন্নী, কিছুদিন থেকে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে খুব আলাপ জমাবার চেষ্টা করছেন; তিনি ঢোঁড়াইয়ের ছোট বেলার গল্প, বেশ রং চং দিয়ে, তাকে শুনিয়েছেন কয়েকদিন। বাপ মরা ছেলেটাকে গোঁসাইথানে ফেলে দিয়ে, মা গিয়েছিল গট্‌গটিয়ে "সাগাই" করতে। তাই এতদিন পরে মহতোগিন্নীর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠেছে ঢোঁড়াইয়ের জন্য। পাকা কাঁঠালের ভিতরের বোঁটা দিয়ে তরকারি রেঁধে তিনি ঢোঁড়াইকে আদর করে খাওয়ান, আর ঐ সব পুরোনো গল্প করেন। তাঁর হাতে-খড়ম-পরা পঙ্গু মেয়ে ফুলঝরিয়া দূরে বসে বসে সব শোনে।

ঢুখিয়ার মা না হয় বদ; সে না হয় ঢোঁড়াইকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু মহতো নায়েবরা সে সময় কি করছিল? তাৎমা জাতটা কি করছিল? বাওয়া ছাড়া আর কেউ তার কথা ভাবেনি কেন? সকলের বিরুদ্ধেই তার অনেক কিছু বলার আছে। আর রামজী 'বজরংবলী মহাবীরজী' (৮), তাঁরা কি তখন ঘুমিয়ে ছিলেন? এদের উপরও অভিমান ঘনিয়ে ওঠে তার মনে।

টীকা :—

(১) কোশী শিলিগুড়ি রোডে।

(২) বরখাস্ত

(৩) দুই চাকার এক প্রকার গাড়ী। এই গাড়ীগুলিতে সাধারণত লোহার স্প্রিং লাগানো থাকে।

(৪) কাঁচা রাস্তার

(৫) "আঙুল ফুলে কলাগাছ"-এর স্থানীয় ভাষার ইডিয়ম।

(৬) অযোগ্য

(৭) ক্ষেতের মুলো—সামান্য লোক। "মশা বলেন কত জল" এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(৮) বজ্রঙ্গী—বীর হনুমানের একটি নাম। বজ্রের মত শক্তি যার।

সামুয়র সন্দর্শনে

রাস্তার কাজ করার সময়, ঢোঁড়াইয়ের রাজ্যের কথা মনে আসে। শনিচরারা মধ্যে মধ্যে বলে, কি রে ঢোঁড়াই স্বপ্ন দেখছিস নাকি? তোর গোঁফের রেখা দেখা দিচ্ছে; এবার একটা সাদী করে ফেল।

"ধেৎ!"

"ধেৎ আবার কি। তবে মেয়ের বাপকে দেবার টাকার জোগাড় করাই শক্ত। কিরিস্তান হতিস, তো সামুয়রের মত সাহেবের টাকা পেতিস।"

পাদরী সাহেব সামুয়রকে মর্লি সাহেবের বাগানের মালীর কাজে বাহাল করিয়ে দিয়েছিলেন। পুরানো নীলকর পরিবারের সব সাহেবই চলে যাচ্ছে একে একে জিরানিয়া থেকে। মর্লি সাহেবও কয়েক বছর থেকে যাব যাব করছে। জমি জিরেৎ বেচতে আরম্ভ করে দিয়েছে অনেকদিন থেকেই। জমিব দাম নাকি শীগ্‌গিরই কমতে পারে এইজন্য এই বছরটায় সম্পত্তি বিক্রির হিড়িক পড়ে গিয়েছে সাহেবদের মধ্যে। মর্লি সাহেব, তাঁর চাকর-বাকর, ডাক্তার, উকিল, আত্মীয় অনাত্মীয় অনেককেই যাওয়ার আগে কিছু কিছু টাকা দিয়ে যাবেন, এ খবর এই অঞ্চলের সকলেই জানে। অনেকের টাকা শোনা যায় পাদরী সাহেবের কাছে জমাও করে রেখে দিয়েছেন! এখন বিসারিয়া কুঠির সম্পত্তিটা সুবিধামত দামে বিক্রি করে দিতে পারলেই মর্লি সাহেব চলে যেতে পারেন জিরানিয়া ছেড়ে। শনিচরা এই মর্লি সাহেবের টাকার কথাই বলছিল।

সামুয়রও এখন জোয়ান হয়ে উঠেছে। খাঁদা খাঁদা মুখটা, কিন্তু সাহেবের মত টকটকে চেহারা হয়েছে তার। কুঠির সাইকেলে চড়ে ঢোঁড়াইয়ের সম্মুখ দিয়ে, ডাকঘর থেকে সাহেবেব ডাক নিয়ে আসে প্রত্যহ। আর শিস দিতে দিতে রোজ সন্ধ্যার সময় তাড়ি খেতে যায়।

"ঐ ছাখ সামুয়র আসছে। ওর গোঁফ উঠছে দেখেছিস ভুট্টার চুলের মত।"

ঢোঁড়াই হেসে ফেলে। সত্যিই সাইকেলে সামুয়র আসছে। মাথায় একখান রুমাল বাঁধা।

"রুমাল বেঁধেছে ছাখ না—ঠিক ছুরিতালাবেচা ইরাণী মেয়েদের মত। নিশ্চয়ই ডাকঘর থেকে আসছে।"

"মোচের রেখাটা কামিয়ে নে সামুয়র" সকলে হেসে ওঠে। সামুয়র সাইকেল থেকে নেমে পড়ে। এরা এক ডাকে সামুয়রকে আসমান থেকে জমিতে এনে ফেলেছে ; কত কথা সে সাইকেলে ভাবতে ভাবতে আসছিল।......

নূতন আয়াটি দেখতে শুনতে বেশ। আলিজান বাবুর্চির সঙ্গেও তার আশনাই আছে, আবার সামুয়রের সঙ্গেও। গত বছর সাল শেষ হওয়ার রাতে গির্জার হলঘরের পাশের ছোট ঘরে,—যে ঘরটায় মতির মার্বেলে মেমসাহেবরা নিজের নিজের তকদীর দেখছিল (১) —সেই ঘরটায়—অর্ধেক রাত হবে তখন,—বাইরে পোষের শীত, বরফের মত ঠাণ্ডা—কিন্তু ঘরটার ভিতর কি গরম !—আয়ার গাউনটায় কি সুন্দর গন্ধ, মেমসাহেবের শিশি থেকে চুরি করা খোশবায় ; অটো দিলবাহারের চাইতেও ভাল গন্ধ, তার সঙ্গে মিশেছে সিগারেট আর পিঁয়াজের গন্ধভরা, আয়াটার নিশ্বাস,—সে দিনের নেশার ঘোরে সবই মধুর লেগেছিল। বাবুর্চিটা এক নম্বরের ঘুঘু—বাড়ীতে তার দু দুটো বিবি।.........

এদের ডাকে সামুয়র বিরক্ত হয়েই সাইকেল থেকে নামল। ভাল লাগে না এগুলোর সঙ্গে কথা বলতে। সবে সে সিগারেটটা ধরিয়েছে। ভাগ্যে সে কিরিস্তান, না হলে এ লোকগুলো তার মুখ থেকে সিগারেট কেড়ে নিয়েই টান মারতো। রাজার জাত হয়ে লাভ আছে। সেই জন্যই না আলিজান বাবুর্চি মাংসটা আসটা খাওয়ায় ; সাহেব তাকে টাকা দিয়ে যাবে বলে ; আয়াটার সঙ্গে আলাপ জমাবার সুবিধে হয়।

ঢোঁড়াই ঠাট্টা করে বলে, "সামুয়র, তোর সায়েব শুনছি যাবে না ?"

সামুয়র বলে, "ও না গেলেও আমার ভাল, আবার গেলেও ভাল। না গেলে এ আরামের কাজটাতো থাকবে। আর গেলে তো কথাই নেই—টাকা পাওয়া যাবে"। কথায় কেউ হারাতে পারবে না সামুয়রকে। দু একটা আলগা আলগা কথা বলবার পর, সে চিঠি আর খবরের কাগজের তাড়া হাতে নিয়ে আবার সাইকেলে চড়ে।

"দেরী হলে সাহেব চটবে। কিছুদিন থেকে দেখছি সাহেবের মেজাজটা যেন ভাদ্রের কুকুরের মত হয়ে রয়েছে।"

"তোরই তো মনিব; আবার কেমন হবে?"

সামুয়র সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের উপর ঝুঁকে পড়ে জোরে জোরে পা চালায়, এই গেঁয়োগুলোকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য।

"আরো জোরে চালা। আগের গরুর গাড়ীতে লাল শাড়ী দেখেছে, ওকি আর আস্তে চালাতে পারে।"

বিরষা বলে—"বিলকুল লাখেড়া" (২) হয়ে গিয়েছে। আমি দেখেছি কিরিস্তান হলেই এমনি হয়। সব বুদ্ধি ছোটবেলাতেই খরচ হয়ে যায়।"

টীকা:—

(১) **Crystal gazing.** ঐ ঘরে স্ফটিকের একটি গোলাকার পাত্রে খৃষ্টানদের পবিত্র জল রাখা থাকে।

(২) একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গিয়েছে।

ফুলঝরিয়ার খেদ ও শাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা

ঢোঁড়াইকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াচ্ছে মহতোগিন্নী। তার আজকাল খাতিব কত।

বাবুলাল নাকি মহতোগিন্নীর কাছে বলেছে, যে চেরমেন সাহেব সফরে যাওয়ার সময় হাওয়া গাড়ী থামিয়ে রাস্তায় ঢোঁড়াইকে জেরা করেছেন। ঢোঁড়াই জেরার খুব ভাল জবাব দিয়েছে। বাবুলাল সঙ্গে ছিল সেই হাওয়া গাড়ীতে। সেই কথাই মহতোগিন্নী শোনাচ্ছিলেন ঢোঁড়াইকে। ঢোঁড়াইয়েরও এ-প্রসঙ্গে উৎসাহ কম নয়। মহতোগিন্নীর সম্মুখে তার ছিল একটা সঙ্কোচের ভাব। কিছুক্ষণের জন্য ঢোঁড়াই এ ভাব ভুলে যায়। তাকে ধাঙড় পাওনি যে চেরমেন সাহেব জেরায় হারিয়ে দেবে! এতদিন তাহলে জাতের 'বুজুর্গ'দের (১) কাছ থেকে সেকি কেবল "পাটকাঠি ভাঙতে" শিখেছে। দলের মধ্যে বয়স কম দেখে, তাকেই জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। এমন 'মুহ্‌তোড়' (২) জবাব দিয়েছে যে বাছাধনের চিরকাল মনে থাকবে।...আনন্দে গুদরের মার কাতলা মাছের মত মুখ থেকে কাল দাঁত দুপাটি প্রায় বেরিয়ে আসে। হঠাৎ তাঁর ঢোঁড়াইকে ভুন

দেওয়ার কথা মনে পড়ে। ঢোঁড়াইয়ের পাতার পাশেই মাটির খুরিতে নুন রাখা হয়েছে।

"ওরে ফুলঝরিয়া ঢোঁড়াইকে একটু নুন দিয়ে যা।" ফুলঝরিয়া তাঁর মেয়ে। তার পায়ের দিকটা খুব সরু। হাতে খড়ম পরে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সে চলাফেরা করে।

থাক, থাক; আমি নিজেই নিচ্ছি—বলে ঢোঁড়াই খুরিটা থেকে নুন নেয়।

"নিজে নেবে কেন। কি যে বলে আমার 'বাচ্চা' তার ঠিক নেই! ফুলঝরিয়া কি আর এখন সেই ছোট আছে"। এই কথা বলে মহতোগিন্নী নিজের মেয়ের বয়স সম্বন্ধে মেয়ের সম্মুখেই এমন একটি নির্লজ্জ ইঙ্গিত করে যে ফুলঝরিয়া ও ঢোঁড়াই দুজনই লজ্জা পায়। খট্ খট্ করে উঠনে খড়মের শব্দ হয়। দূরে চলে যাচ্ছে শব্দটা—ফুলঝরিয়া বোধ হয় বাইরে গেল। তার শরীরের উপরের দিকটা অস্বাভাবিক রকমের পুষ্ট।

"ওরে ফুলঝরিয়া! কোথায় গেলি আবার। লজ্জা হয়েছে বুঝি। কোথা দিয়ে যে পরমাৎমা কি করেন, কি রকম যোগাযোগ ঘটান, বোঝা শক্ত। কাকে চালের খাপরা উল্টে দেয়, আর তার থেকে চলে ঘরামির রোজগার। তবে সব জিনিসের সময় আছে। তার খেলাপ হওয়ার জো নেই। জিয়লের ডাল বর্ষাকালে লাগাও, পচে যাবে; আর চোৎবোশেখে পোঁতো শুখনো ধূলোর মধ্যে তাও লেগে যাবে।" "এ একটা কথার মত কথা বলেছ গুদরীমাই"। হঠাৎ মহতোর গলা শুনে ঢোঁড়াই চমকে ওঠে,—ও তাহলে উঠনেই আছে। এতক্ষণ সাড়া দেয়নি। মহতোই নিশ্চয়ই তাহ'লে গুদরের মাকে দিয়ে এই সব করাচ্ছে। গুদরীমাই ডাকসাইটে মেয়েমানুষ ঠিক, কিন্তু এত খাওয়ানো-দাওয়ানো, এত সব, এ মহতোর মত মাথাওয়ালা লোক পিছনে না থাকলে, একা গুদরীমাইয়ের দ্বারা সম্ভব হত না। বাবুলালও হয়ত আছে এর ভিতর। হয়ত কেন নিশ্চয়ই। সেই জন্যই না চেরমেন সাহেবের জেরা করার গল্প করেছে। দুখিয়ার মাটাও থাকতে পারে এর মধ্যে। তিনিও থাকেন সর্বঘটে। "এ শিউজীর মাথায় খানিক জল ঢালা, ও শিউজীর মাথায় খানিক জল ঢালা, দুনিয়ার শিউজীর মাথায় জল ঢালা" তার চাই-ই চাই (৩)।

ঢোঁড়াই অনেক দিন আগেই মহতোগিন্নীর এত আদর-যত্নের উদ্দেশ্য বুঝেছে। সে ধরাছোঁয়া দিতে চায় না।

"আর চারটি ভাত নেবে না? ওকি ছাই খাওয়া হ'ল? এই জোয়ান বয়সে ঐ চারটি ভাতে কি হবে? এই ফুলঝরিয়া আমলকির আচার দিয়ে যা। ও মেয়ের আবার বুঝি লজ্জা হয়েছে। সর্ষে দিয়ে নিজে হাতে আচার করেছে আমার মেয়ে। কোথায় গিয়ে সে মেয়ে বসে থাকলো এখন কে জানে। নিজে আচার তৈরী করে, নিজেই দিতে ভুলে গেল। কি যে আমার কপালে ভগবান লিখেছেন কে জানে। গুদরের বাপ আবার সেদিন বলছিল যে সরকার নতুন কানুন করছে—মেয়েব বিয়ে, তিন ছেলের মা হওয়ার বয়স না হওয়া পর্যন্ত, হতে দেবে না। দিলেই কালাপানির সাজা। ঘোর কলি! এও চোখে দেখতে হ'ল, কানে শুনতে হ'ল। রতিয়া, রবিয়া, বাসুয়া সবাই কোলের মেয়েব পর্যন্ত বিয়ের ঠিক করে ফেলেছে। ডগরাহা থেকে আমার ভাই সেদিন এসেছিল, সে বলল যে সেখানে একজন মুসলমানেব বাড়ী একটা বিবে হয়েছে, বরকনে দুজনেই এখনও পেটে।

মহতো উঠন থেকেই ঠাট্টা করে, তোমার ভাইয়ের তো কথা।

আমার ভাই কি মিছে কথা বলেছে। সকলকে নিজেদের মত মনে ক'র না।

আচ্ছা, আচ্ছা তোমার ভাই এত সত্যিবাদী যে মুখ দিয়ে যে কথা বার কবে, তা ফলে যায়। এখন ঐ পেটের দুটোই যদি মেয়ে হয়, কি দুটোই যদি ছেলে হয় তাহলে? তোমাদের গাঁয়ে ও রকম বিয়েও চলে নাকি?

মহতোগিন্নী ভাইয়ের কথা সরল মনে বিশ্বাস করেছিল। সে অপ্রস্তুত হয়ে বলে "আচ্ছা ও কথা যেতে দাও, রবিয়া আর বাসুয়া কোলের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে কিনা? এখন আমার বরাতে কি আছে জানি না। আমরা তো ধাঙ্গড় না যে সোমত্ত মেয়ে ঘরে রাখবো; আর যেসব গরীবগুলোর টাকার অভাবে কনে জোটে না, সেগুলো বদ নজর দেবে তার উপর।......

ঢোঁড়াই উঠে পড়ে। মহতো নিজে তার হাতে জল ঢেলে দেয়। (৪)

ফুলঝরিয়া! ও ফুলঝরিয়া সকড়ি কি তুলতে হবে না?

ফুলঝরিয়া তখন বাড়ীর পিছনের কলার ঝাড়ের পাশে বসে আকাশপাতাল ভাবছে।…কি পাপই না সে আগের জন্মে করেছিল। তারই উপর গোঁসাইয়ের যত আক্রোশ। কোন পাপ সে করেছিল জানে না।' তবে কেন সে হাতে খড়ম প'রে থাকবে? কেন অন্য দশজনের মত সে চলতে ফিরতে পারে না? তাৎমাটুলির অন্য মেয়েরা বলে যে সে রূপের গরবে গত জন্মে 'শিউজী'কে (৫) লাথি মেরেছিল; তার বাবা বলে যে সে মরদকে দিয়ে নিশ্চয়ই পা টিপিয়েছিল আগের জন্মে। ছি ছি ছি, ছি ছি! কেন তার দুর্মতি হয়েছিল। মরদে টিপবে ঝোটাহার পা! শিউজীর মাথায় সে মারতে গিয়েছিল লাথি! উপযুক্ত শাস্তিই তার হয়েছে। রেবণ গুণী কিন্তু বলে অন্য কথা। সে বলে যে ঠিক যেখানটায় সে জন্মায় সেই জায়গাটায় মাটির নীচে নিশ্চয়ই কাল বিড়ালের হাড় আছে। জন্মানোর ছ'দিনের মধ্যে কাঁকড়াবিছে ভাজা সরষের তেল, ঐ পায়ে মালিশ করতে পারলে, তবে ঐ বিড়ালের হাড়ের দোষ কাটাতে পারতো। তা সে সময় তো আর মা বাবা রেবণগুণীকে দেখায়নি। দেখায় ছ'মাস পরে। তখন আর দেখিয়ে কি হবে। তার বাবাকে ভাগপববাহার বৈদজী (৬) বলেছিল যে এখনও যদি সদ্য মরা ভুঁড়ো শিয়ালের পেট চিরে, তার গরম গরম নাড়িভুঁড়ির মধ্যে পা ঢুকিয়ে বসতে পারা যায়, তাহ'লে অনেকটা উপকার পাওয়া যেতে পারে। তা ফুলঝরিয়ার বাবা আজ পর্যন্ত একটাও শিয়াল ধরার ব্যবস্থা করতে পারলো না। এতদিন ফুলঝরিয়ার মনে আশা ছিল যে পঙ্গু হলেও তার বিয়ে হয়েই যাবে। কেননা কে না জানে যে তাৎমাদের বিয়েতে মেয়ের বাপ টাকা পায়; আর এই টাকার জন্য কত গরীব তাৎমা বিয়ে করতে পারে না, বহুদিন পর্যন্ত। তার বাবা টাকা যদি না চায়, তা'হলেই দুটো রাঁধা ভাত পাওয়ার লোভে, কত মরদ তাকে বিয়ে করতে রাজী হবে। কিন্তু এ কি "সরাধ"এর কানুনের (৭) কথা শোনা যাচ্ছে কিছুদিন থেকে। মেয়ের বাপ হয়েও খোসামোদ করতে হবে ছেলের বাপকে? ছোট ছোট মেয়ের বাপরা তাৎমা হয়েও বরের বাপের দুয়োরে ধন্না দিচ্ছে। ঘেন্নার কথা,—টাকা পর্যন্ত দিতে তৈরী মেয়ের বাপ; টাকা! বুচকুনিয়ার বাপতো তিন বছরের বুচকুনিয়াটার বিয়ের জন্যে অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে কর্জই করে ফেললো! তাকে দোষই বা দেওয়া যায় কি

করে। সে বেচারা কালাপানি থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছেলের বাপকে টাকা দিয়েছে। এখন এই "হাওয়াম" কে আর ফুলঝরিয়াকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। এই 'সরাধ'এর কানুন সত্যিই তারই 'সরাধ'এর (শ্রাদ্ধর) জন্য হয়েছে। আজ যে রোগা, কাল সে মোটা হতে পারে; আজকের ছোট, কাল বড় হতে পারে; কিন্তু হাতে খড়ম পরা মেয়ে কোনদিনই পায়ে চলতে পারবে না—হাজার শিয়ালের পেটে পা ঢুকিয়ে বসে থাকো। এখনও কি তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? না হলে সরকার আবার তাকে শাস্তি দেবার জন্য এ 'সরাধ'এর কানুন করছে কেন। সরকার, তুমিওতো ভগবান। তোমারই দয়ায় রেল গাড়ী, হাওয়া গাড়ী চলে। মহাবীরজীর মত তোমার তাকৎ; চেবমেন সাহেব তোমার 'খাব্বাস' (৮)। অত ক্ষমতা যার, তার ফুলঝরিয়ার মত সামান্য লোকের উপর রাগ কেন?

তার চোখে জল আসে ....

"এ গে ফুলঝরিয়া! চেঁচিয়ে যে আমার গলা ফাটলো কথা কি কানেই যায় না। বিয়ের কথাতেই মাচার উপর পা উঠলো নাকি?"

পা তুলবার ক্ষমতাও যদি তার থাকতো,—ফুলঝরিয়ার দু চোখ ফেটে জল এসে গিয়েছে। মাকে দেখে সে চোখ মুছে নেয়। দেখে ফেললো নাকি মা?

"এত মাকড়সার জাল এই কলা গাছের দিকে, দেখা যায় না অথচ চোখেমুখে লেগে যায়। আজ সকালেও ছিল না। মাকড়সার জাল নাকে লাগলে বড় নাক চুলকোয়, না মা?"

টীকা:—

(১) বড়দের, গুরুজনদের।

(২) মুহতোড়—মুখ ভাঙ্গা, কড়া আর উপযুক্ত উত্তর।

(৩) স্থানীয় ভাষায় ইহার অর্থ—সর্বঘটে বিরাজমান থাকা। আবশ্যক অনাবশ্যক সব কাজেই হাত দেওয়া এবং কোন কাজই ঠিক করিয়া না করা।

(৪) আঁচানোর জল ঘটি হইতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নিজে ঢালিয়া লওয়া, বাড়ির লোককে অপমান করা বলিয়া গণ্য হয়।

(৫) মহাদেব; শিবলিঙ্গ।

(৬) বৈদজী—হাতুড়ে ডাক্তার।

(৭) 'সর্দা' আইনের বিকৃত উচ্চারণ। "সরাধ" কথাটির শব্দগত অর্থ শ্রাদ্ধ।

(৮) খাব্বাস—চাকর।

রামিয়া কাণ্ড

তাৎমানীদের 'ধানকাটনী'র রাজ্যে যাত্রা

কার্তিক অঘ্রান মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার কিছু অনিশ্চিত হয়ে আসে। ঘরামীর কাজ কমে যায় অথচ কুয়ো পরিষ্কার করার কাজ তখনও আরম্ভ হয় না। বোধ হয় সেই জন্যই তাৎমা মেয়েরা অঘ্রানে যায় ধান কাটতে। তারা ফিরে আসে পৌষের শেষাশেষি। পূবেই যায় বেশী, - মায়সী, জামৌর, রূপৌলী থানাতে। ওদিকে রোজগার বেশী, 'বাঙ্গাল মুলুকের' কাছে কিনা, সেই জন্য; কিন্তু রোজগার বেশী হলে কি হয়, "পানি বড্ডা লরম আওর বড্ডা বুখার" (১)। তার উপর ওদিকে 'মিয়া' বেশী (২)। সব সময় 'জাতপাঁত' বাঁচিয়ে চলাও শক্ত, ঐ 'পাট আর পানির' দেশে। তাই অধিকাংশ বছরেই তাৎমা মেয়েরা যায় পচ্ছিমের কমলদাহা, বড়হড়ী, ধোকড়ধারা, এই সব থানায়। এসব জায়গার জল ভাল "আধাসের সাত্তু (ছাতু) হজম করতে আধা ঘণ্টা।" বড় ক্ষিদে পায়, এই যা মুস্কিল। কিন্তু গেরস্তরা ভাল লোক। যে মজুরণী কম খায় তাকে তারা কাজে নিতে চায় না;—বলে যত 'পুরুবের বিমারী সিমারী লোগ' (৩); এরা হজম করতেই পারে না, তার কাজ করবে কি? তবে মজুরের চাহিদা পশ্চিমে কম; তাই গঙ্গাজী, কোশীজী পার হয়ে, মুঙ্গের আর ভাগলপুরে জেলার, হাজারে হাজারে মজুর মজুরণী এদিকে আসে "ধানকাটনী"র সময়। তাদের মত পরিশ্রম করতে তাৎমানীরা পারে না।

এই ধান কাটার সময়, মহতোর পরিবারের মেয়েরা আর দুখিয়ার মা ছাড়া, তাৎমাটুলিতে আর কোন তাৎমা মেয়েই থাকে না। সেই জন্য অঘ্রাণ পৌষ মাসে বাড়ীর সব কাজই তাৎমা পুরুষরা নিজে হাতে করে। এই সময় পাড়ায় নেশা ভাঙের মাত্রা বেড়ে যায়। 'ধানকাটনী'র দল দেড় মাস পরে ফিরে এলে প্রতি বারই পুরুষদের এই সময়ের কৃতকর্মের ফিরিস্তি, মহতোগিন্নী, পাড়ার

মেয়েদের শুনিয়ে দেন। 'ঝোটাহারা' তখন নতুন আনা ধানের মালিক ; ধরাকে সরা জ্ঞান করে। প্রতি সংসারে ঝগড়া-বিবাদ বেশ জমে ওঠে। বাড়ীর কর্তাই নীচু হয়ে, এই দুমাস 'ঝোধাহা'দের খোসামোদ করে। তাই তাৎমাটুলির মেয়েরা বলে—"কখনও নৌকোর উপর গাড়ী, কখনও বা গাড়ীর উপর নৌকো। দশ মাস পুরুষ রাজা, তো দুমাস মেয়েরাও রাজা"।

তাৎমাদের বছরখানেক থেকে দিন বড় খারাপ যাচ্ছে। কাজ পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। চার আনাতো মজুরী ; তাই দিতেই আবার বাবুভাইয়াদের দ্বিধা কত! চাল, শুনতেই চার পয়সা সের ; কিন্তু সওদা জিনিসেরও দামতো দিতে হবে। ঐ চারটে পয়সাই আসে কোথা থেকে, সে খবর কি বাবুভাইয়ারা রাখে। খেতে গেলে পরনের কাপড় নেই, পরনের কাপড কিনতে গেলে উপোস করে থাকতে হয়। পাক্কীতে কাজ করার সময় ঢোঁড়াইরা প্রত্যহ দেখে যে, পাট বোঝাই করা গরুর গাড়ীর সার ফিরে চলেছে ; জিরানিয়া বাজারের গোলাদাররা আর কিনতে চায় না। তাৎমাটুলিতে সাঁঝের পর বাবুভাইয়া আর বাজারের লোকদের আনাগোনা বেড়ে যায়। ধাঙড়রা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, যে এবার দেখছি 'গোসাই থানে' বেলফুলের মালা বিক্রি হবে। 'ঝোটাহা'দের ঝুঁটিতে তেল পড়ছে দেখিস না ?

'পচ্ছিমের' ভর্সড় লোয়ার প্রাইমারী স্কুলের 'গুরুজী' থাকে গ্রামের বাবুদের বাড়ী। সেখানেই বাবুদের ছেলে পড়ায়, খায়দায়, মোসাহেবি করে, ফাইফরমাশ খাটে, মোকদ্দমার তদ্বির করে, চিঠি লিখে দেয়। সে এসেছিল জিরানিয়ার চেরমেন সাহেবের কাছে, ভর্সড়ের বাবুকে সঙ্গে নিয়ে ; তার বদলির হুকুম রদ করাতে। বাবু চেরমেন সাহেবের পুরোনো মক্কেল। চেরমেন সাহেব জিরানিয়ায় ছিলেন না। বাবুলাল চাপরাসী তাদের নিয়ে যায় কেরাণীবাবুর বাড়ী। ঘিয়ের ভাঁড়, আর কলার কাঁদি উঠনে রেখে সে কেরানী সাহেবকে ডাকে। এক মিনিটের মধ্যে গুরুজীর কাজ হয়ে যায়। এর জন্য আবার রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, এই 'দেহাতী' দুটো, বাবুলাল মনে মনে হেসেই বাঁচে না। ভর্সড়ের বাবুসাহেব বাবুলালের হাতেও একটা টাকা দেন। বাবুলাল বলে, মোটে এক টাকা ?

ধান ঘরে আসুক। বিক্রি করে তারপর টাকা দেব। এখন টাকা কোথায়, গেরস্তর কাছে?

বাবুলাল এসব শুনতে অভ্যস্ত; কাজ হওয়ার পর আবার কেউ টাকা দেয়?

"আচ্ছা 'ধানকাটনী'র লোক তোমরা নেঁও কোথা থেকে?"

"এবার আবার লোকের অভাব? কবে থেকে লোকরা ঘোরাঘুরি করছে।"

"আমার টোলার লোক নাও না।"

গুরুজী 'চেরমেন সাহেবের' চাপরাসীকে চটাতে রাজী নন—ভবিষ্যতে আবার এ শয়তানটার দরকার হতে পারে।

"তা, দিও, জন চল্লিশেক।"

তাৎমাটুলির বর্ধিষ্ণু লোক বাবুলাল। উর্দি পাগড়ি পরবার অধিকার পেয়েছে সে ভগবানের কৃপায়। সে নিজের জাতের জন্য এটুকুও করবে না? আজকের এই অভাব অনটনের দিনে, এ একরকম রামজীর ছাপ্পর ভেঙে দান বলতে হবে! কার্তিক মাস শেষ হতে চললো—এখন পর্যন্ত তাৎমাটুলিতে ধানকাটনীর জন্য কোন জায়গা থেকে ডাক আসে নি। এবার গেরস্তরা খেতেব ধান খেতেই রাখবে নাকি? এই হতাশার মধ্যে ভর্সডের খবরে, পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়। ধন্যি ধন্যি করে সকলে বাবুলালের;—ঠেকারে দুখিয়ার মার মাটিতে পা পড়ে না। তার দেমাক আরও বেড়ে যায়, যখন সে দেখে, যে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে এবার মহতোর স্ত্রী আর খোঁড়া মেয়েও 'ধানকাটনী'তে যাচ্ছে।

যাওয়ার সময়, মহতোগিন্নীর মাথার উপরের উদুখলটিতে, দুখিয়ার মা কচুপাতায় মুড়ে খানিকটা তামাক দিয়ে বলে "ভালয় ভালয় সব কটাকে ফিরিয়ে এনো গুদরের মা।"

মরমে মরে যায় মহতোগিন্নী। তবুও জবাব দেয় "হাঁ, সেই জন্যইতো যাচ্ছি, এদের সঙ্গে।"

দূরে থেকে রতিয়া ছড়িদার চেঁচায়—"এসো না সকলে—এখনও মেয়েদের এত কি গপ্প তা বুঝি না।"

যাওয়ার পথে সকলে গোঁসাইথানে প্রণাম করে যায়।

'ধানকাটনী'র সময় একেবারে মেলা বসে গিয়েছে ভর্সড়ের 'চাপ' এর (৪)

ধারে। সিরিপুর,ভর্সড়, সোনদীপ, কেমৈ এই চার গাঁ জুড়ে এক চকে নীচু জমিতে ধানের ক্ষেত। ধান হয়েছেও তেমনি ;—শীষের ভারে শুয়ে পড়েছে গাছগুলো ; কোথাও আল দেখা যায় না। উঁচু জায়গাগুলিতে কাটা ধানের সোনালি পাহাড়। তারই আশেপাশে মানুষ ঢুকতে পারে এইরকম ছোট ছোট খড়ের টোপর খাড়া করা হয়েছে, সারির পর সারি। রাতে যা হিম পড়ে! পোয়ালের পাহাড়ের 'ঘুর' (৫) জ্বালালেও, কিছুতেই আর কান গরম হতে চায় না (৬)।

ভর্সড়ের বাবুদের ধান কাটতে এবার এসেছে দুদল লোক, এক দল মুঙ্গের জেলার তারাপুর থেকে, আর এক দল তাৎমাটুলি থেকে। সব মিলিয়ে প্রায় সত্তর জন লোক,—পুরুষ মাত্র জন দশেক।

ভর্সড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই গান গাইতে গাইতে দোকান গলায় ঝুলিয়ে পানওয়ালা পৌঁছোয়—"টিকিয়া, তামাকু পান।" ধানকাটনীর অস্থায়ী গাঁগুলোয় এরা ঘুরে বেড়ায়, বিড়ি, খয়নি, তামাক, পান, সুপুরী, সাবান, আরও কত জিনিস বেচতে। এ ছাড়া অন্য পেশাও আছে এদের এই ধানকাটনীর মেয়েদের মধ্যে।

পানওয়ালারা গান গেয়ে লোক জমিয়ে তারপর সওদা বেচে। কিন্তু তাৎমারা এই তো সবে এসেছে, ধান কাটা আরম্ভ করবে, তবে না তাই দিয়ে জিনিস কিনবে। এখন সে এসেছে কেবল আলাপ পরিচয় করতে।

"অবকী সমৈয়া খিরজা ধরেনি গে বেটী
নহী উপ্‌জল্‌ ছেই পাটুয়া ধান,
কি রঙ্‌কে করবো বীহা দান
অবকী সমৈয়া খিরজা ধরেনি গে বেটী"

(এবারটা ধৈর্য ধরে থাক মেয়ে। পাট ধান জন্মায় নি কেমন করে বিয়ের খরচ করবো)

তাৎমা মেয়েরা সকলে পানওয়ালাকে ঘিরে বসে। এমন গান যে গাইতে পারে তার সঙ্গে কি আলাপ জমতে দেরী লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই, এই ধানের রাজ্যের সব খবর পানওয়ালা তাদের জানিয়ে দেয়।

—ভর্সড়ের বাসিন্দে ধানকাটনীর লোকেরা নাকি সব চলে গিয়েছে এবার সিরিপুরে কাজ করতে। দু' একটা 'তালার বেগুন' (৭), কেবল ভর্সড়ে আছে

—কখনও এদিক থেকে গড়িয়ে ওদিকে যায় সেগুলো, কখনও ওদিক থেকে গড়িয়ে এদিকে আসে। এবার ধান রোপার সময়, সিরিপুরের বাবুরা প্রত্যেক মজুর মজুরণীকে 'জলপান'এর সঙ্গে হয় লঙ্কা, না হয় পেঁয়াজ দিত! তাই নিয়ে ভর্সড়, কেমৈ, আর সোনদীপের বড় গেরস্থরা মিটিং করে। কত বোঝায় সিরিপুরের বাবুকে, পেঁয়াজ লঙ্কা বন্ধ করবার জন্য—পরের পুরুষের লোকেরা তোমায় দোষ দেবে। গেরস্তরা মরে যাবে এতে, যা চলে আসছে তার বিরুদ্ধে যেওনা, ওদেরতো চেনো না—পেঁয়াজ লঙ্কা দেবার রেওয়াজ হয়ে যাবে। একবার যে গাছে বক বসে সে গাছকে খরচের খাতায় লিখে রেখে দাও (৮)। কিন্তু সিরিপুরের বাবুও 'হিম্মৎওয়ালা' লোক—মরদের কথা অরে হাতীর দাঁত; টস্ থেকে মস্ হবার জো নেই সেখানে (৯)। সেই সিরিপুরের বাবুর লঙ্কা-পিঁয়াজের উদারতার কথা মনে রেখে, কাছাকাছির যত মেয়েছেলে গিয়েছে সেখানে কাজ করতে। আরও কত খবর বিরজু পানওয়ালা শোনায়।

গুদরের মা বলে "তাই বলি! এই জন্যই ভর্সড়ের বাবু বাবুলাল চাপরাসীর কথা রেখেছে। শুনলে তো? আর তাই নিয়ে দুখিয়ার মার ঠেকারে মাটিতে পা পড়ে না।"

সব তাৎমানীরই নীরব সমর্থন আছে এই কথায়। বিরজু পানওয়ালা লোক চেনে। মহতোগিন্নীকে দিয়েই তার কাজ হবে।

টীকা :—

(১) জল বড় খারাপ, আর বড় ম্যালেরিয়া।

(২) মুসলমান বেশী।

(৩) পূর্বের রুগ্ন লোক।

(৪) চাঁপ—দহ

(৫) ঘুর—আগুন পোয়াবার স্থান।

(৬) কানেই এদেশের লোকের ঠাণ্ডা লাগে সবচেয়ে বেশী সেই জন্য শীতকালে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ ঢাকা থাকুক বা না থাকুক, কানটি ঢাকা চাইই।

(৭) হিন্দী প্রতিশব্দ—'ডাগরেকা বৈগন'।

(৮) জিস গাছপর বগুলা বৈঠে, জিস দরবাররমে মৈথিল পৈঠে অর্থাৎ যে গাছে বক বসেছে, আর যে দরবারে মৈথিল ঢুকেছে, তা গেল বলে।

(৯) বিন্দুমাত্র নড়চড় হওয়ার জো নেই।

ধান্য ক্ষেত্রে রামিয়ার দর্শন লাভ

অদ্ভুত এই 'ধানকাটনী'র রাজ্য। নতুন পোয়াল আব পচা পাঁকের গন্ধে ভরা দহের ধার রোজ রাতে কুয়াশায় ঢেকে যায়। আগুনের 'ঘুব'এর ক্ষীণ আলোয়, কারও মুখ চেনবাব উপায় নেই, অথচ কাটাধানেব পাহাড়েব উপব তাদের ছায়া নড়ে। 'সোনাব পাহাড়গুলো-প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো হাতীব মত দেখতে লাগে। ধানখেগো হাঁসগুলোব ডাক হঠাৎ ছোট ছেলেব কান্না বলে ভুল হয়। খড়েব গাদার মধ্যে সর্বাঙ্গ ঢুকিয়ে রাতে ঘুমুতে হয়। জলেব মধ্যে দিয়ে 'পানডুব্বী' ভূত (১) রাতদুপুরে ছপ্ ছপ্ করে চলে বেড়ায়—সেই শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। দহের উপব 'রকস্' ভূত (২) আলো জ্বালিয়ে হাতছানি দেয়—এই এখানে, তো পবেব মুহূর্তে 'হুই ই-ই' সাঁওতালটুলির ধাবে চলে গিয়েছে। 'ঘুর'এব ধাবে গল্প জমে ওঠে। সব তাৎমার অভিজ্ঞতা একই রকম,—বাতে যখন সে মাঠে গিয়েছিল, তখন তাকে একটা মেয়ে ইসাবা করে সঙ্গে যেতে বলে। দেখেই বোঝা গিয়েছে যে মেয়েটা 'শাঁখডেল' (৩)। তাব ডাকে সাড়া না দেওয়ায় সে ঐ পুবেব শিমুল গাছটায় উঠে গেল। সকলের গা ছম্‌ছম্ করে।

একে এই বিচিত্র পবিবেশের আবেদন, তার উপর মহতো নায়েবদের নাগালের বাইরের জায়গা এটা। 'ধানকাটনী'র দল তাই এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

অন্য অন্যবার দলের গিন্নীপনা করত রতিয়া ছড়িদারের স্ত্রী। এবার মহতোগিন্নী এসে পড়ায় পদমর্যাদার দাবিতে তিনিই ধানকাটনীর গাঁয়ে সর্বেসর্বা হয়ে যান। বাইরের লোকের সঙ্গে দলের তরফ থেকে কথাবার্তা চালায় রতিয়া ছড়িদার।

এই এক মাসের শিবিরের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সবই তাৎমাটুলি থেকে ভিন্ন। সামাজিক বাধানিষেধ এখানে শিথিল; 'জাত-পাত'এর বিচার কম; যে বেশী ধান কাটতে পারে, সবাই তাকে হিংসা করে; যে মেয়ের যৌবন আছে তার রোজগারের অভাব নেই; যে পুরুষের বয়স আছে, মেয়েদের কাছে তার কদর আছে; এখানে তার সাতখুন মাপ।

কোন সংস্কারের বালাই থাকলে কি এত লোক থাকতে, ওদরের মার আলাপ হয় মুঙ্গের তারাপুর দলের রামিয়ার মার সঙ্গে। বেশ সুশ্রী চেহারা রামিয়ার; ভাল নাম রামপিয়ারী। তাদের দলের লোকের কাছ থেকে তাৎমাটুলির দল প্রথম কানাঘুষো খবর শোনে রামিয়ার মার সম্বন্ধে। সে ছিল ঝাজীর বাড়ীর 'দাই' (৬)—দাই কথাটার উপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে, মুখে হাসির ইঙ্গিত এনে তারা বলে। নাহলে তাৎমানীরা আবার ঝিগিরি করে নাকি? তার স্বামী ছিল পক্ষাঘাতে পঙ্গু। কয়েক বছর আগে মরেছে। গত বছর ঝাজীও মারা গিয়েছে।

'ধানকাটনী'র পরিবেশে এমন রসালো খবরও মোড়লগিন্নির মনে উল্লাস জাগায় না। তার উপর 'রামিয়ামাই'টাও (৫) এত ভালমানুষ। সব সময় কুণ্ঠিত থাকে—একটু দোষী-দোষী ভাব, অথচ কোন কথা লুকানোর চেষ্টা নেই। মহতোগিন্নীর মায়া হয় তার উপর। অন্য জায়গার সমাজের লোক সে; তার চালচলনের নাড়ীনক্ষত্র দিয়ে তাৎমাটুলির লোকের দরকার কি? তারাপুরের দল থাকে এখান থেকে 'রশি' খানেক দূরে। রামিয়ামাইয়ের উখলিটা থাকে এখানে—তাৎমার দলের মধ্যে। রোজ রাতে উখলিতে ধান ভানতে ভানতে রামিয়ামাই আর মহতোগিন্নীতে কত সুখদুঃখের কথা হয়। দুজনেরই আইবুড়ো মেয়ে নিয়েই হয়েছে যত সমস্যা।

"আমার রামিয়ার পা খোঁড়া না হলে কি হয়; তার বিয়ে নিয়েও মুস্কিলে পড়েছি। তুমি তো বহিন তোমার কপালকে দোষ দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছ, আমার তো সে উপায়ও নেই। আমার কপাল তো আমি নিজেই পুড়িয়েছি।"

'' বলেই রামিয়ামাই বুঝতে পারে যে ফুলঝরিয়ার খোঁড়া পায়ের কথাটা তোলা উচিত হয়নি। দুজনেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আবার গল্প জমে উঠতে কিছুক্ষণ সময় লাগে।

ঐ পোড়ারমুখো পানওয়ালাটা এসে রামিয়ার কথা পেড়েছিল। ভর্সাড়ের বাবু বোধহয় পাঠিয়েছিল তাকে। দিয়েছি তার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে। তারই জবাবে দাঁত বের করে বলে কিনা—সব কেচ্ছাই জানি তোমার, মেয়ের বেলায় এত সতীপনা কেন? হারামজাদা! ধোঁদলের বীচির মত তার দাঁতগুলো ইচ্ছে করে এক থাবড়ায় ভেঙ্গে দি।

মহতোগিন্নীর কাছে বিরজু পানওয়ালার স্বভাব অজ্ঞাত নয়। ঐ দালালটার কাছ থেকে সে প্রায় দু' টাকার জিনিস মাঙনা পেয়েছে। অন্য অন্য বছর এই রোজগারটা করত ছড়িদারের বৌ। ঐ তো রবিয়ার বৌ আর হারিয়ার বৌ চলেছে দহের দিকে, এত রাতে। রামিয়ার মা-টা আবার বুঝতে পারলো নাকি? বোঝে নিশ্চয়ই সব।

খড়ের গাদা থেকে রামিয়া আর ফুলঝরিয়ার হাসির স্বর ভেসে আসে দুই মায়ের কানে; একেবারে হেসে ফেটে পড়ছেন দুই সখীতে। যাক ফুলঝরিয়াও তাহলে হাসতে জানে।

শুনে ফেলেনি তো ওরা আমাদের কথা?

না এতক্ষণ 'উখলি সামাট'এর শব্দে, নিজেরাই নিজেদের কথা প্রায় শুনতে পারছিলাম না, তার ওরা শুনবে।

ফুলঝরিয়ারও বেশ লাগে রামিয়াকে। কি পরিষ্কার ঝরিষ্কার থাকে রামিয়াটা; কাপড়-চোপড় দুখিয়ার মার চাইতেও 'সাফসুৎরা'(৬)। প্রত্যেক সপ্তাহে ওরা বিরজু পানওয়ালার কাছ থেকে আধ কাঠা ধানের কাপড়কাচা সাবান কেনে। ফুলঝরিয়া এর দেখাদেখি সাবান কেনার কথা তুললে, তার মা তাড়া দিয়ে ওঠে। "রামিয়ার কাছ থেকে এই সব কিরিস্তানি শেখা হচ্ছে! তুই কি নাচওয়ালী নাকি যে কাপড় হপ্তায় হপ্তায় পরিষ্কার করতে হবে। কত ধান রোজ ক্ষেতে থেকে খুঁটে তুলিস, সেইটা আগে হিসাব করিস, তারপর সাবান কেনার কথা ভাবিস। একটানা বসে ধানকাটবার তো মুরোদ নেই। কাটবার সময় 'সিপাহী'র (৭) নজর এড়িয়ে, দু-চারটে করে ধানের গোছা তোর জন্যে আমরা ছেড়ে দি, তাই কুড়িয়ে তো চলে তোর পেট, আবার কাপড়ে সাবান দেবার শখ! কেউ ফিরেও তাকাবে না তোর দিকে, যতই কাপড়ে সাবান দিস না কেন......"

ফুলঝরিয়া সকলের কথাতেই তার অঙ্গহীনতার প্রতি ইঙ্গিতের আভাস পায়। তার মা শুদ্ধ তাকে ছেড়ে কথা বলে না। তার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। কিন্তু এই জলকাদা হিম কুয়াশার দেশে, কারও চোখের পাতা ভিজলো কিনা, তা দেখবার সময় নেই তাৎমাদের।

তবু বেশ লাগে তার রামিয়াকে। চোখেমুখে কথা রামিয়াটার। কথা বলবার সময় হেসে ফেটে পড়ে। গান ছড়া সরস গল্প তার জিবের ডগায়। দুনিয়ার কারও তোয়াক্কা রাখে না। একটুও ভয়ডর নেই তার মনে। সব ভাল, তবু ফুলঝরিয়ার মনে হয়, রামিয়ার একটু যেন গায়ে-পড়া গায়ে-পড়া ভাব; ধানকাটনীর গাঁয়ে এ জিনিস চলে, কিন্তু নিজের গাঁয়ে এ জিনিস চলবার নয়। হয়ত বা 'পচ্ছিম'এর গাঁয়ের শিক্ষাদীক্ষাই এই রকম। কত দূরে তারাপুরে তার বাড়ি, মুঙ্গের জেলায়। এত দূরের কোন লোকের সঙ্গে, এর আগে ফুলঝরিয়ার কথা বলবার সুযোগ হয়নি। ওদের দেশের ভাষার টান আবার এমন যে শুনলেই হাসি আসে। কি রসিয়ে যে সে অন্যের নকল করতে পারে। 'মালিকের সিপাহী' রামনেওরা সিং লম্বা জুল্‌ফি 'চুলকোঁতে চুলকোতে কেমন করে চোখ-ইসারা করে, তারই নকল করছিল রামিয়া এখন; একেবারে হাসতে হাসতে 'নাখোদম' (৮) হয়ে যেতে হয়।

সেই হাসির স্বরই গিয়ে পৌঁছেচে মায়েদের কানে।

"ওরে ও রামিয়া, আজ কি আর বাড়ি যেতে হবে না?"

"বাড়িই বটে", বলে রামিয়া বিদ্রূপ করে।

"আজ চাচী, ও এখানে থাকুক না।"

"না না না ফুলঝরিয়া, তা কি হয়?" রামিয়ার মা কারও উপর ভরসা পায় না।

"কাল রাতে আবার এসো"—যাবার সময় মোড়লগিন্নী বলে দেন।

খড়ের গাদার মধ্যে গা ঢুকিয়ে শুয়ে ফুলঝরিয়া আকাশ-পাতাল ভাবে। বড় একা একা লাগে তার, এত লোকের মধ্যেও। ঢোঁড়াইটা কি যে মাটিকাটার কাজ পেয়েছে। ধানকাটনীতে এলে বাবুসাহেবের ইজ্জতে চোট লাগতো। নিজের গোঁতেই গেলেন। যাক্ ভালই হয়েছে না এসে। যা একগুঁয়ে। হয়ত

'শাঁখড়েল' ডাকলেও, তার সঙ্গে সঙ্গে শিমুল গাছের দিকে চলে যেত। ...... এ কিসের শব্দ! কুকুরটুকুর আঁচড়াচ্ছে নাকি খড়ের গাদা! চমকে উঠছে ঢুলশখিয়া। না হারিয়ার বৌ, পা টিপে টিপে এসে খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকেছে। তাই বল!

টীকা :—

(১) জলে ডুবিয়া মরিলে এদেশে 'পানডুব্বী' ভূত হয়। এই ভূতরা সারারাত জলের মধ্যে হুপ্ হুপ্ শব্দ করিয়া হাঁটে।

(২) 'রকস' ভূত—আলেয়া

(৩) শাঁখড়েল—এক শ্রেণীর পেত্নীর নাম। ইহারা পুরুষ দেখিলে ডাকে।

(৪) ঝি।

(৫) রামিয়ার মা।

(৬) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

(৭) জমির মালিকের চাকর।

(৮) প্রাণ বেরিয়ে যায়।

রামিয়ার মাতার দেহান্ত

সেদিন রাতে মহতোগিন্নীকে ঘিরে বসে তাৎমাটুলির দল জটলা করছে। আজ কদিন হল রামিয়ার মা এখান থেকে চলে গিয়েছে দেড় ক্রোশ দূরের কেমৈ গ্রামে, সেখানকার রাজপুতদের 'কামত'এ (১) ধান কাটতে। তা না হলে রাত্তিরে মহতোগিন্নীকে কি আর পাওয়া যেত দলের মধ্যে। যাবার সময় রামিয়ার মা মহতোগিন্নীর হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে গিয়েছিল—এ কটা দিন আর তোমাকে ছেড়ে যেতাম না বহিন; কিন্তু রামনেওয়া সিং আর বিরজুপানওয়ালা জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। এখানে থাকলে মেয়েটাকে আর বাঁচাতে পারবো না। কেমৈএর রাজপুতরা আর যাই হোক্ এদিক দিয়ে লোক ভাল শুনেছি।......

এ কথার পর মহতোগিন্নী আর রামিয়ার মাকে বারণ করতে ভরসা পায়নি। ধানকাটনী শেষ হলে, দুদিন পরে তো ছাড়াছাড়ি হ'তই।

…হাটের দিন দেখা ক'রো বহিন।

তারপর রামিয়ার চিবুকে হাত দিয়ে বলেন, "মন খারাপ হবে আমার ফুলঝরিয়ার।"……

তার পরদিন থেকে মহতোগিন্নী রোজ রাতে তাৎমাটুলির সকলকে নিয়ে আসর জমিয়ে বসেন।

গল্প জমে উঠেছে। কেমৈএর ওদিকে নাকি 'হৈজার বিমারী' (২) আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

"যা দেশ, লোকেরা ভয়টয় পেয়েছিল বোধ হয় রাতে" (৩)। ভয় না পেলে কখনও "হৈজা" হয় ?

সকলে মিলে ঠিক হয় রাতে কেউ ভয় পেতে পাবে না। ভয় পাবো পাবো হলেই সকলকে জাগিয়ে আগুনের ঘুরের ধারে বসতে হবে।

মহতোগিন্নী রামিয়ামাইটার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন—বেচারীর কোথাও গিয়ে স্বস্তি নেই—কেমৈ গেল, সেখানেও আবার অসুখ আরম্ভ হল।

নতুন একটা ঝগড়া ওঠায় এ প্রসঙ্গ তখনকারমত চাপা পড়ে যায়। … একটা মাত্র কুপি জ্বালায়, তাৎমাটুলির দলের লোকেরা। সবাই কুপিটাকে নিয়ে টানাটানি করে, কিন্তু মহতোগিন্নীই ওটাকে দখল করে থাকেন বেশি। এক একদিন এক একজনের তেল কিনবার কথা ধানের বদলে। আজ বিরজু পানওয়ালা তেলের দাম পায়নি। আজ ছিল রবিয়ার বৌয়ের পালা। সে সোজা বলে দিয়েছে যে, কুপিটা থাকবে মহতোগিন্নীর কাছে, আর তেলের দাম দেবে কে ? ওসব ফুটানি মহতোগিন্নী যেন তাৎমাটুলিতে ফিরে গিয়ে ছাঁটে— "বড় বাড় বেড়েছিস রবিয়ার বৌ। কার সঙ্গে কি রকম কথা বলতে হয় জানিস না।"

মহতোগিন্নী বোঝে যে সকলের সহানুভূতি রবিয়ার বৌয়ের দিকেই। কাজেই সে আর কথা বাড়তে দেয় না……আচ্ছা, যেতে দাও না ফিরে তাৎমাটুলিতে, তারপর মজা টের পাওয়াবো। কিছু বলি না সেখানে তাই।……

"আচ্ছা, তেলের দাম আমি দিয়ে দেবো বিজু।"

বিজু পানওয়ালা হাসতে হাসতে চলে যায়।

পরদিন দুপুরে রামিয়া হঠাৎ একা এসে হাজির। তার চোখদুটি ফোলা ফোলা। আজ আর এসে হেসে ফেটে পড়লো না।

কি রে রামিয়া একা যে? তোর মার খবর কি?

রামিয়া হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। তার মার 'হৈজা' হয়েছিল, রাতে মরে গিয়েছে। কেমৈএর ধানের ক্ষেতে পড়ে আছে। ওখানকার দলের সকলে পালিয়েছে 'হৈজা'র ভয়ে। কাটা ধান পর্যন্ত নেয়নি কেউ। মারা যাবার আগে কি তেষ্টা! কি তেষ্টা! সারা রাত ঠায় একা! এতক্ষণে কাক শকুনে নিশ্চয়ই ঠুকরোচ্ছে। মা বলে গিয়েছিল ফুলঝরিয়ার মার কাছে আসতে।......

তার কান্নার মধ্যে সব কথা বোঝাও যায় না।

তাৎমারা এ খবরে বিশেষ হৈ-চৈ করে না। মরাকে তারা মানুষের একটা অতি সাধারণ বৃত্তি বলে মনে করে। জন্তু জানোয়ার মরা, আর মানুষ মরায় তফাৎ কি! কেবল কুকুর মরলে ডোমে ফেলবে, গরু মরলে পাড়ার মধ্যে তার ছাল ছাড়াতে পারবে না, আর মানুষ মরলে ভোজ্ দিতে হবে; এই তফাৎ।

তাৎমার দল বিরক্ত হয়ে ওঠে মেয়েটার ওপর। মড়ার ছোঁয়া কাপড়চোপড় পরে, ছিষ্টি ছুঁয়ে একাকার করবে মেয়েটা। যাক্ না ও মুঙ্গেরের দলের লোকদের কাছে। তা না গুদরের মা-ই হল বেশী আপনার লোক।

ভর্সড়ের বাবুর ছেলে, বিরজু পানওয়ালা, রামনেওরা সিং সকলেই খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে মেয়েটার উপর হঠাৎ। এই মেয়েটার দেওয়া রোগের খবরে আবার ধানকাটনীর দল ভয়ে না পালায়। তাহ'লে অর্ধেক ক্ষেতের ধান ক্ষেতেই পড়ে থাকবে। এমনিই তো কেমৈএর রাজপুতেরা হয়ত ডিস্টিবোডে খবর দিয়েছে এতক্ষণ। ডিস্টিবোডের 'হৈজা'র ডাক্তার যদি এসে 'সুই' (৪) দিতে চায়, তাহ'লেই তো ধানকাটনীর দল সব পালাবে।......

ভর্সড়ের গুরুজীকে পাঠানো হয় ডিস্টিবোড অফিসে, ঘোড়ার পিঠে। তিনি সেখানে লিখিয়ে দিয়ে আসবেন, যে কেমৈএ যারা মরেছে, তাদের হয়েছিল ম্যালেরিয়া জ্বর। ভর্সড়ের বাবু কেমৈএর চৌকিদারটাকে বখশিস করেন,—সে যেন থানায় রিপোর্ট করে যে লোকরা জ্বরে মরেছে।...এখন ভালয় ভালয় ধানকটা ঘরে উঠলে বাঁচা যায়।

তারাপুরের দলের লোকরা রামিয়াকে সঙ্গে রাখতে রাজী নয়। এমনিই রামিয়ার মার উপর কারও সহানুভূতি ছিল না। যতদিন ঝাঙ্গী বেঁচে ছিল, ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে; রুগ্ন স্বামীটার মুখে এক ফোঁটা জলও দেয়নি কোনদিন।···তেমনি জ্বল জ্বল করে মরেছে নিজে···এলি দলের সঙ্গে এখানে। তা মন বসলো না। গেলেন পটেরবিবি মেয়েকে সঙ্গে করে কেমৈ।···

শেষ পর্যন্ত রামিয়া তাৎমাটুলির দলের সঙ্গেই থেকে যায়।

"মা-বাপ মরা মেয়ে, সোমত্ত বয়স। আপনার জনে দূরে ঠেলেছে।"

মহতোগিন্নীর সমর্থনে রতিয়া ছড়িদারও মনে বল পায়। সে এই মেয়েটার সম্বন্ধে অনেক কিছু ভেবে রেখেছে। তারা রবিয়ার বৌকে বলে তুইই রাখ মেয়েটাকে তোর সঙ্গে। রবিয়ার বৌটা আবার একটু বোকা বোকা গোছের। সে তার সাদা মনের কথাটা বলে ফেলে।

"রাখতে আমার আপত্তি নেই, মেয়েটার মায়ের 'কিরিয়া করমে'ও (৫) তো গুড় বাগনর (৬) কিনতে হবে। বামুনকে পয়সা দিতে হবে। সে আমি একা দেবো কোথা থেকে। মেয়ে বলে না হয় মাথা মুড়ানোর পয়সাটা লাগবে না।"

সকলেই এক এক মুঠো ধান দিলেই কাজ হয়ে যায়, কিন্তু কেউ রাজী না।

হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে রামিয়া। কার সাধ্যি সে মুখের সামনে দাঁড়ায়।

মা-বাপ মরা বলে আজ হেনস্তা করছ। যদি 'কিরিয়া করম'এর অভাবে আমার মা 'শাঁখড়েল' পেত্নী হয়, তাহলে যেন এই সতী-লক্ষ্মীদের দলের সকলের সঙ্গে রাতে দেখা করে। একটা দানা ধানের আমি কারও কাছ থেকে চাই না। পূবের ভূত তোরা, 'ভুচ্চর'এর দল (৭) কোথাকার। এদের খপ্পরে তার মা তাকে ফেলে গিয়েছে। 'নরম পানি'র লোক (৮) এরা, এদের কলিজা (৯) আসবে কোথা থেকে? এতটুকু সরু দিল্ এদের, সুপুরি হলে কেটে দেখিয়ে দিতাম— পচা পোকাড়ে, ভদ্দরের বাবুদের আর সব বাবুভাইয়ার দিলের মত। ওদের তবু পয়সা আছে, জামার বোতাম এঁটে 'দিল্' ঢেকে রাখে; আর এই 'নরম পানি'র জানোয়ারগুলোর বোতাম কেনবার পয়সা নেই, মেহনৎ করবার তাকৎ নেই, তাকৎ কাজে লাগানোর মগজ নেই। আমি এখানে

থাকার সময়, রামদানার (১০) শীষ দহের ধার থেকে কেটে পুঁতে রেখেছিলাম। তাই দিয়ে আমি মায়ের 'কিরিয়া করমে' খরচ করবো।"

অকথ্য গালি দিতে দিতে সে ছিটকে বেরিয়ে যায় দহের দিকে।......

তাৎমাদের ভাষায় অশ্লীল শ্লীলের মধ্যে বাছবিচার নেই। রসিকতা আর রাগের সময় বীভৎস অশ্লীল কথা না বললে তাদের ফিকে ফিকে মনে হয় ভাষাটা। যে ওষুধের ধক নেই, সে কি আবার একটা ওষুধ! তাৎমাপুরের পাড়াকুঁদুলি মেয়েটা আজ এহেন তাৎমাদেরও চুপ করিয়ে দিয়েছে।

কেবল কে একজন যেন বলে ওঠে "ফটফটিয়ে চলে গেলেন্।"

মহতোগিন্নী বলেন, "চল্ চল্ সকলে। মেয়েটাকে স্নানটানও তো করাতে হবে। ফুলঝরিয়া, সেই আচারের হাঁড়িজড়ানো নেকড়াটা আনিস তো। আবার শীতের দিনে মেয়েটা ভিজে কাপড়ে থাকবে।"

টীকা:—

(১) কামত—খামার।

(২) কলেরা।

(৩) এদের বিশ্বাস রাত্রে ভয় পাইয়াই কলেরা হয়।

(৪) কলেরার টিকা।

(৫) ক্রিয়াকর্ম

(৬) বাগনর—কাঁচাকলাপাকা—ইহাদের পূজায় নৈবেদ্যে দরকার হয়। জিরানিয়া জেলার অতি প্রিয় ফল।

(৭) একটি সাধারণ গালি—কথাটি ভূচর অর্থাৎ জানোয়ার।

(৮) নরমপানি—যেখানের জল খারাপ।

(৯) হুজুর।

(১০) ইহা হইতে এক প্রকার খই হয়। জলো জমিতে ইহার গাছ হয়। ফল মাটির ভিতর পচাইয়া, তাহার পর উহার ভিতর হইতে দানা বাহির করিতে হয়।

পশ্চিম দিগ্বিজয়ের পর ধানকাটনীর দলের প্রত্যাবর্তন

ধাঙ্গড়দের 'গ্যাং' রাস্তা মেরামত করছে মরগামার 'পখল' এর কাছে (১)। পাটনা থেকে একজন বড় হাকিম এসেছেন 'সার্কাস বাংলায়' (২)। প্রায় লাট সাহেবের মত বড় হাকিম; ইয়াঃ টুপির নীচে লাল টকটকে মুখ; সে মুখ থেকে আঁগুনের ঘুর এর মত ধোঁয়া ছাড়ে ফন ফন ফন ফন। কথা বলে বাঘের মত। কলস্টর সাহেব তো তাকে দেখে থর থর থর থর। সেই সাহেব যাবেন শিকারে—রাজদ্বারভাঙ্গার কুশীর ধারের ভৌয়া জঙ্গলে, বনভঁয়সা (৩) মারতে। চেরমেন সাহেবের তো শুনেই 'সটক-দম' (৪)। তাই তাদের গ্যাংয়ের সকলকে আসতে হয়েছে। এমনি তো কোন 'পুছ' (৫) নেই তাঁদের; কাজ আটকালে এনজিনিয়র সাহেবের মনে পড়ে তাদের কথা। এমনি যে রোজ সকালে ওরসিয়রবাবু সারা গ্যাংটাকে তাঁর বাগানে কাজ করান, সেটা এনজিনিয়র সাহেবের নজরে পড়বে না। তবে চোখে সোনার চশমা পরার দরকার কি? সময় নেই অসময় নেই, জোয়ালে জুতলেই হ'ল?

ঢোঁড়াই সায় দিয়ে বলে—"হাঁ, বেযাই মশায়ের বলদ পেয়েছিস (৬) হাতে; যত পারিস জুতে নে। তার মনটা খারাপ হয়েছে, যখন থেকে ওরসিয়রবাবু আজ মহরমের দিনেও তাদের পাকীতে কাজ করতে বলেছেন। তারা ফুদী সিংএর মহরমের দলের লোক। দল ভারী করতে না পারলে ওস্নীর মুন্সীর দলের কাছে মাথা নীচু হয়ে যাবে। এখনও মহরমের ঢাকের শব্দ কানে আসছে আর ওরসিয়রবাবুর উপর রাগে তার গা জ্বালা করছে। আজ ফুদী সিংয়ের সঙ্গে দেখা হলেই সে বলবে, তাৎমারা চিরকাল একই রকম থেকে গেল। লাঠি 'গদকা' তোরা কোন কালেই খেলিস না, আর সেজন্য তোদের ডাকিও না। খালি একটু সঙ্গে সঙ্গে থেকে সারা শহর ঘুরবি, বাবুভাইয়াদের কাছ থেকে বখশিস আদায় করবার জন্য। দিনের বেলাতেই যতটা শেষ করতে পারা যায়, ততই ভাল; না হলে ঐ বখশিসের পাওয়া পয়সা থেকেই রাতের মশালের তেলের খরচটা দিতে হবে। এক ঘণ্টা কলালীতেও তো (৭) যাবি সবাই। 'কলালী' আবার রাত নটায় বন্ধ হয়ে যায়......

কিন্তু সন্ধ্যার আগে কি আর এই রাস্তার কাজ থেকে ছুটি হবে।

শালা ধান বোঝাই গরুর গাড়ির আর কামাই নেই। এ রাস্তা মেরামত কিসের জন্য। একটা জিরানিয়ার হাটের দিন গেলেই তো আবার যে কে সেই। এই যে কোদাল মেরে মেরে এনে মাটি ফেলছি, এই শীতের দিনেও গা দিয়ে ঘাম ঝরছে, নবাবপুত্তুর গাড়োয়ানরা বলদের লেজ মুড়তে মুড়তে হলালালা করে একদিনে সাফ করে দিয়ে যাবে। চেরমেন সাহেবের এত তাকৎ; আর এই গরুর গাড়ীগুলো রাস্তা দিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে পারে না!

এই বোকাগুলোর কথায় ঢোঁড়াই মনে মনে হাসে; আরে এটুকু বুঝিস না, রাস্তা খারাপ না হলে তোদের বোজগাব চলবে কি করে। আর এই গাড়ীতেই তো ধান আসে জিরানিয়া বাজারে। ধান না এলে খেতিস কি?" সত্যিই ধাঙড়গুলো বোকা। তবে এ কথা ঠিক যে চেরমেন সাহেব আর কলস্টর সাহেব ইচ্ছা করলে তাৎমা ধাঙ্গড়দের অনেক কিছু ভাল করতে পারে। এই ত ধান চাল এত সস্তা করে দিয়েছে। এই সঙ্গে যদি বাবুভাইয়াদের উপর হুকুম করে দিত, তাৎমাদের রোজ ঘরামীর কাজ দিতে, তাহলেই হত বেশ। কিন্তু রামজীর মর্জি ছাড়া তো কিছু হওয়ার উপায় নেই। কখন না কখন গরীবদের কথা তাঁর মনে পড়বেই।

'গই বহোর গরীব নেবাজু
সরল সবল সাহিব রঘুরাজু॥' (৮)

তিনি ছাড়া আর গরীবকে দেখার কে আছে?... ...

"এই 'বহলমান' (৯)! পাক্কীর উপর দিয়ে চালাচ্ছিস যে বড়। দিনের বেলা ঘুমুচ্ছে; ছুছুন্দর কোথাকার।"

গ্যাং এর লোকের চেঁচামেচিতে ঢোঁড়াইয়ের নজব গিয়ে পড়ে ঐ গাড়ীর দিকে। গাড়ী বোঝাই ধানের বস্তার উপর, যে মেয়েটি বসে আছে, সে বস্তাগুলোর উপর হামাগুড়ি দিয়ে এসে গাড়োয়ানকে ধাক্কা দেয়—"এই! ওঠো না। সেই সিসিয়া থেকে শুয়েছো।"

"শুয়েছি তো কার পাঁজরার উপর মুগ ডলেছি (১০)। তোমার নামবার জায়গা এসে পড়ে থাকে তো নেমে পড় না।"

"না, আর এক রশি আগে নামবো। এখানে না।"

কে মেয়েটা? সবাই তাকিয়ে দেখে। মহতোর মেয়ে ফুলঝরিয়া একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসে—সবাই তার খোঁড়া পায়ের কথা ভাবছে না তো।

ঢোঁড়াই বলে, "কি ধানকাটনী থেকে নাকি? কত ধান হল? আর সকলে কোথায়?"

"এই তারা এতক্ষণ চিথরিয়াপীরে হবে। গোঁসাই ডুববার আগেই এসে পড়বে।"

ফুলঝরিয়া ধানের বস্তার আড়ালে তার পায়ের দিকটা সরিয়ে নেয়, গায়ের কাপড় সামলায়, অন্যদিকে তাকাতে চেষ্টা করে। ঢোঁড়াইয়ের সম্মুখে এলেই তার কেমন যেন সব ঘুলিয়ে যায়।

ঢোঁড়াইয়েরও মায়া হয় মেয়েটাকে দেখে। হেসে বলে, "যাক খুব পৌঁছেচো, মহরমের মেলার আগে। কালই দুলদুল ঘোড়া বেরুবে।"

কৃতার্থ হয়ে যায় ফুলঝরিয়া।

ঢোঁড়াইদের ফেলা মাটির উপর দিয়ে গভীর রেখা এঁকে গাড়ীর চাকা এগিয়ে যায় তাৎমাটুলির দিকে। গাড়োয়ানটা আপন মনে বকতে বকতে যায়—আর কদিন পরে গেরস্তরা সত্যিই আনবেনা ধান হাটে। গাড়ীতে আনার মজুরি পোষায় না। কিনবার লোক নেই; গত হাটের দিনও এই ধান ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। এমন হলে তো নিলামেই বিকিয়ে যাবে জমি।......

না রামজী আছেন—ফুলঝরিয়া গাড়োয়ানকে সান্ত্বনা দেয়।......

আবার মাটি ফেলার কাজ আরম্ভ হয়। গোঁসাই ডোবার আগে ঢোঁড়াইদের আর ছুটি নেই। না হলে আবার কাল দুলদুল ঘোড়ার মেলার দিনেও কাজ করতে হবে। আজ দক্ষিণ দিক থেকে তারা এগুবে বাড়ির দিকে।......

'ফুর্তিসে ভাইয়া!' (১১) গোঁসাই ডুববার আর বেশী দেরী নেই।

দূরে দেখা যায়, একদল লোক এদিকেই আসছে। তাদের কোলাহলের স্বর শোনা যাচ্ছে। মহরমের দল নাকি? না ঝাণ্ডা কই? মাথায় কাঁধে জিনিসপত্রের বোঝা, তাই বল। ঢোঁড়াই, তোর টোলার ধানকাটনীর দল ফিরছেন পচ্ছিম ফতে করে। রতিয়া ছড়িদার আবার মাথায় পাগড়ি বেঁধেছেন।

ধাঙড়ের দল নিবিষ্ট মনে রাস্তায় কাজ করবার ভাব দেখায়, যেন ধানকাটনীর দলকে দেখতেই পায়নি। ঢোঁড়াই হেসে তাদের সম্বর্ধনা জানায়। মহতোগিন্নী মুখে এক গাল হাসি নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসেন।

'ফুলঝরিয়ার সঙ্গে দেখা হয়নি খানিক আগে? পাড়ার খবর ভালো তো? আর আমাদের বুড়োর খবর? বাড়িতে এসো, নতুন ধানের চিড়ে খাওয়াবো।'

যাবার সময় মহতোগিন্নী তাকে বলে যান সে যেন ঠিক আসে। অনেক দিনের জমানো কথা আছে 'বাচ্চা'র সঙ্গে। সব তাৎমামেয়েই ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে একটা-না-একটা রসিকতার কথা বলবার চেষ্টা করে। এতদিন পরে পাড়ার ছেলের সঙ্গে প্রথম দেখা; ধানকাটনীর হাওয়ার রেশ এখনও লেগে রয়েছে তাদের মনে। ঢোঁড়াই হেসে বলে, এখন বাড়ি গিয়ে কারও দেখা পাচব না, সব গিয়েছে ফুদী সিংএর মহরমের দলে। রবিয়ার বৌয়ের পাশে ফরসা শাড়ি পরা মেয়েটাও খিলখিল করে হেসে ওঠে তাৎমানীদের রসিকতায়। এই তাহলে ঢোঁড়াই, যার গল্প রামিয়া ফুলঝরিয়ার কাছে শুনেছে।

মেয়েটিকে অচেনা অচেনা লাগে ঢোঁড়াইয়ের। পাড়ার তো নয়ই, অন্য কোথাও দেখেছে বলেও মনে পড়ে না। ছিপ্‌ছিপে গড়ন, বেশ ছিম্‌ছাম, তুখিয়ার মার চাইতেও। মরগামার মেয়েটেয়ে নাকি? হয়ত জিরানিয়ার বাজারে যাচ্ছে। না, ঐতো এদের সঙ্গেই তাৎমাটুলির দিকে চললো। 'ইনারসন'এর পরীর (১২) মত দেখতে। কাঁচা কঞ্চির মত 'লচক' (১৩) মেয়েটার দেহে।.....হঠাৎ ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে যায়, সামুয়রের সাহেবের হাওয়াগাড়ীর সম্মুখের একটা 'চাঁদির মূরতে'র কথা (১৪)। ঠিক সেই মেয়েটার মত দেখতে এই নতুন মেয়েটাকে। একেবারে উড়ে যেতে চাইছে যেন, সেই রকম। দুটো ধানেশ পাখী সম্মুখের বটগাছের কোটরে এসে ঢোকে, ডানা ফট্‌ফট্‌ করতে করতে। দুটো বাদুড় লুইস সাহেবের পেয়ারা আর নারকুলী কুলের বাগানের দিকে উড়ে চলে যায়। তাৎমাটুলি, ধাঙড়টুলির আকাশ, দূরে জিরানিয়া শহরের গাছপালা সব রঙীন হয়ে উঠেছে—'গোঁসাই' ডুবছেন।

ভোঁ, ভোঁ, জিরানিয়া কুর্সেলা লাইনের সাঁঝের 'লৌরী' (১৫) ছাড়লো। রাস্তা খারাপ করার যম এই 'লৌরী'গুলো। ওরসিয়রবাবুর 'নানী মরে' (১৬),

আর যদি ও আমাদের কাজ তদারক করতে আসে এর পরে। এক, দো, তিন! কাম খতম, পয়সা হজম! চলো চলো ঘর।

টীকা:—

(১) পত্থল—পাথর, মাইলষ্টোন

(২) সার্কিটহাউস

(৩) বুনোঘোষ

(৪) সটক্ দম্—আফেন গুড়ুম

(৫) কদর

(৬) একটি প্রচলিত প্রবাদ - "সমধিকা বয়েল"

(৭) মদের দোকান

(৮) (তুলসী দাস হইতে)

সরল সবল প্রভু রঘুরাজ হারান ধন ফিরিয়ে দেন আর গরীবকে পালন করেন।'

(৯) গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান

(১০) একটি চলিত কথা। পাকা ধানে মই দেওয়া এই অর্থে ব্যবহার হয়।

(১১) তাড়াতাড়ি ভাই

(১২) ইন্দ্রাসনের পরী। কোন মেয়ে সুন্দরী হলেই তাৎমারা বলে ইন্দ্রাসনের পরীর মত দেখতে।

(১৩) নমনীয়তা

(১৪) রৌপ্যমূর্তি

(১৫) মোটর বাস

(১৬) 'নানী মরে' শব্দার্থে দিদিমা মারা যায়। "কিছুতেই নয়" এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ঢুলঢুল ঘোড়ার উৎসবে রামিয়ার যোগদান

নূতন মেয়েটা তাৎমাটুলিতে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়, ছেলেদের মধ্যে। আজব আজব পচ্ছিমের খবর শোনায়। "পুরুবের নরম পানি"র লোকদের সম্বন্ধে নাকসিঁটকে কথা বলে। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, থাক না, আর কিছু দিন, তারপর 'নরম' কি কড়া বুঝবি।

তাৎমাটুলির ছেলেরা মহরমের দলে লাঠি খেলে শুনে, রামিয়া চোখ কপালে তুলে বলে, এখনও 'পুরুবের' হিঁদুরা ঐ গরুখোরদের পরবে লাঠি খেলে নাকি? আমাদের পচ্ছিমে তো চার 'সাল' থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কি বন্ধ হয়েছে? লাঠি খেলা?

হাঁ হিঁদুর লাঠি খেলা, মহরমে।

সত্যই তাৎমারা এখবর কখনও শোনেনি এর আগে। ফুদী সিংয়ের দল লাঠি খেলা বন্ধ করবে, এ কথা তারা ভাবতেও পারে না। অদ্ভুত ঐ পচ্ছিমের লোকগুলো, কি করে, কি ভাবে, কিছুই বোঝা যায় না। তবে কপিলরাজার জামাইয়ের মত বদলোককে ঠাণ্ডা করতে হলে, ঐসব একটা কিছু করতে হয়। রবিয়ার বৌ একটু ভয়ে ভয়েই তাকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের দেশে কি দুলদুল ঘোড়ার মেলাতেও যাওয়া বারণ নাকি?

'যাক্, তবু নিশ্চিন্দি যে তোমাদের দেশে দুলদুল ঘোড়ার মেলা হয় না, মহরমের পরদিন। দুলদুল ঘোড়া কি জানো না, আর এই পচ্ছিমের এত বড়াই! অন্ততঃ এই একটা বিষয়ে তাৎমানীরা রামিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ আর নষ্ট করার মত সময় নেই তাদের। আজ মেলায় যাওয়ার দিন, আজ তাৎমানীদের স্নান করতে হবে, কাপড় শুখোতে হবে, এই একরত্তি মেয়েটার সঙ্গে ভ্যাজর ভ্যাজর করে বকলেই তাদের দিন চলবে না।......

নরকটিয়াবাগে নবাব সাহেবদের পরিবারের 'কবরগা' (১)। ইমামবারা থেকে বেরিয়ে দুল-দুল ঘোড়ার মিছিল আসে ঐ 'কবরগা' পর্যন্ত। এই গোরস্থানের বাইরে পথের উপর বসে মেলা, আর 'কবরগা'র ভিতর বসবার জায়গা করা হয় সাহেব আর হাকিমহুকমদের।

ভোঁ, ভোঁ,! ধূলো উড়িয়ে লালরঙের হাওয়াগাড়ী গোরস্থানের পাশে এসে থামে। ঢোঁড়াইরা সকলে সেইদিকে তাকিয়ে দেখে। সামুয়রের সাহেব সিগারেট খেতে খেতে 'কবরগা'র ভিতর গিয়ে ঢোকেন। সাহেবের আর্দালীর পোষাক পরে সামুয়রও এসেছে সঙ্গে হাওয়াগাড়ীতে। ধূলো আর ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েও হাওয়াগাড়ীর সম্মুখের ডানাওয়ালা 'চাঁদির' মেয়েটাকে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঢোঁড়াইয়ের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে, তাৎমাটুলির মেয়েদের উপর। নূতন পচ্ছিমা

মেয়েটাকে; খোঁড়া ফুলঝরিয়া কি যেন বোঝাচ্ছে, এই হাওয়াগাড়ীর দিকে আঙুল দেখিয়ে—বোধহয় সামুয়রের কথা। এক নজরেই বোঝা যায় যে, মেয়েটা অন্য সব তাৎমা মেয়েদের থেকে আলাদা ধরণের। একমাত্র তারই কাপড় 'হরশিঙ্গার'এর ফুল (২) দিয়ে তাজা রঙ্গানো; মেলার এত লোকজনের মধ্যেও নজর গিয়ে পড়ে তারই উপর। হাওয়াগাড়ীর মধ্যে বসে আছে সাহেবের ডেরাইভার, সাহেবের কুকুর, আর সামুয়র। আরদালী না ছাই!

এতক্ষণে সামুয়র নিশ্চিন্দি হয়ে বসে সিগারেট ধরাবার আর লোকজন ভাল করে দেখবার অবকাশ পায়। পথের পূবে রেললাইনের দিকে দাঁড়িয়েছে তাৎমাটুলির দল, আর পশ্চিমে তেঁতুলগাছের তলাটায় দাঁড়িয়েছে ধাঙ্গড়টুলির দল। মেলাতেও তারা দু'দল এক জায়গায় দাঁড়াবে না; কিন্তু নিজের পাড়ার সকলে একসঙ্গে দল বেঁধে থাকে; কত রকমের লোক আসে মেলায়। এই ভিড়ের মধ্যে মেয়েছেলে নিয়ে কাণ্ড; বলাতো যায় না। এ রকম গোলমাল বহুবার হয়েছে, এত সাবধানতা সত্ত্বেও। তার উপর ফিরবার সময় রাত হয়ে যায়। প্রতিবারই এক আধটি মেয়ে দল থেকে ছিটকে পড়ে; একটু রাত করে বাড়ি ফেরে; বলে, ঢুলঢুল ঘোড়া যাওয়ার সময় ভিড়ের চাপে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। মাতব্বররা বোঝে; বাড়ির লোকে দরকার বুঝলে প্রহারও দেয়।

ঢোঁড়াই শালা ধাঙ্গড়টুলির দলের মধ্যেই বসেছে দেখছি। শনিচরার বৌটা আবার দেখছি পায়ে তিনগাছা করে 'সিলবরের পৈড়ী' (৩) পরেছে। আবার এদিকে তাকানো হচ্ছে! বুদ্ধিতো ঘটে খুব! ঝমড় ঝমড় শব্দ হবে হাঁটবার সময়! যাক তাতে দুঃখ নেই সামুয়রের; আজ তাকে ফিরতে হবে সাহেবের গাড়ীতেই; কোন উপায় নেই। ঢোঁড়াইটা আবার ওদিকে হাঁ করে কি দেখছে। দাঁত উঁচু মহতোগিন্নী এখানেও দেখছি জমিয়ে বসেছে। তেল পড়েছে আজ মাথায়। তার খোঁড়া মেয়েটাও দেখছি ভাল্লুকের মত বসেছে। ওর পাশেই হলদে কাপড় পরে কে ওটা, একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ছে? খাসা মেয়েটা! বাই গাড বলছি, বেশ "নিমকিন' দেখতে (৪)। সিন্দুর আছে নাকি কপালে? এতদূর থেকে দেখাও যায় না ছাই! সামুয়রের মনটা অস্থির

হয়ে ওঠে। একটানে সিগারেটটার গোড়া পর্যন্ত জালিয়ে সেটাকে ফেলে দেয়। তারপর আর কৌতূহল চাপতে না পেরে আগিয়ে যায় ঢোঁড়াইয়ের কাছে।

হাঁরে ঢোঁড়াই তুই ইদিকে বসেছিস যে বড় ?

কেন ইদিক কি কারও বাপের কেনা নাকি ?

অন্য সময় হলে এ কথা নিয়েই বেধে যেত কুরুক্ষেত্র—'তাৎমার বাচ্চা' বাপ তুলে কথা বলবে ? কিন্তু এখন সামুয়রের মনের ভাব সেরকম নয়। সে চায় ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে গল্প জমাতে। ঢোঁড়াইকে সিগারেট বের করে দিতে দিতে সে বলে এবার মেলা জমেনি সেরকম; লোকের হাতে পয়সাই নেই, তার মেলা জমবে কি করে ? ঢোঁড়াইও অন্যমনস্কভাবে সায় দেয় সামুয়রের কথায়। পথের ওধারে দুটো ছোকরা বৌকাবাওয়াকে দহিবড়ার ঠোঙ্গা দেখিয়ে ঠাট্টা করছে। আর একটু বেশী বাড়াবাড়ি করলেই ঢোঁড়াইকে উঠতে হবে, ফাজিল ছোঁড়া দুটোকে ঠাণ্ডা করতে।

"ওটা কে রে ঢোঁড়াই ? ঐ হলুদ রঙের শাড়ী পরে ঢলে পড়ছে খোঁড়া মেয়েটার গায়ে ?"

"ওকে রবিয়ার বৌ এনেছে ধানকাটনীর থেকে।"

"বড় ফুরুৎ ফুরুৎ করছেরে মেয়েটা। রবিয়ার বৌয়ের আবার কে হয় ? এখানে থাকবে নাকি এখন ঐ 'পাতলী কোমরওয়ালী' ছুঁড়িটা ?"

ঢোঁড়াই এই সব প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না। এই খৃষ্টানটার সঙ্গে ঐ নূতন মেয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করতে তার মন চায় না। এই প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার জন্য সে বলে—এইবার এসে পড়ল দুলদুল ঘোড়া। ঢাকের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস না ? হলদে শাড়ীপরা মেয়েটার পাশ দিয়ে সামুয়র শিস্ দিতে দিতে গট্‌গট করে, তাৎমাদের দলের ভিড়ের মধ্যে ঢোকে। রামিয়ার হাসি থেমে যায়। ফুলঝরিয়া ফিস ফিস করে, সাহেবের মত রঙের সামুয়রের পরিচয় দিয়ে দেয়—সাহেবদের বাড়ি কাজ করে, 'ঢেরী আমদানীর' নৌকরী (৫); সাহেব অনেক টাকা দিয়ে যাচ্ছে ওকে, এখান থেকে যাওয়ার সময়···

দুলদুল ঘোড়ার মিছিল এসে পড়েছে। মেলার ছত্রভঙ্গ ভিড়, জমে চাপ বেঁধে যায় মুহূর্তের মধ্যে। বুড়ো নবাব সাহেব নিজে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে দুলদুল

ঘোড়ার লাগাম ধরে নিয়ে আসছেন। সাদা রঙের ঘোড়াটা। চোখ দুটো ঠুলি দিয়ে ঢাকা। সোনার ঝালর দেওয়া জিন ঘোড়ার পিঠে। মেহেদিপাতা দিয়ে রাঙানো নবাব সাহেবের দাড়ি। মখমলে ঢাকা আস্তাবলে বন্ধ করে রাখা হয় দুলদুল ঘোড়াটাকে সারা বছর। "হাস্‌সান হোস্‌সান!" "হাস্‌সান হোস্‌সান!" লাঠি আর বুক চাপড়ানোর শব্দে দম বন্ধ হয়ে আসে। ধূলোয় চারিদিক অন্ধকার হয়ে ওঠে। "হায়রে-হায়!" জুলুষ' (৬) ঢুকছে 'কবরগা'র মাঠে, 'কারবালা' করতে।' মেলাশুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়ে 'কবরগা'র মাঠের দেওয়ালের চারিদিকে। ফুলঝরিয়া নিজের জায়গা থেকে নড়তে পারেনি। রামিয়ার একটা কথা বারবার মনে হয়—ফুলঝরিয়া বলছিল যে দুলদুল ঘোড়াটা সারা বছর মখমলের উপর থাকে। মখমলটা নোংরা হয় না?...ভিড়ের চাপে, আর কৌতূহলের আতিশয্যে, সে কখন যে ফুলঝরিয়াকে ফেলে এগিয়ে এসেছে বুঝতেও পারে না। টের পায় যখন দহিবড়াওয়ালা গালাগালি দিয়ে ওঠে,—তার ঝুড়ির ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে গিয়েছে রামিয়া, আরও অনেকে। কি কাণ্ড! কি কাণ্ড! দহিবড়াওয়ালাটা আর তাদের আস্ত রাখবে না। পুবের লোককেও রামিয়া ভয় পায় তাহলে।..."হায়-রে-হায়।".. হঠাৎ দেখে যে সাহেবের মত রং আরদালীটা কখন যেন গা ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছে। সে রামিয়ার তরফ নিয়ে ঝগড়া করে দহিবড়াওয়ালাটার সঙ্গে। তার চেহারা আর পোযাক দেখেই দহিবড়াওয়ালাটা আর পালানোর পথ পায় না। .."হায়-রে-হায়!"......

টীকা:—

(১) কবর দিবার জায়গা

(২) শিউলি ফুল

(৩) জার্মান সিলভারের মল

(৪) দেখতে নিমকিন—অর্থাৎ নোন্তা—সুন্দর আর লাবণ্যযুক্ত। কথাটি সম্মানজনক পাত্র পাত্রীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় না।

(৫) অনেক আয়ের চাকরী

(৬) জুলুষ—মিছিল

ঢোঁড়াইয়ের নাগপাশে বন্ধন

ঢোঁড়াইয়ের খুব ভাল লাগে রামিয়াকে। মেয়েমানুষের উপর সে আগে ছিল একটু নিস্পৃহ গোছের; নিস্পৃহ কেন বোধহয় একটু বিরক্ত বিরক্তই—কোন কথার ঠিক নেই নোংরা ঝোটাহাদের, বেটা ছেলে দেখলে হেসে ঢলে পড়ে, কিন্তু এ মেয়েটা কেমন যেন অন্য রকম। কথা বলে যেন কত কালের চেনা। মেয়েটার গায়ের 'তাকৎ'ও (১) খুব; বেটা ছেলেদের ও হার মানায়। তাৎমাটুলির ঝোটাহাদের মত 'কমজোর' (২) না। সেদিন কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাচ্ছিল রামিয়া। তিনটে ইয়া বড় বড় কলসী একসঙ্গে, মাথায় দুটো, কাঁখে একটা। এক ফোঁটা জল পড়েনি গায়ে। ঢোঁড়াই দেখেছিল পিছন দিক থেকে; আলবৎ পচ্ছিমের পানির গুণ। বাঙ্গালী মেয়েদের মত চুল, 'জলের কুঁজোর মত গলা', কোমরের নীচেটা জাঁতার মত দেখতে (৩)। ভারি ইচ্ছে করে মেয়েটার সঙ্গে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করতে। আবার একটু ভয় ভয়ও করে ওর সঙ্গে কথা বলার সময়। হাজার হলেও পচ্ছিমের মেয়ে, ওদের 'রসম রেওয়াজ' (৪) আলাদা, সংস্কার ভাল, 'পুরুব'এর লোক মুখে স্বীকার না করলেও প্রত্যেকেই মনে মনে একথা না মেনে নিয়ে পারে না। "রহন সহন কিরিয়া করম" এর (৪) যাকিছু ভাল, সবইতো পচ্ছিম মুলুকের জিনিস; পুরুবে তো কেবল মিয়াদের 'কিচির-মিচির বুলি' (৫), আর বাঙ্গালীদের আচার ব্যবহারের কথা ছেড়েই দাও, তাদের তো ও সবের বালাইই নেই।

রামিয়া নামটাও বেশ। হবে না! পচ্ছিমের লোক; কোথায় সেই মুঙ্গের জেলা, 'গঙ্গা কিনার' (৬), কাঢ়াগোলার চাইতেও পচ্ছিমে! আমাদের মেয়েদের নামেরই বা কি ছিরি! বুধনী, জিবছী, আর ওদের দেখতো। রামিয়া—রামপিয়ারী। পচ্ছিমের মুলুকে মেয়েদের নাম যত ভাল, আমাদের জিরানিয়ার বেটাছেলেদের নাম পর্যন্ত অত ভাল হয় না। ওদের মরদদের নামেরতো কথাই নেই। ঐতো পচ্ছিমের অচ্ছেবট সিং ডিস্টিবোর্ডের কল মেরামতিতে কাজ করে। ঢোঁড়াই তার নামের সঙ্গে নিজের নাম মিলিয়ে মনে মনে লজ্জিত হয়—রামিয়া

তার ঢোঁড়াই নাম শুনে নিশ্চয়ই হেসেছে। মেয়ের গড়ন দেখতে চাও,—পচ্ছিমের; মরদ দেখতে চাও, পচ্ছিমের; 'পানি' (৭) দেখতে চাও, পচ্ছিমের; আদব কায়দা দেখতে চাও, পচ্ছিমের; সব ভাল পচ্ছিমের। যাক, যাদের মুলুক যেমন, তাদের 'মুলুক' (৮) তেমন; হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয়?

মেয়েটা অত হাসি খুশি হলে কি হয়, দেখলেই ঢোঁড়াইয়ের মায়া লাগে, বোধ হয় ওর মা-বাপ নেই বলে। তার নিজেরও তো বলতে গেলে ঐ একই দশা।

মহতোগিন্নির সঙ্গে গল্পে গল্পে বলেই ফেললো ঢোঁড়াই, এই কথাটা। ফুলঝরিয়ার মা কিভাবে কথাটা নিল বোঝা গেল না।

"হাঁ; তোরও মা অবিশ্যি না থাকার মধ্যেই; তবে তোর বাওয়া রয়েছে, আমরা রয়েছি। মনে করলে সবই আছে, না মনে করলে কিছুই নেই"। কত কি যে ভাবে আমার 'বাচ্চা'। এ হল সেই মিল, সেই যে কথায় বলে না, তোর বেয়ানের উঠনেও বাবলা গাছ আমার বেয়ানের উঠনেও বাবলা গাছ, আমরা দুজনে আপনার লোক। তোর এ কথা হল তাই।......ও ফুলঝরিয়া, নতুন ধানের চিড়ে যে রাতে কুটলি, তাই চারটি ঢোঁড়াইকে খাওয়া না। ঘটির জলটা ছেঁকে দিস তোর কাপড়ের আঁচল দিয়ে—বড় ময়লা হয়েছে জলে।"

রামিয়া 'থান'এ এসেছিল গোঁসাইকে প্রণাম করতে। গোঁসাইয়ের মাথায় জল ঢালবার পর সে ঢোঁড়াইকে জিজ্ঞাসা করে যে পুরুবের মুলুকে কি গোঁসাইয়ের বেদী রোজ লেপতে নেই নাকি?

ঢোঁড়াই অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বলে এসবের দেখাশুনো বাওয়াই করে।......

না, না, বেদী নিকোনোর কাজ বাওয়ার নয়। আমাদের পচ্ছিমে পাড়ার মেয়েরাই গোঁসাইয়ের বেদী নেপে।

"সে দেশের কথা হল আলাদা।" ঢোঁড়াই এই এক কথাতেই পচ্ছিম মুলুকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেওয়ায় রামিয়ার মনটা খুশী হয়ে ওঠে।

ঢোঁড়াই জানে যে, পচ্ছিমের লোকের ভাল লাগবে না তাদের তাৎমাটুলি; তবু জিজ্ঞাসা করে' "কেমন লাগছে আমাদের টোলা?" আর অন্য কোন কথা সে চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না।

মেয়েটি বোধহয় ঢোঁড়াইয়ের মন রাখবার জন্যই বলে, "বেশ লাগছে, তোমাদের টোলা। বেশ, কোন মুসলমান নেই, ডোম নেই, মুসহর (৯) নেই। কিন্তু জমি বড় 'বালুবুর্জ' (১০)। আর কেউ রামায়ণ পড়তে পারে না।"...

অদ্ভুত পচ্ছিমের লোকদের ভাববার ধরণ। এইসব দিক দিয়ে যে তাদের টোলার বিচার কেউ করতে পারে, এ তার মাথায়ই আসেনি কখনও। তারা চাষবাস করে না, তাই জমি বালুবুর্জ না এঁটেল মাটির এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। কেবল এইটুকু জানে যে, এই 'বালুবুর্জ' জমিতে অল্প খুঁড়লেই কুয়োর জল ওঠে, বালিতে কুয়ো বেশী দিন টেকে না; পাক্কীতে তাবা যে মাটি ফেলে, তা বালিভরা বলে এক পশলা বৃষ্টিতেই ধুয়ে যায়। মেয়েটা মুসলমান, ডোম, মুসহর, কি সব কথা বলে।

জিজ্ঞাসা করে, "কেন, মুসলমান থাকলে কি হতো?"

"এই গোঁসাই থানে মুর্গী চরতো, আর কি হতো!"

তাইতো, মেয়ে হয়েও রামিয়া বুদ্ধিতে বেশ দড় দেখছি। কথাটা ঠিকই বলেছে। সত্যি, যদি সে রামায়ণ পড়তে পারতো তাহলে, রামিয়ার চোখে সে কত বড় হয়ে উঠতে পারতো আজ। পড়তে না পারুক রামায়ণ সে জানে, এই কথাটা রামিয়াকে জানিয়ে দেবার জন্য বলে, আমাদের কাছে তাৎমাটুলিই ভাল লাগে। "জলু পয় সরিস বিকাই, দেখহু প্রীতি কি রীতি ভলি" (১১), জলও দুধের মত বিক্রি হয়, যেখানে ভালবাসা আছে।' এখানে আগে কুশীনদী ছিল কিনা, তাই এত বালি। কৌশিকিমাই চলে যাচ্ছে পচ্ছিমে; ঘোমটার আড়াল পিদিপ জালিয়ে মায়ের কাছে যাচ্ছে। ফেলে রেখে যাচ্ছে এই সব 'বালুবুর্জ' জমি। কৌশিকীমাইয়ের গল্প তুমি জানো না? খুব বড় গল্প। রবিবারে শুনো মিসিরজীর কাছ থেকে, তিনি যখন এই থানে রামায়ণ শোনাতে আসবেন।" এই কথার মধ্যে দিয়ে ঢোঁড়াই চালাকি করে রামিয়াকে শুনিয়ে দিতে চায় যে, তাদের টোলাতেও নিয়মিত রামায়ণ পড়া হয়। যতটা বাজে জায়গা তাৎমাটুলিকে মনে করেছে, ততটা খারাপ জায়গা এটা নয়।

মেয়েটা কিন্তু এসব কথায় বিশেষ কান দিল বলে মনে হল না। তবে ঢোঁড়াইকে দেখে যা মনে হয়েছিল তার চাইতে অনেক চালাক-চতুর। তার

কাঁধ আর হাতের ঢেউখেলানো মাংসের দলা গুলো—দেখলেই বোঝা যায়—পাথরের মত শক্ত। ওর রোজগার ভাল হবে না তো কার হবে? এই কথাগুলোই থান থেকে ফিরিবার পথে রামিয়ার মনে আনাগোনা করে।

টীকা :—

(১) জোর

(২) দুর্বল

(৩) এই গুলিই সৌন্দর্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়

(৪) রসম রেওয়াজ—আচার ব্যবহার ক্রিয়াকর্ম (রহন সহনকিরিয়া করম)

(৫) কিচিরমিচির বুলি—দুর্বোধ্য ভাষা

(৬) গঙ্গাতীরে

(৭) পানি—জলবায়ু

(৮) দেশ

(৯) মুসহর—একটি অনুন্নত শ্রেণীর নাম, এই অঞ্চলে সবচেয়ে নোংরা বলিয়া অখ্যাতি আছে।

(১০) একেবারে বালি ভরা মাটি

(১১) "প্রীতির কি যথার্থ রীতি দেখ, জল ও দুধের মত বিক্রয় হয়।"—(তুলসীদাস হইতে)।

রেবণ গুণীর ঢোঁড়াইকে বরাভয় দান

ঘুরে ফিরে রামিয়ার কথা মনে পড়ে ঢোঁড়াইয়ের। অন্য কথা ভাবতেও ভাল লাগে না। রামিয়াকে একেবারে আপনার করে পাওয়া চাই, 'শাদি' (১) ছাড়া তো তা হতে পারে না। শাদির কথা অমনি বললেই হল নাকি; মাথার উপর বাওয়া রয়েছে; মেয়ের দিকের কোন বেটাছেলের কাছে কথা পাড়তে হবে; সমাজ রয়েছে; মহতো আর নায়েবদের মঞ্জুরি নিতে হবে, টাকা দিতে হবে, ভোজ দিতে হবে, তার উপর এতো আর এখানকার 'ঝোটাহার' বিয়ে নয়, পচ্ছিমে মেয়ের নিজেরও পছন্দ অপছন্দ আছে। রামায়ণ পড়তে শেখেনি সে, তাকে কি আর রামিয়ার পছন্দ হবে।

পরের দিন যখন রামিয়া সন্ধ্যাবেলায় থানে পিদিপ দিতে আসে, তখন ঢোঁড়াই

তাকে এক কোঁচড় গলাকাটা সাহেবের বাড়ির কুল খেতে দিয়েছিল। এ রকম কুল পচ্ছিমে আছে, বড় যে পচ্ছিমের বড়াই কর? রামিয়া একটা খেয়েই বলেছিল 'বেটা মরে'! (২) এমন কুল জীবনে খাইনি, গুড়ের মত মুখে দিলে মিলিয়ে যায়।

আরে বেটা কোথায় তোমার; ছেলের দিব্যি দিচ্ছ?

"বেটা কোন দিন হবে তো।"

বোকার মত দুজনেই হেসে ওঠে; কে কি ভাবে কে জানে। চেরা কচি আমের মত রামিয়ার চোখ দুটোর (৩) দিকে চেয়েই ঢোঁড়াই বুঝতে পারে যে, রামিয়া তার উপর বিরক্ত নয়।

সেই রাতেই ঢোঁড়াই যায় রেবণগুণীর কাছে। গুণীকে রাতে ধরা শক্ত, সে নেশা করে রাতে নাকি শ্মশানে চলে যায়, সেখানে সারারাত ভূত নাচায়, মানুষের মাথা নিয়ে ভূতদের সঙ্গে খেলা করে। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের বরাত ভাল। বাড়িতেই রেবণগুণীর দেখা পেয়ে যায়। নেশা সে করেছিল ঠিক, কিন্তু তখনও শ্মশানে যায়নি। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ঢোঁড়াই তার পায়ের কাছে আট আনা পয়সা রাখে, তার গাঁজার 'ভেট'এর জন্য। সবাই জানে যে এ না দিলে গুণীর মুখ খোলে না। কুপিটা পর্যন্ত নেই, গুণীর মুখ দেখা যাবে কি করে?

"কে?"

মদের গন্ধ আর গলার স্বরে মুখটা কোথায় ঠাহর করা যাচ্ছে। তারপর আরম্ভ হয় কাজের কথা। গুণীকে যতটা রগচটা সবাই ভাবে, অতটা নয়; কাজের সংশ্রবে তার কাছে এসে ঢোঁড়াই বুঝতে পারে। নতুন 'পরদেশী গুগা' (৪) রামিয়ার সম্বন্ধে রেবণ গুণী বেশ ঔৎসুক্যই দেখায়, ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় দরকারের চাইতেও বেশী। সেও শুনেছে মেয়েটার কথা, কিন্তু এখনও দেখেনি। 'ডবকা' নাকি? তাকে শনিবার রাতে শ্মশানে পাঠাতে পারিস? না আমারই ভুল হচ্ছে, যদি শ্মশানেই পাঠাতে পারবি তবে আর আমার কাছে আসবি কেন? তার মায়ের 'কিরিয়া করম'এর (৫) কথা বলে পারিস না? তুই মরদ, না কি?...

ঢোঁড়াই বলে ভুল বুঝো না গুণী। আমি তাকে শাদি করতে চাই।"

সঙ্গে সঙ্গে গুণীর গলার স্বর বদলে যায়। তাই বল! আচ্ছা তাহলে তার শ্মশানে না গেলেও চলবে। তুই চল এখনই আমার সঙ্গে চিথরিয়াপীর।

চিথরিয়াপীরের পাকুড় গাছটার নীচের বেদীটার কাছে এসে যখন ঢোঁড়াই দাঁড়ায়, তখন হাড়কাঁপুনি শীতের মধ্যেও সে ঘামতে আরম্ভ করেছে। হাত পা যেন স্থির রাখতে পারছে না। ইচ্ছা হয় বেদীটা ধরে বসে পড়তে। অন্ধকার নিঝুম রাত। শুখনো পাতার উপর দিয়ে চলার সময় যে শব্দটুকু হচ্ছে মনে হচ্ছে যে তাইতেই সারা গাঁয়ের লোক জেগে উঠবে। শীতের হাওয়ায় বিরাট গাছটার ডালে ডালে ঝোলানো অজস্র নেকড়ার ফালি দুলছে। 'কিচিন' পেত্নীগুলোর (৬) শাড়ী দুলছে নাতো? সেগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে নাকি? না সেগুলো বোধ হয় কাপড় নেড়ে নেড়ে জোনাকপোকা তাড়াচ্ছে? খোকা-ভূতের চোখ নাকি ঐ জোনাকপোকাগুলো? ····রেবণগুণী তাকে হামাগুড়ি দেওয়ার মত করে বসিয়ে দেয়। তারপর খানিকটা মাটি বেদীটার থেকে ভেঙ্গে নিয়ে বলে "যেই আমি মন্তর পড়ে গোঁসাই জাগাবো, অমনি দেখবি যে তুই হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করেছিস। একেবারে গাছের গুঁড়িতে গিয়ে ঠেকে যাবি, তবে থামবি। কারও বাপের সাধ্যি নেই তার আগে তোকে থামায়।

গুণী মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করে। হাঁটুর নীচের মাটি কেঁপে ওঠে - কিসে যেন ঢোঁড়াইকে ঠেলে নিয়ে চলেছে—তার সম্বিত নেই, ভাববার ক্ষমতা নেই, কেবল তাকে এগিয়ে যেতে হবে। তার মাথাটা গিয়ে গুঁড়িটায় লাগে, ঠিক যেখানটায় সিঁদুর লাগানো আছে। জ্ঞান হলে ঢোঁড়াই দেখে যে সে উবু হয়ে, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বেদীটার উপর।

"ওঠ্!"

ঢোঁড়াই উঠে দাঁড়ায়। কেমন যেন দুর্বল দুর্বল লাগে, জ্বর ছাড়বার পরের মত। মনে হচ্ছে হাঁটু দুটো দুমড়ে আসছে।

"এই মাটি রাখ খানিকটা। কোন রকমে তার মাথার চুলে ছোঁয়াতে হবে।"

তাৎমাটুলির মোড়ে এসে, রবিয়ার বাড়ির দিকে মুখ করে গুণী পথের বালির উপর কি সব কতগুলো আঁকেজোখে। বলে "চক্কর মেরে দিলাম (৭) কাজ হবে। আমার বাকি পাওনা দিয়ে দিস পবের সপ্তাহে।"

গুণীর কথার খেলাপ কেউ যেতে পাবে না একথা সে জানে।

ঢোঁড়াই মাটিটুকু নিয়ে থানে ফিরে আসে প্রায় ভোর রাত্রে। বাকি রাত-টুকুও অজস্র চিন্তায় জেগেই কেটে যায়। কি করে তার মাথায় দেওয়া যায় এক খাবলা মাটি? দেওয়ার সময় যদি জানতে পারে! 'তরিবৎবালী' (৮) পচ্ছিমের মেয়ে আবার কি জানি কি ভাবে নেবে জিনিসটাকে। মেয়েটাই আমাকে গুণ করেছে কিনা কে জানে। না হলে এমন তো কখনও হয়নি। বিড়ি না খেলেও এত মন আনচান করে না। মেয়েটা 'শাঁখড়েল' নয়ত? দূর কি যে "অটর পটর" ভাবি (৯) তার ঠিক নেই।...

ঢোঁড়াই ঠিক করতে পারে না, বাওয়াকে তার এই শাদি করতে ইচ্ছার কথা বলবে কিনা। বাওয়া চেয়েছিল তাকে এই গোঁসাই থানের ভার দিতে। সেই জন্য তাকে 'ভকত' বানিয়েছিল। তার মাটিকাটার কাজ নেওয়ার পর থেকে বাওয়া বোধ হয় সে আশা ছেড়ে দিয়েছে, অন্তত তারপর থেকে আর কোনদিন সে কথা বলেনি। তবুও লজ্জা লজ্জা করে বাওয়াকে এই শাদির কথা বলতে। বাওয়া যদি জিজ্ঞাসা করে টাকা পাবি কোথায়? তবে আজকাল বিয়ের খরচ একটু কমেছে মনে হচ্ছে কিছুদিন থেকে। রোজগার কমে গিয়েছে, অথচ 'সরাধ'এর কানুনের (১০) জন্য তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতেই হবে। লোকে খরচ করবে কোথা থেকে। অনিরুধ মোক্তারের কাছ থেকে টাকায় রোজ এক পয়সা করে সুদে গোটা কয়েক টাকা পাওয়া যেতে পারে। শুক্রা আর এতোয়ারী ধাঙড়ও কিছু দিতে পারে। দুখিয়ার মা? তার এক পয়সা মরে গেলেও না; এর জন্য শাদি যদি নাও হয় তাও ভাল। বেঁচে থাকুক অনিরুধ মোক্তার। বিয়ে শ্রাদ্ধয় ধার করবে না তো করবে কখন? কিন্তু শাদির পর বৌ থাকবে কোথায়? গোঁসাই থানে তো মেয়েমানুষের থাকবার জায়গা হবে না। মাটি কাটার কাজ থাকলে পয়সার অভাব হবে না; আর রামিয়া নিজেও কামাবে খুব; যা তাকৎ ওর গায়ে, ও কোদারীর

কাজ পর্যন্ত করতে পারে (১১) দরকার হলে ; এখানকার ঝোটাহাদের মত খালি খুরপি দিয়ে মাটিতে সুড়সুড়ি দেওয়া নয়। মরদের মজুরি কামাবে।

সন্ধ্যাবেলা আবার ঢোঁড়াই গলাকাটা সাহেবের হাতা থেকে ফুল পেড়ে আনে। একেবারে গাছ ঝেড়ে পেড়ে নিয়ে যায় পাড়ার ছোঁড়াগুলো। আজকালকার ছেলেদের সাহস কি বেড়েছে। ঢোঁড়াইরা তো ছোটবেলায় গলাকাটা সাহেবের হাতার মধ্যে ঢুকতে ভয় পেত। সে কিছুতেই ভেবে কূলকিনারা পায় না—কি করে একটু মাটি সে রামিয়ার মাথার চুলে দেবে। খানিকটা মাথায় মাখবার সরষের তেল রামিয়াকে দিলে হয়—তার সঙ্গে এই মাটি একটু মিলিয়ে। মাথায় মাখবার তেল দিলে নেবে না, এমন 'ঝোটাহা' ঢোঁড়াই জীবনে দেখেনি। তবে এ হচ্ছে পচ্ছিমের পাখী, কি জানি যদি না নেয়। থানের পিদিপের জন্য বলে খানিকটা তেল মেয়েটাকে নিশ্চয়ই দেওয়া যায় ; তাতে সঙ্কোচের কোন কথা নেই। অমন ঢের পচ্ছিমবালি ঢোঁড়াই দেখেছে।

বাওয়ার তেলের শিশি থেকে একটু তেল নারকোলের মালায় ঢেলে নেয়। ঢোঁড়াই এতদিন বাওয়াকে ঠাট্টা করেছে, কেন সে নারকোলের মালা দেখলেই কুড়িয়ে রেখে দেয়। এখন সে বোঝে যে বাওয়া সত্যিই বুদ্ধিমান। পূজোর পিদিপের তেল বলে দিলেও একটু আধটু মাথায় মেখেই নেবে—কম সে কম তেলের হাতটা মুছবে মাথায়। ঢোঁড়াই ভেবে রাখে, যে এই তেলটুকু থানেই রেখে দিতে বলবে রামিয়াকে, রোজ রোজ এখানে এসে যেন পিদিপে ঢেলে নেয়। না হলে বাড়ি নিয়ে গেলে রবিয়ার ঐ হ্যাংলা সাতগুষ্টির ভাল্লুকের মত চুলেই—বাস্ এক মিনিটেই সাফ্।......

পিদিপটা আঁচলের আড়াল করে রামিয়া আসে গোঁসাইথানে সন্ধ্যাবেলায়। এসেই বলে—আজ বড় জলদি জলদি ফিরেছ কাজ থেকে। অথচ রামিয়া এইটাই আশা করেছিল। ঢোঁড়াই এখন না এলে একটু হতাশ হত। ঢোঁড়াইয়ের বুকের ভিতর তখন হাতুড়ি পিট্‌ছে, আবার ধরা পড়ে গেল না তো? একটু ঢোঁক গিলে সে রামিয়ার কথার জবাব দেয়—"হঁ্যা"।

থানে পিদিপ দেওয়ার আগে, আঁচলটা মাথার উপর টেনে দেয় রামিয়া,

তারপর গোঁসাইকে প্রণাম করে। আঁচলটা মাথায় দিতে দেখেই ঢোঁড়াইয়ের মাথায় হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে। কুল কটার সঙ্গে এক চিমটে মন্তরের মাটি মিলিয়ে রাখলে হয় না—পচ্ছিমের মেয়ের কখন কি মতিগতি কিছু বলা না; কুল কটা নিশ্চয়ই আঁচলে বেঁধে নেবে, পরে আবার যখন আঁচলটা মাথায় তুলে দেবে, তখন কি মাটির একটা কণাও তাতে লেগে থাকবে না? হঠাৎ সে হড়বড় করে বলে ফেলে "একটু তেল নেবে—'থান'এ দেওয়ার পিদিপে জ্বালানোর জন্যে?"

কচি আমের ফালির মত চোখ দুটোতে আগুনের ঝলক খেলে যায়।

"তোমার দেওয়া তেল আমি 'থান' এ জ্বালাবো কোন দুঃখে? আমি কি রোজগার করে খেতে জানি না? রামজী কি আমায় হাতপা দেন নি? তোমাদের 'ঝোটাহা'দের জানিনা; আমাদের তারাপুরে এমন কথা মরদ বললে তার মোচ উপড়ে নিতাম!"

ঢোঁড়াই একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। কি তেজ! কি দেমাক মেয়েটার! ফনফনিয়ে চলেছে বাড়ির দিকে। এই রামিয়া শোন্ শোন্।

মেয়েটা ফিরে দাঁড়ায়।

"পচ্ছিমের রীত রেওয়াজ তো জানা নেই!"

রামিয়ার চাউনি আগেকার মত নরম হয়ে গিয়েছে আবার।

"গলাকাটা সাহেবের বাড়ির কুল নিতে তো মানা নেই তারাপুরের মেয়েদের?"

হেসে ফেটে পড়ে রামিয়া। এই চটে আবার এই হাসে, আজব পচ্ছিমের মেয়েদের 'চালচলন'!

"হাতে না। অনেক আছে। আঁচলটা ভাল করে পাত। ছোঁড়ারা কি কুল থাকতে দেবে গাছে? দিনরাত গাছ ঠেঙাচ্ছে।"

রামিয়া চলে গেলে ঢোঁড়াই মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করে। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি। খুব সময় মত মনে পড়েছিল কুলের সঙ্গে মাটি মিলিয়ে রাখবার কথা। রামিয়াটা আবার রোজ স্নান করে; এখানকার 'ঝোটাহা'দের মত না। কাল সকালে স্নানের আগে, এই আঁচলের ধুলোর

কথা রামিয়ার চুলে লাগলে হয়। রামজী আর গোঁসাইয়ের উদ্দেশে সে প্রণাম করে, রামিয়ার মাথায় ঐ আঁচলের ধুলো একটুখানি লাগিয়ে দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়।

টীকা :—

(১) বিয়ে।

(২) মিথ্যা বলিলে যেন আমার ছেলে মরিয়া যায়।

(৩) এদের গল্পে, গানে, প্রিয়ার চোখ কাঁচা আমের ফালির মত দেখিতে হয়।

(৪) বিদেশী টিয়া পাখী।

(৫) শ্রাদ্ধ তর্পণ আদি ক্রিয়াকর্ম।

(৬) কিচিন একশ্রেণীর পেত্নী। ইহারা যখন তখন গাছে পা ঝুলাইয়া বসিয়া দোল খায়। অনেক সময় আমরা যে দেখি যে গাছের ডাল অকারণে দুলিয়া উঠিল তাহা কিচিনদের কার্য্য।

(৭) 'চক্কর মেরে দেওয়া'—গুণীরা উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে মন্ত্র পড়িয়া একটি বৃত্তাকার দাগ কাটে।

(৮) আদবকায়দা জানা স্ত্রীলোক।

(৯) 'অটর পটর'—ছাইভস্ম ; যে চিন্তার কোন মাথামুণ্ডু নেই।

(১০) সরদা আইন।

(১১) কোদারী—কোদাল। জিরানিয়ার কাছাকাছি স্ত্রীলোকেরা কোদাল লইয়া কাজ করিতে পারে না। সামাজিক বাধা অপেক্ষা শারীরিক অক্ষমতাই ইহার কারণ বলিয়া বোধ হয়।

কুক্কুরমেধ যজ্ঞের অপ্রত্যাশিত ফললাভ

জিরানিয়াতে আজ দুদিন থেকে একটা পাগলা কুকুরের উপদ্রব চলেছে। ছয়জন লোককে কুকুরটা এরই মধ্যে কামড়েছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ঢেঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের পোষা কুকুর বাড়িতে বেঁধে রাখেন। রাস্তায় যে কোন কুকুরই থাকনা কেন, তার গলায় চেন কিম্বা বকলেস না থাকলে, তাকে মেরে ফেলা হবে। বেশ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে এই নিয়ে শহরে। মিউনিসিপ্যালিটির মেথররা মোটা

মোটা বাঁশ নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কুকুর পিছু এক টাকা করে তারা পাবে; না কথাটায় একটু ভুল থাকল—এক জোড়া কুকুরের কান পিছু এক টাকা করে পাবে মেথররা। সদ্যোমৃত কুকুরের কান দুটো কেটে নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবকে দেখাতে হবে। এইটাই নিয়ম; তবে জ্যান্ত কুকুরের কান কেটে নিয়ে গিয়ে দেখাতে পারলেও কে আর ধরছে। সঙ্গে সঙ্গে টাকা মঞ্জুর, আর তাড়ির দোকানের সফেন আনন্দস্রোতের আবর্ত।

বিজনবাবুর বাড়ির সম্মুখের আমলকী গাছটার তলায় তাঁর আধ ডজন মেয়ের সিরিজ প্রাত্যহিক অভ্যাসমত 'এক্কাদোক্কা' খেলছে। তারা সকলেই একই ছিটের ছোট আঁটো ফ্রক পরে, একজন হাসলে সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ে, একজন লজেন্স চিবিয়ে খেলে, আর কেউ চুষে খায়না নিজের লজেন্সটা; নতুন লোক দেখলে সকলে এক সঙ্গে থামের আড়ালে গিয়ে খিক খিক করে হাসে, একজনের ফ্রকে ধুলো লাগলে সকলে নিজের নিজের জামা একবার ঝেড়ে নেয়। এদের মধ্যে সব চাইতে যে ছোট তাঁকে পাড়ার বখাটে ছেলেরা অলমতি বলে ডাকে।

অলমতি হঠাৎ চীৎকার করে কেঁদে ওঠে—সে কুকুর দেখেছে, পাগলা কুকুর। অলমতির চীৎকারে শ্রীমতী চেঁচায়, সুমতি হাঁউমাউ করে ওঠে, বাকি তিনমতির ব্যাকুল কণ্ঠ সকলের স্বর ছাপিয়ে ওঠে।

বিজনবাবু তীব্রগতিতে সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় ওঠেন, গা আলমারি থেকে 'বার করেন তাঁর বাবার আমলের পুরনো বন্দুকটা। লাইসেন্স রিনিউয়্যাল এর দিন ছাড়া, তিনি বছরে কেবল আর একদিন করে বন্দুকে হাত দেন। প্রতি বছরের কেনা এক ডজন কার্তুজ, তিনি বছরের শেষে, এক সন্ধ্যায় দোতলার ছাত থেকে উড়ন্ত বাদুরের ঝাঁকের মধ্যে নিশানা করে ছোঁড়েন। ঐ একদিন তাঁর মেয়ের দল সন্ধ্যাবেলায় 'বাদুড় বাদুড় পিত্তি'র কোরাস গান বন্ধ করে। ঐ একদিন শুক্রা ধাঙড় মরা বাদুড়ের লোভে (১) বসে থেকে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। আজ পর্যন্ত কোন বছর একটা বাদুড়ও বিজনবাবুর বন্দুকের, গুলিতে মারা পড়েনি।

এই উড়ন্ত বাদুড় মারতে অভ্যস্ত হাত, তাই পাগলা কুকুরটা মারবার সময়

একটুও কাঁপেনি। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার অন্যপারের বাকসের জঙ্গলটা যেখানে নড়ছিল, সেখান থেকে গোঙার কাতরানির শব্দ আসে। বিজন উকীল আর পাড়ার অন্য কয়েকজন মিলে খানিক পরে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসেন বৌকাবাওয়াকে। তার ডান পায়ের উরুতে বন্দুকের গুলিটি লেগেছে। সেখান থেকে রক্তের স্রোত বইছে। ময়লা কৌপীনটাতেও কিছু কিছু রক্ত জমে কালো হতে আরম্ভ হয়েছে। বিজনবাবুর বাড়ির দোতলায় বৌকাবাওয়ার জায়গা হয়। চুপি চুপি বিমল ডাক্তারকে তখনই খবর দিয়ে আনা হয়, বন্দুকের ছিটেগুলি বের করে দেবার জন্য। এ বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য বিজনবাবুর স্ত্রী চিথরিয়াপীর এ (২) সিন্নি মানত করেন। বৌকাবাওয়া সে রাতটা বিজনবাবুর দোতলাতেই থাকে। পরের দিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে আসবার সময় বিজনবাবুর স্ত্রী বলে দেন যে, রোজ তাঁদের বাড়িতে এসে যেন সে এক ঘটি করে দুধ খেয়ে যায়। ব্যাপারটা এত সহজে মিটে যাবে তা বিজনবাবুও ভাবেন নি। তিনিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর। গোঁসাই থানে ফিরে গিয়ে বাওয়া সলাপরামর্শ করে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে। কি কথা হয় কে জানে। দুজনে মিলে আসে অনিরুধ মোক্তারের কাছে। কি মনে করে কি বিজনবাবু উকীল? চিড়িয়ার সামিল মনে করে তাৎমাদের। একটা বাদুড় মারার ক্ষমতা নেই আর বাওয়ার উপর বন্দুক দেগে দিল।

ফৌজদারী কাছারীতে বৌকাবাওয়াকে অনিরুধ মোক্তারের সঙ্গে ঘুরতে দেখে বিজনবাবুর মুখ শুখিয়ে যায়। মোকদ্দমায় কিছু হোক না হোক, বন্দুকের লাইসেন্সটাকে নিয়ে টানাটানি করবে কলেক্টর সাহেব নিশ্চয়ই। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। দরকার কি হাঙ্গাম বাড়িয়ে। অনিরুধ মোক্তারকে ডেকে বিজনবাবু একান্তে কথাবার্তা বলেন। ব্যাপারটা যাতে বেশী দূর না গড়ায় তার জন্য বিজনবাবুর আর এখন টাকা খরচ করতে দ্বিধা নেই। বৌকাবাওয়াকে সাড়ে তিনশ টাকা দিতে তিনি তৈরী হয়ে যান।

বাওয়া ভয়ে কেঁপে মরে অত টাকার কথা শুনে। সতর কুড়ি টাকা। সে অনেক টাকা। এক কুড়ির চাইতেও বেশী। একটা চাঁদির পাহাড়। তা দিয়ে

যা মন চায় করা যেতে পারে—রূপোর মন্দির করা যেতে পারে গোঁসাই থানে; পেট ভরে ঢোঁড়াই জিলাপী খেতে পারে; ঢোঁড়াইয়ের 'শাদি' আর থাকবার ঘর তুলবার খরচ ঐ টাকা দিয়ে হতে পারে; অযোধ্যাজী যাওয়ার 'রেলকিরায়া'র (৩) চাইতেও অনেক বেশী টাকা।

টাকাটা দেওয়ার সময় বিজনবাবু বলেন একটু দুধটুধ কিনে খাবেন এই দিয়ে, বাওয়া। বৌকাবাওয়া ভাবে আজ সকালেও বিজনবাবুর স্ত্রী উঠনং নিকিয়ে কম্বলের আসন পেতে তাকে ফল দুধ খাইয়েছিলেন; কিন্তু আজ থেকে এ বাড়ির ভিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। রামজী তার ভাল করলেন কি মন্দ করলেন তা সে ঠিক্ বুঝতে পারে না। এই উত্তেজনার মধ্যে টাকাটা দেখে বাওয়ার মন দমে যায়—'চাঁদি' নয়, 'লোট'! অনিরুধ মোক্তার টাকাটা গুণে নিয়ে তার হাতে দেন—এই এত্তো লোট! এই একখানা 'লম্বরী' (৪)। ওগুলোও গুণে নাও—'পাঁচটাকিয়া দশটাকিয়া লোট'। বাওয়া দু তিনখানা গুণে হাল ছেড়ে দেয়। এত লোট! তার কপাল ঘেমে ওঠে। আর গোণাও কি সোজা কাজ। ছোট লোট তো বড় লোট; একখানা থেকে আর একখানা আলাদাই হতে চায় না; হরফ, ছবি, রঙবেরঙের লেখা, তার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে আরম্ভ করে। সে কোন রকমে টাকাটা অনিরুধ মোক্তারের কাছে রেখে দিয়ে বাঁচে; পরে দরকার মত নেবে।

অনিরুধ মোক্তার বলে, "আমি খালি একখানা 'দশটাকিয়া' নেবো। (৫) তুমি ভকত আদমী। আমরাও হিঁদু, তোমার কাছ থেকে বেশী নিলে আমারই পাপ হবে, আহা-হা থাক থাক বাওয়া; আমার পায়ে হাত দিচ্ছ বাওয়া হয়েও? রামজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো। এতো তিনিই করিয়েছেন আমাকে দিয়ে, আমার ধরমের কাজ।"......

বাওয়ার চোখ ফেটে জল আসে মোক্তার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতায়। ইনিই তার রামরাজ্যের চাঁদির দুয়োর খুলে দিয়েছেন। ইচ্ছা হয় আরও খানকয়েক 'দশটাকিয়া' তাঁকে দিতে।... ..আচ্ছা সে পরে হবে। এখন সব টাকাইতো তাঁর কাছে থাকল।......

টীকাঃ—

(১) ধাঙড়রা বাদুড়ের মাংস খুব পছন্দ করে—খেতে নাকি 'খাস্তা' মচ্‌মচে।

(২) 'চিথরিয়া' মানে যেখানে ছেঁড়া নেকড়া টাঙানো হয় পীরের 'আস্তানে'।

(৩) রেল ভাড়া।

(৪) **লম্বরী**—একশ টাকার নোট।

(৫) **দশ টাকিয়া**—দশ টাকার নোট।

মহতোগিন্নীর সমাজশাসন

রামিয়া পাড়ার মহতো নায়েবদের সুনজরে পড়তে পারেনি। মহতোগিন্নীর সহানুভূতি না থাকলে প্রথমটায় এই পরদেশী মেয়েটার তাৎমাটুলিতে জায়গা পাওয়া শক্ত হত। প্রথম থেকেই মহতো ভাবে, মুঙ্গের জেলার মধ্যে তারাপুর ডাকসাইটে গাঁ—পচ্ছিমের পানি, বাড়বাড়ন্ত গড়ন; এ মেয়েকে সামলানো শক্ত হবে। মেয়েটা আবার একটু ছিনার (১) গোছের। অন্য পাড়ার এমন মেয়ে হলে দেখতে বেশ, বলতে বেশ; যেমন ধাঙড়টোলার শনিচরার বৌ। কিন্তু নিজেদের বাড়িতে এ মেয়ে হলে নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়। তাৎমাটুলিতে বিয়ের পর কোন মেয়ে একটু আধটু বাবুভাইয়াদের নেকনজরে পড়লে, স্বামীরা জিনিসটা বিশেষ অপছন্দ করে না। এতে স্ত্রীরা একটু ফরসা শাড়ী পরে, মাথায় তেল মাখতে পায়, 'পুরুখ' (২) দিনে রোজগারে না বেরুলেও তার 'ঝোটাহা' রাগারাগি করে না। কিন্তু কুমারী মেয়ের বেলায় এ নিয়ম খাটে না।

তা ছাড়া এই 'সরাধের কানুনের' (৩) যুগে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে মিছামিছি পাড়ার একটা পাত্র খরচ। কটা ছেলেই বা মোট আছে তাৎমাটুলিতে। কুমারী মেয়ে পাড়ায়, সমাজের চোখের সম্মুখে অনাছিষ্টি কাণ্ড করবে, তা আর ধমুয়া মহতো বেঁচে থাকতে হওয়ার উপায় নেই। মহতো ছড়িদারকে হাড়ে হাড়ে চেনে। তার আর রবিয়ার বৌয়ের এই মেয়েটার উপর হঠাৎ সহানুভূতি উছলে উঠল কেন তা সে আন্দাজ করতে পারে। এ কি 'নটিন'দের (৪) গ্রাম পেয়েছ নাকি? এখানে ওসব চলবে না—লাভের বখরা দিলেও না।

কিন্তু প্রথম কদিন হুঁকোতে জোরে জোরে টান মারা ছাড়া আর কিছু উপায় ছিল না; কেননা গুদরের মা মেয়েটার দিকে টেনে কথা বলত। ধানকাটনী থেকে ফিরবার পর ঝোটাহাদের একটু সমীহ করে চলতে হয়। সে জন্য মহতো তার স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করেনি। রামিয়ার পারিবারিক ইতিহাস ধানকাটনীর দলের কাছ থেকে মুখে মুখে পাড়ার বাইরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

হঠাৎ একদিন মহতো দেখে যে হাওয়া গেছে বদলে। ভোরবেলা মহতো বসে 'কচর কচর' করে কাঁচা পেঁপে খাচ্ছে; মহতোগিন্নি এসে বলে দাঁড়াও একটু নুন এনে দি।

মহতো অবাক হয়ে যায়। ব্যাপার কি? ধানকাটনীর পর কিছুদিন তো 'ঝোটাহা'দের কাছ থেকে এমন ব্যবহার পাওয়া যায় না।

গুদরের মা বলে, "মেয়েটা বড় 'ঢঙ্গিলা' (৫)"।

"কোন মেয়েটা?"

"আবার কে, ঐ তারাপুরবালী"

"সব সময় ঐ একই মুখ দিয়ে কথা বল না কি? এই তো তারাপুরবালীর তারিফে জিভ দিয়ে জল পড়ত।"

মহতোগিন্নী এ অভিযোগ মাথা পেতে নেয়।

"খোসা দেখে কি সব সময় ধরা যায়, বেগুনের ভিতর পোকা আছে কিনা।"

"মেয়েদের বুদ্ধি।"

"সে তো একশবার"।

তারপর আসল কথাটা প্রকাশ পায়। মেয়েটা নাকি ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে 'ঢলানি' আরম্ভ করেছে গোঁসাই থানে।

খবর শুনে মহতো চোখে অন্ধকার দেখে। তাদের পঙ্গু মেয়েটার একটা সুরাহা হয়ে যাবে, এ কথা নিয়ে তারা স্বামী স্ত্রী কতদিন কত জল্পনা কল্পনা করেছে আর তাতে বাদ সাধলো কিনা, ঐ বেজাত মেয়েটা। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে ওঠে।

লোকে শাক খাওয়ার জন্য তেল পায় না। ছটপরবের দিনও স্নানের আগে মাথায় এক খাবলা তেল দিতে পারে না, আর ইনি গোঁসাই থানে পিদিপ জ্বালান

রোজ। আড়াই পয়সায় এক ছটাক তেল। রবিয়ার এত পয়সা আসে কোথা থেকে? এদিকে তার বাড়িঘর তো নিলামে চড়াচ্ছে জমিদার, বাকি খাজনার ডিক্রিতে।

মাঝে থেকে মুস্কিল হল রতিয়া ছড়িদারের। রামিয়াকে তাৎমাটুলিতে আনবার সময়, সে যেমন নির্ঝঞ্ঝাটে কিছু টাকা রোজগার করে নেবে মনে ভেবেছিল; এখন দেখে যে তা হবার নয়; একটা জায়গায় তার হিসাবে ভুল হয়েছে। সে ভেবেছিল লাভের 'হিস্‌সা' (৬) দিয়ে মহতোকে হাত করবে। মহতোর সঙ্গে মিলে এ ধরণের কারবার সে অনেক করেছে। পঞ্চায়তের 'নায়েব'গুলোর মতামত সে ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। সেগুলো সব সুরদাস (৭); দিন আর রাতের তফাৎ বোঝে না। মহতোর চোখ দিয়েই তারা সব জিনিস দেখে; তার 'হাঁর সঙ্গে হাঁ মিলোয়' (৮)। টাকার লোভে মহতো গলে না, তা এই ছড়িদার জীবনে প্রথম দেখলো। মহতোগিন্নীর সমর্থনের উপরও কিছুটা নির্ভর করছিল। দিন কয়েকের মধ্যে তাকেও রামিয়ার উপর বিরূপ দেখে, সে মাথায় হাত দিয়ে বসে। সে চালাক লোক; সব জিনিস দিনের মত পরিষ্কার হয়ে ওঠে তার কাছে; এতদিন সে বোঝে যে মহতো, আর মহতোগিন্নীর নজর ছিল ঢোঁড়াইয়ের উপর। এ কি মুস্কিলে পড়ল সে।

এসব ঝঞ্ঝাট একবার আরম্ভ হলে আর তার শেষ নেই। হলও তাই। পরদিন সকালেই ব্যাপারটা গড়ালো অনেক দূর।

পরদিন ভোরে মহতোগিন্নী যাচ্ছিল জঙ্গলের দিকে। হঠাৎ দেখে যে কুলের-জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে, হলদে রঙের শাড়ী পরা একটি মেয়ে। কে মেয়েটা? ছাই, চোখে ভাল দেখিও না; তারাপুরের রাজকুমারী ছাড়া হলদে কাপড় আর এখানে কে পরবে? হাতে আবার দেখছি 'লোটা'! ব্যাপার কি? হয়ত মানতটানৎ করে থাকবে গোঁসাইথানে, তাই মরগামায় মোষের দুধ আনতে যাচ্ছে! কিন্তু জঙ্গলের দিকে যাবে কেন?

"ওরে ও রামিয়া, কোথায় চল্লি?" একমুখ হাসি নিয়ে রামিয়া জবাব দেয় "এই ময়দানে" (৯)।

বলে কি ছুঁড়িটা! "ময়দানে" যাচ্ছিস, ঘটি নিয়ে?

"কেন, তাতে কি হয়েছে ?"

"আবার জিজ্ঞাসা করছে কেন। তুই কি মরদ যে 'লোটা' নিয়ে 'ময়দানে' যাবি ?"

"কোন মরদের বাপের লোটা তো নিইনি।"

দেখ কি কথার কি জবাব! পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে মহতোগিন্নীর।

"বলি লজ্জা শরমের মাথা কি খেয়েছ ? লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাচ্ছ, বেটা ছেলেরা দেখলে বলবে কি ? লোটা হাতে ঝোটাহা দেখলেইতো বেটাছেলেরা বুঝতে পারবে তুই কোথায় যাচ্ছিস, এই সোজা কথাটাও কি ঘটির মধ্যে গুলে গিলিয়ে দিতে হবে নাকি, তারাপুরের রাজকন্যাকে ? এসব 'কিরিস্তানি' আচার-ব্যাভার আমার পাড়ায় চালাতে এসেছিস, একি 'নট্টিন'দের গ্রাম পেয়েছিস নাকি ?"

মাথায় খুন চড়ে যায় রামিয়ার।

"জল না নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়া আমাদের পচ্ছিমের মুলুকে নেই ; তা কোন দিন শিখিওনি, পারবোও না। জংলী মুলুকের নরম পানির লোক, তরিবৎ শেখাতে এসেছেন তারাপুরের লোককে !"

হাতের লোটাটা দড়াম করে মাটিতে রাখে। তারপর হাতের মুঠোর একটা মুদ্রা দেখিয়ে বলে "এমনি করে ঠুসে ঠুসে তোমার মধ্যে তরিবৎ গুঁজে দিতে পারি দশ বচ্ছর ধরে। এই যদি তোমাদের জংলী 'ভুচ্চর'দের টোলার নিয়ম হয়, তাহলে আমি এই এক লাথি, দু-লাথি, তিন লাথি মারি সে নিয়মে"। জলের ঘটিটা কাৎ হয়ে পড়ে। গালির স্রোত একটানা চলতে থাকে। রামিয়া না মহতোগিন্নী কার পারদর্শিতা এ শাস্ত্রে বেশী বলা যায় না। লোক জড় হয়ে যায় সেখানে। পাড়ার মেয়েরা মহতোগিন্নীকে ঠেলেঠুলে বাড়ীর দিকে নিয়ে আসে। মহতো তখন সবে একটু রোদ পোয়াতে বসেছে।

"তুমি না এ গাঁয়ের মহতো ? তুমি থাকতে তোমার স্ত্রীকে, তোমার জাতকে, তোমার টোলাকে বেইজ্জৎ করে, ঐ একরত্তি পরদেশী ছুঁড়িটা। কারসঙ্গে কেমন কথা বলতে হয় জানেনা। 'অন্ধানগরী, চৌপটরাজা, টাকে সের ভাজি, টাকে সের খাজা' (১০)। বয়সের গরবে আজ আমার যা অপমান করেছে ঐ মেয়ে,

ওকে যদি আমি 'জল না খাইয়ে ছেড়েছি' (১১) তবে আমি ভগরাহার মেয়ে না। আমাদেরও একদিন ছিল ঐ বয়স। কিন্তু তখনও কোন দিন সমাজকে হেনস্তা করে লোটা নিয়ে ময়দানে যাওযার বেহায়াপনা করিনি। কি কুক্ষণেই এ মেয়েকে এনেছিলাম। এ যে 'ফুসকুড়ি খুঁটে ঘা করে তুললাম, (১২)। ও ছুঁড়ি লাথিতো আমাকে মারেনি, মেরেছে জাতের মহতো নায়েবদের। থাকো তোমার ঐ মহতোগিরি, মোচ, আর তোমাদের তন্ত্রিমাছত্রি না কি জাত বলে তারই গরবে।"......

"কি! এতবড় আস্পদ্ধা ঐ 'একচিমটি' মেয়েটার।" লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে মহতো বাড়ীর বাইরে। "কোথায় রতিয়া ছড়িদার। বোলাও নায়েবদের"। দুজন নায়েব গাঁ থেকে অনুপস্থিত ছিল সেদিন, গিয়েছিল ভিনগাঁয়ে 'কুটমৈতি' (১৩) করতে। "আচ্ছা, আসছে রবিবারে মেয়েটার বেহায়াপনার বিচার হবে, সাঁঝের বেলা, পঞ্চায়তে। লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাবে মেয়ে-মানুষে তাৎমা-টুলিতে? আমরা বেঁচে থাকতে? কভভী নহী (১৪)।" অকথ্য ভাষায় রামিয়ার উদ্দেশ্যে গালি দিতে দিতে মহতো বাড়ী ফেরে।

রামিয়া তখন রবিয়ার উঠনে আপন মনে বকে, বুক চাপড়ায়, মাটিতে মাথা কোটে, মরা মায়ের নাম করে কত কি বলে কাঁদে। পাড়ার ছেলেপিলেরা রবিয়ার আঙনে উঁকিঝুঁকি মারে। ফৌজী ইঁদারাটার চারিদিকে ঝোটাহাঁরা জটলা করে।

টীকা:—

(১) চটুলা।

(২) স্বামী।

(৩) 'সর্দা' আইন (বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার)।

(৪) নাচ-গান করিয়া যে জাতের মেয়েরা পয়সা রোজগার করে।

(৫) চলানী।

(৬) অংশ।

(৭) অর্দ্ধ।

(৮) 'হাঁ যে হাঁ মিলানা'—সায় দেওয়া।

(৯] হিন্দীতে 'ময়দান মে জানা'র অর্থ পায়খানায় যাওয়া। জল লইয়া পায়খানায় যাওয়া তাৎমা মেয়েদের বারণ। মেয়েদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা চরম নির্লজ্জতা আর কিছু হইতে পারে না।

(১০) যেমন রাজা, তার তেমনি রাজা; এখানে শাকের দামও দুই পয়সা সের, খাজাও দুই পয়সা সের।

(১১) স্থানীয় ভাষায় 'পানি পিলা কর ছোড়না'র মানে নাকানি চুবানি খাওয়ানো'।

(১২) হিন্দী প্রবাদ।

(১৩) কুটুম্বিতা।

(১৪) কখনও নয়।

বাওয়ার নিকট ঢোঁড়াইয়ের বর প্রার্থনা

তাৎমাটুলিতে শোরগোল পড়ে যায়। বাওয়া টাকা পেয়েছে। অনেক টাকা। এই এত্তো! টাকার পাহাড়, পুঁতে রাখতে গেলে ঘড়াতেই আঁটবে না তার লোটাতে কি বলছিস? কত আর বুদ্ধি হবে মেয়ে-মানুষের! হাঁড়ি নামিয়ে মহতোগিন্নি ছোটে; খুবপি হাতে নিয়ে রবিয়ার বৌ আসে; 'ফৌজী' ইঁদারাটার চারিদিকে খালি ভরা, কাৎ হয়ে পড়া, মাটির কলসীর সার যেমন কে তেমন পড়ে থাকে। হাবিয়াদের দলের সাতজন ঘর ছাইছিল সহরে; সেখান থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে আসে গোঁসাইথানের দিকে। ঝোটাহার দল পাড়ার অলিগলিতে মাচার পাশে গাছের নীচে জটলা করে। মরদরা থানে পৌঁছুনোর পর তারা যাবে থানে। সেখানে তারা পিছনে আলাদা থাকবে। মরদদের সঙ্গে 'সভায়' গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা,—মাগো! সে করুকগে ঐ ঢলানী ধাঙড়াণীর দল, সেটি আর এখানে হওয়ার জো নেই।

গোঁসাইথানে লোক গিজ গিজ করছে। ধাঙড়টুলি থেকে পর্যন্ত সকলে এসেছে, ঝুড়ি কোদাল নিয়ে। বাওয়া বসেছে মাঝখানটায়। তাকে ঘিরে বসেছে মহতো ছড়িদার আর নায়েবদের দল। এক মুহূর্তের মধ্যে বাওয়ার স্থান 'টোলার' মধ্যে অনেক উঁচুতে হয়ে গিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ঢোঁড়াইয়েরও। বাবুলাল চাপরাসীর চাইতেও উঁচু কিনা তা এখনও ঠিক হয়নি। সময় লাগবে কথাটা বিবেচনা করতে।

মহতো বলে "ঢোঁড়াইকে দেখছিনা; সে ছেলেটা আবার এখন গেল কোথায়।"

শনিচরা ঢোঁড়াইকে কনুই দিয়ে খোঁচা দেয়। বুতিয়া ছড়িদার বলে "এদিকে এসে কাছে বসনা কেন।"

"এক জায়গায় বসলেই হল।"

তাৎমারা সকলেই মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়; আজও কি ঐ ধাঙড়দের মধ্যে না বসলেই নয়? ঐ এক ধরণের ছেলে!

আদুরে ছেলের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেবার উদারতা জেগেছে আজ সকলের মনে।

মহতো কাজের কথা পাড়ে। "তা বাওয়া 'প্রসাদী তো চড়াতে হয়' (১) থানে—পেঁড়ার প্রসাদী। থানের দয়াতেইতো তোমার সব কিছু।"

বাওয়া ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

"আর একটা ভোজ"

"একটা ভেড়া বলি"

"থানের পাশে একটা ইঁদারা করে দিয়ে তার বিয়ে দিয়ে দাও (২); না হ'লে বড় অসুবিধা হয় আমাদের 'দশবিধ'এ (৩)।"

"থানের জন্য একখান সীতাজী রামজীর রঙ্গীন ছবিওয়ালা রামচরিতমানস কেনো।"

"টোলার ভজনের করতাল দুটো ভেঙ্গে গিয়েছে; তাই একজোড়া কিনে দাও।"

কত রকমের ফরমাশ আসে। বাওয়া কারও কথার জবাব দেয় না। ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় যে সলাপরামর্শ করে পরে যা করার তা করবে। এখন কেবল পেঁড়ার প্রসাদ সকলে পাবে।

মহতো নায়েবরা দুঃখিত হয়। সলাপরামর্শ করে বলার মানে সবাই জানে; ওতো কেবল কথা চাপা দেওয়ার ফন্দি। এই থানের মাটি এককুড়ি বছর গায়ে মেখে তবে তো যখের ধন পেয়েছে। এখানে একটা মন্দির করে দেবে, এর মধ্যে সলাপরামর্শ আবার কি! মন্দির করে দিলে নাম হবে তোমার না আমাদের!

ভিক্ষে করে যার জীবন গিয়েছে সে ইজ্জতের কথা কি বুঝবে! "নভ ছুহি দুধ, চহত এ প্রাণী" (৪)। এর কাছ থেকে থানের আর পাড়ার কোন জিনিস আশা করা, আকাশ দুয়ে দুধ চাইবার মতই অবাস্তব। তবে টাকাওয়ালা লোককে সমীহ করে চলতে হয়, তাদের সঙ্গে কথা বলবার আগে ভেবে বলতে হয়; আর সকলেরই মনে একটি ক্ষীণ আশা আছে যে আজকালকার মত দুর্দিনে টাকা ধার করার জন্য হয়ত আর অনিরুধ মোক্তারের খোসামোদ করতে হবে না।

ঢোঁড়াইকে বাওয়া সহরের দিকে পাঠায় পেঁড়া কিনতে। বাবুলাল ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্যই বলে "ঢোঁড়াই লছমন হালুয়াই-এর দোকান থেকে নিয়ে আসিস।"

মহতোও সায় দেয় "হাঁ লছমন হালুয়াই, পেঁড়াতে চিনি কম দিয়ে ঠকায়না।" কথার সুরে মনে হয় যেন সে রোজই লছমনের আর অন্য মিঠাইওয়ালাদের দোকান থেকে খাবার কিনে খেয়ে থাকে।

এখন পয়সার আকাল এসেছে দেশে। টাকার দরকার তাৎমাদের সকলেরই। এরই মধ্যে টাকার আণ্ডিল পেল কিনা বাওয়া! ছেলে নেই, পিলে নেই, ঘর নেই, সংসার নেই, 'শাদি শরাধ'এর কোন ফিকির নেই (৫), খাওদাও ডুগডুগি বাজাও "না আগে নাথ, না পিছে পগাহা" (৬)। সেই বাওয়ারই খুলল 'তকদীর'! (৭)

তবে ঐ যে ধাঙড়গুলো বসে রয়েছে, ওগুলো বেশ করে বুঝুক যে ঢোঁড়াই ওদের সঙ্গে মাটি কাটে বলে, ওরা ঢোঁড়াইয়ের সমান হয়ে ওঠে নি।

অনেকরাতে ভজন শেষ হবার পর সকলে চলে গেলে বাওয়া ঢোঁড়াইকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজের চাটাইয়ের উপর শোয়ায়—সেই ছোট বেলার মত। আজ ক'বছর থেকে তারা আর এক চাটাইতে শোয় না। শীতকালে আগুনের 'ঘুর'এর এক দিকে শোয় ঢোঁড়াই, একদিকে বাওয়া—তা না হলে বড় শীত করে। বহুদিন পরে আজ আবার বাওয়া তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। বাওয়ার জটার গন্ধে ঢোঁড়াইয়ের কত ছোটবেলার কথা মনে পড়ে।

— "অনেক টাকা, না বাওয়া?"

বাওয়া মাথা নেড়ে বলে, হাঁ

"অনেক কুড়ি—না ?"

"হুঁ।"

তারপর ঢোঁড়াই একেবারে চুপ করে যায়। বাওয়া ভাবে এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি ছেলেটা।

হঠাৎ ঢোঁড়াই বলে, "বাওয়া, আমি রামিয়াকে শাদি করব।" নিশ্বাস বন্ধ করে ঢোঁড়াই বাওয়ার উত্তরের প্রতীক্ষা করে। বাওয়া তার ভালবাসার অত্যাচার ছোটবেলা থেকে অনেক সয়েছে। কত সময় কত অন্যায় করেছে সে, কিন্তু বাওয়া সব সময় নিজের ব্যবহার দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিয়েছে, যে ঢোঁড়াইয়ের বাওয়ার উপর অবিচার করার জুলুম করার দাবি আছে। এই দাবিই ঢোঁড়াইয়ের আসল পুঁজি। কিন্তু তবু আজ তার মনের মধ্যে খচখচ করে বেঁধে—'শাদি'র কথায় কোথায় যেন খানিকটা অন্যায্যতা আছে। বাওয়া চেয়েছিল তাকে 'ভকত' করতে; বিয়ের পর বাওয়ার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেতে হবে; অথচ বাওয়া টাকা না দিলে, রামিয়ার সঙ্গে শাদি হওয়া শক্ত। একটার পর একটা করে এই সব চিন্তা ঢোঁড়াইয়ের মনে আসে। তার মনে হয় বাওয়ার করস্পর্শ মুহূর্তের জন্য একটু যেন আলগা হয়ে আসে। রামিয়া, রামিয়াকে তার চাইই। কোন বাধা সে মানবে না।

ঢোঁড়াই বোঝে যে বাওয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আঙুল দিয়ে ঢোঁড়াই তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়। বাওয়া তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। এই দিনটার অপেক্ষা বাওয়া অনেক দিন থেকে করছে—আর এ বিচ্ছেদকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। টাকার প্রশ্ন এর মধ্যে কেবল গৌণ নয়, এক রকম অবান্তর। ঢোঁড়াই বিয়ে করবে এ বাওয়া ক-বছর আগে থেকেই ধরে নিয়েছে, আর বিয়ের পর তাৎমা ছেলেমেয়েদের মা-বাপ শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে থাকার রেওয়াজ নেই।

ঢোঁড়াই জানে যে বাওয়া টাকা দিতে আপত্তি করবে না। আর বাওয়া মনে মনে ভাবে যে ঢোঁড়াইটা এখনও ছেলেমানুষ আছে, মোচ উঠলে কি হয়। না হলে আজ যে খানিক আগে সকলে টাকা খরচ করবার নানারকম রাস্তা দেখাচ্ছিল তখন সে কারও কথার জবাব দেয়নি কেন। ওরে মুখ্খু, এই সোজা কথাটুকু বুঝতে পারলিনা। থানে মন্দির তৈরী করবার চাইতেও বেশী আনন্দ আমার তোকে সুখী

দেখলে, একথাও কি মুখ ফুটে তোকে বলতে হবে নাকি? ছোটবেলায় যখনি তোকে কোলে নিয়েছি, তখনই মনে হয়েছে যে বুড়ো রাজা দশরথ অযোধ্যাজীতে এমনি করেই একদিন তাঁর রামচন্দ্রজীকে কোলে নিয়েছিলেন।

'ধূসর ধূরি ভরে তনু আয়ে
ভূপতি বিহঁসি গোদ বৈঠায়ে'। (৮)

আমার সেই ঢোঁড়াই কথাটা পাড়লো যেন ভিক্ষে চাইছে টাকা আমার কাছ থেকে! আশ্চর্য! কি চিনেছে সে আমাকে? আরে তোরইতো সব!

ঢোঁড়াইয়ের ঘর তুলে দিতে হবে। ভাল রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তারপর ছেলেপিলে; বাড়বাড়ন্ত সংসার, ঝকঝকে নেপা উঠন, বড় বড় কাঁচামাটির জালা দাওয়ার উপর; ঢোঁড়াইয়ের বৌ রঙীন কাপড় পরে কাঁচা হলুদ সিদ্ধ করছে শুখিয়ে বিক্রি করবার জন্য, তেঁতুল গাছ জমা নিয়েছে পাঁচ টাকায়, আদা দিয়ে বড়ি দিচ্ছে (৯), উঠনে আমলকী আর অশথের ডগার আচার শুখোতে দেওয়া হয়েছে;—সমৃদ্ধির রামায়ণের ছবিভরা পাতা, একখানার পর একখানা খুলে যাচ্ছে বাওয়ার বন্ধ চোখের সম্মুখে। তার ঢোঁড়াই, সেই একরত্তি ঢোঁড়াই, ভিক্ষের সাথী ঢোঁড়াই! কথা বলতে পারে না বাওয়া। কি করে সে ঢোঁড়াইকে বোঝাবে তার মনের এত অব্যক্ত কথা, ভিক্ষের চালের মত একটি একটি করে জমানো, তার মনের কত অশ্রু বেদনা ভরা কথা। ঢোঁড়াইকে একদিনও দুবেলা ভাত খাওয়াতে পারেনি। কত সাধ তার মনে। ঢোঁড়াইকে একদিন পেট ভরে আলুর তরকারি খাওয়াবে। তাকে একটা 'বিলিতি লণ্ঠন' (১০) কিনে দেবে। সেই লণ্ঠনের আলোতে মিসিরজী রামায়ণ পড়ে শোনাচ্ছেন। কত লোক! এই এত দেশী চিনি, পাকা শসা খোসা শুদ্ধ চাকা চাকা করে কাটা, এত হলদে হলদে 'বাগনর' (১১), রমরমা জমজমা সমৃদ্ধির পাহাড় ফুলে ফেঁপে উঠছে। অশ্রুর ধারা তার এতকালের সঞ্চিত দুঃখের মালিন্য ধুয়ে নিয়ে যায়। রামজী! অদ্ভুত তোমার লীলা! রামায়ণ পড়া লোকই কত সময় বুঝতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায়, তা বাওয়াতো কোন্ ছার। ঢোঁড়াইয়ের মায়ায় সে কি ভরতরাজের মত হয়ে যাবে নাকি। সামান্য কুকুরে কামড়ানোর ঘটনার মধ্যে দিয়ে রামজী তার সম্মুখে স্বর্গের দুয়ার খুলে দিয়েছেন, পৃথিবীর স্বর্গ অযোধ্যাজীর

দুয়ার, বাওয়ার চিরজীবনের স্বপ্ন, মানুষের সেরা তীর্থের দুয়ার। সে যদি 'নালায়েক' (১২) হয় তবেই সে রামজীর এই অদৃশ্য ইঙ্গিত মানবে না।·········
ঢোঁড়াইটা এখনও উসখুস করছে, চাটাইয়ের নীচে থেকে ঠাণ্ডা উঠছে বোধ হয়, ·········ঢোঁড়াইকে জীবনে একখানা কম্বল সে কিনে দিতে পারেনি।···ঢোঁড়াই সুখী হবে তো রামিয়াকে বিয়ে করে? মেয়েটা আবার শুনছি লোটা নিয়ে ময়দানে যায়!······'

বাওয়ার হাতের স্পর্শের ভিতর দিয়ে ঢোঁড়াই তার সমস্ত মনের কথা বুঝতে পারে। জীবনে এই প্রথম ঢোঁড়াইয়ের চোখে জল আসে।···

টীকা:—

(১) পূজো দিতে হয়

(২) তাৎমাদের মধ্যে কুয়োর বিয়ে দেবার একটি প্রথা প্রচলিত। বিয়ের গান ইত্যাদি শুনিলে বুঝা যায় ইহা কোন এক "কামলা"র সহিত "কোয়ালা"র বিবাহ অনুষ্ঠান। তাৎমাদের বিয়ের সময় এইরূপ কুয়ার জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ফৌজি কুয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের। সরকারী কুয়ায় ঐ সকল অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। সেইজন্যই নূতন কুয়ার কথা উঠিয়াছিল।

(৩) দশবিধ—বিবাহ শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান

(৪) (তুলসীদাস হইতে)—আকাশ দুয়ে দুধ চায় লোক

(৫) বিয়ের শ্রাদ্ধের কোন চিন্তা নাই।

(৬) হিন্দী প্রবাদ—যে লোকের আগেপিছে ভাববার দরকার নেই।

শব্দার্থ: (বলদের) না আছে নাকের দড়ি সম্মুখে, না আছে রাশের দড়ি পিছনে

(৭) ভাগ্য

(৮) (তুলসীদাস হইতে) ধূলি ভরা ধূসর তনু (রামচন্দ্রের); রাজা হেসে তাঁকে কোলে তুলে নেন।

(৯) ইহাকে "আদৌরী" বলে। অতি সুখাদ্য বলিয়া গণ্য

(১০) ডিব্রু লণ্ঠন

(১১) কাঁচকলা পাকা

(১২) অযোগ্য

ঢোঁড়াইয়ের বিবাহের আয়োজন

রোজগারের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হচ্ছে তাৎমাদের। ধানকাটনীর ধান আর কদিন চলবে। খাপড়ার বাড়ী আর নূতন করে বাবুভাইয়ারা করাচ্ছেনা। ঐ যে এক ফজবেনে ঢেউখেলানো টিন হয়েছে, লোকে গোয়াল পর্যন্ত করতে আরম্ভ করেছে তাই দিয়ে; তা কাজ পাওয়া যাবে কোথা থেকে। এখনও অবিশ্যি পুরানো খাপড়ার বাড়ীগুলো আছে; তাও কতক কতক লোকে বদলে টিন দিয়ে নেওয়া আরম্ভ করেছে, বছর বছর খাপড়া বদলানোর ঝক্কি আর খরচের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। সুদখোর অনিরুধ মোক্তার আর সাওজীরতো টাকার অভাব নেই। তারা নতুন ভাড়াদেবার বাড়ী করাচ্ছিল সব ঐ ঢেউখেলানো টিনের। তাদের দুজন ভাড়াটের মাথায় গোঁসাই ভর করেছিলেন 'জেঠ মাহিনার' দুপুরে—(১) আমাদের রুজি মারবার জন্য চটে। কাঁচাআমপোড়া খাইয়ে কোন রকমে তো তারা সেরে উঠলো, কিন্তু তারপর আর কেউ টিনের বাড়ীতে থাকতে রাজী নয়। তাইতে এখন আবার সব বাড়ীর টিনের উপর খাপড়া দিইয়েছে। কিন্তু টিনের উপরের খাপড়াতো আর বছর বছর বদলাতে হবে না। তবু মন্দের ভাল! এ হল কি দুনিয়ার। দিনে দিনে সব বদলে যাচ্ছে। আগে দেখেছি কদু কুমড়োর গাছে, বাবুভাইয়াদের বাড়ীর চাল ভরে থাকত; আর বাবুভাইয়াদের ছেলেরা চব্বিশ ঘণ্টা খাপড়াগুলো মট্‌মট্‌ করে গুঁড়ো করে কদু-কুমড়ো পাড়তো। আজ সে গাছ পোঁতাও নেই, সে ছেলেগুলোও বদলেছে। ছেলে তো ছেলে! দুনিয়াটাই বদলে যাচ্ছে। সে রকম বৃষ্টি কোথায় হয় আর, যেমন আগে হত; যতক্ষণ তাৎমারা গিয়ে চাল মেরামত না করে দিচ্ছে, ততক্ষণ বাবুভাইয়ারা সকলে খাটের তলায় বসে থাকত। সে রকম বড় বড় "পাথল" ও (২) পড়ে না আজকাল—সে রকম খাপড়া গুঁড়ো করা 'পাথল'। আগে বারো মাস মরণাধারে জল থাকত; এখন বছরে ছ'মাসও থাকে না।

কুয়ো খোঁড়ানো, আর কুয়ো পরিষ্কার করার রোজগারেরও ঐ হালৎ। বাড়ি বাড়ি 'বম্‌মা' (৩) বসছে আজকাল। বাবুভাইয়াদের বলতে গেলে বলে 'বম্‌মা' বসাতে খরচ, কুয়ো তৈরী করার খরচের চাইতে কম। বাবুভাইয়ারা সব তাদের

বাপ-ঠাকুরদার চাইতেও বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। পয়সা আছে তোদের, যা বোঝাবি বুঝে যাব। কিন্তু বুঝলেই কি পেট ভরে ?

রতিয়া ছড়িদারের দরকার টাকার। ওদিকে তো রোজগারের ঐ অবস্থা। তার উপর পঞ্চায়তেও কম মামলা আসছে। ভোজে খরচ করার পয়সা থাকলে তবে তো লোকে পঞ্চায়তীতে মামলা আনবে।

তাই ছড়িদার আসে রবিয়ার সঙ্গে গোটাকয়েক কাজের কথা বলতে। ঢোঁড়াইটার রামিয়ার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াতে পারলে কিছু রোজগার হতে পারে দুজনেরই।

"চলে এস 'আঠ আনা—আঠ আনা।" (৪)

রবিয়া বলে "তা কি করে হবে। এ কি 'অন্ধকে লণ্ঠন দেখাচ্ছ ?' আমি মেয়েটাকে এতদিন থেকে খাওয়াচ্ছি। 'দশ আনা—ছে আনা' হলেই কাফি।"

"ধানকাটনীতে তোর বৌয়ের সঙ্গে মেয়েটাকে জুটিয়ে দিয়েছিল কে ? পঞ্চদের মত করাতে পারবি, এই বিয়ের পক্ষে ? সে সময় দরকার হবে ছড়িদারের। মহতো আবার যা বিগড়ে আছে মেয়েটার উপর! রবিবারে পঞ্চায়তী, মনে আছে তো ?"

রবিয়া জানে যে, কথায় ছড়িদারের সঙ্গে পারা শক্ত। সে ছড়িদারের দেওয়া শর্তে রাজী হয়ে যায়।

টাকাওয়ালা লোকের বিরুদ্ধে 'পঞ্চ'রা যেতে পারে না, একথা সবাই জানে। রবিবারের পঞ্চায়তীর ভিতর মহতো পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস পায় না; কেবল ভোজের সম্বন্ধে কথা হয়। মহতোর সম্মান রাখবার জন্য নায়েবেরা ঠিক করে দেয় যে, রামিয়া এখনই গিয়ে মহতোগিন্নীর 'গোড় লাগবে।' (৫) লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাবার কথাটা কেউ তোলেই না। ভাবী 'পুতহু'র (৬) নির্লজ্জতার কথা উঠিয়ে আজ আর তারা বাওয়ার মত বড় একজন লোকের মাথা হেঁট করাতে পারে না।

বাওয়া ভেবেছিল যে, আর দু'চারমাস যাক; কিন্তু রবিয়ার টাকার দরকার এখনই। সে বলে, "ভাদ্রতে দেবে নাকি বিয়ে—পুরুব মুলুকের 'বেজার শাদি'

(৭)। বাওয়া লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়ে—"না না তা বলছি না। তবে থাকবার ঘর তুলতে হবে তো।"

"সে আর কি? সাতদিনের মধ্যে সব হয়ে যাবে।" সত্যিই সাতদিনের মধ্যে সব তৈরী করে দেয়, ঢোঁড়াইয়ের তাৎমাটুলি আর ধাঙড়টুলি দু' জায়গার বন্ধুরা মিলে। বাওয়ার ইচ্ছা উঠনের মধ্যে একটি পাতকুয়া থাকুক—প্রত্যহ স্নান করার অভ্যাস রামিয়ার। ছড়িদার চটে যায়—"তার চাইতে বল না কেন, বাড়িতে পায়খানা তৈরী করবে, চেরমেন সাহেবের বাড়ির মত।"

বাওয়া কিন্তু নিজের জিদ্ ছাড়ে না "কুয়ো এখন না করলে বর্ষাতে করা যাবে না।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, কুয়ো হয়ে যাবেখন"—বুড়ো এতোয়ারী ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করে দেয়।

ধাঙড়রা ঢোঁড়াইয়ের ঘর তুলতে সাহায্য করে। রবিয়া ঢোঁড়াইকে বলে "আবার ওগুলোকে ডাকছিস কেন, ঢোঁড়াই?" দুদিনের মধ্যে রবিয়া তার শ্বশুরস্থানীয় হয়ে উঠেছে। ঐ মিচকে রবিয়াটা বাওয়ার বেয়াই হয়ে যাবে; হাসি পায় ঢোঁড়াইয়ের। বুড়ো এতোয়ারী সোডা কোম্পানী থেকে ছুটি নিয়ে ঢোঁড়াইয়ের বাড়ির বেড়া বাঁধতে বসে, আর বাওয়াকে মধ্যে রেখে, অন্য তাৎমাদের সঙ্গে গল্প জমায়। এ গল্প সে গল্প।—'চৌকিদারী খাজনা' আবার বাড়িয়েছে তশীলদার। তাৎমাটুলির ও ধাঙড়টুলির। বেইমানি করেছে। রবিয়ারও ধরেছে বারো আনা, আবার বাবুলাল চাপরাসীরও বারো আনা। রবিয়ার বারো আনা হলে বাবুলালের তিন টাকা হওয়া উচিত। নিশ্চয়ই টাকা খেয়েছে তশীলদাব। শনিচরার কি করেছে জান? লিখে দিয়েছে যে, বছরের শেষে খরচ-খরচার পর ওর পঞ্চাশ টাকা বাঁচে। 'ঝুঠ্ঠা' (৮) কোথাকার। এর কিছু প্রতিকার হওয়া দরকার।

রবিয়া বলে—ঠিক বলেছ এতোয়ারী। তশীলদারটা আমার পিছনে কেন লেগেছে জানি না। একটা বাকি খাজনার ডিগ্রিও করিয়েছে আমার খেলাপে। "অত বড় টাট বাঁধিস না ঢোঁড়াই"; গল্পের মধ্যেও সবদিকে নজর আছে এতোয়ারীর। "বাঁচেকলার গাছ পোঁতার জন্য পিছনে একটু জায়গা থাকবে,"—

সকলের মনে পড়ে বাড়ির সঙ্গে একটু আবরুর দরকার হবে রামিয়ার (৯)। ঢোঁড়াই নিজেই কূয়োর পাট বসায়, মাটি আনতে ছোটে। বড় আস্তে আস্তে কাজ হচ্ছে; আর তর সইছে না তার। সেভাবে বাড়ি তৈরী করার সময় একবার রামিয়াকে এনে দেখাতে পারলে হ'ত। পচ্ছিমে মেয়ের পছন্দ অপছন্দ দরকার-অদরকারের খবর তাদের কারুরই জানা নেই। ঐতো কলাগাছের আবরুর কথা কোন তাৎমারই মনে ছিল না—ভাগ্যে এতোয়ারী ছিল। বাওয়া সব বিষয়ে 'পঞ্চ'দের মতামত জিজ্ঞাসা করে, আর ঢোঁড়াইকেও তাই করতে বলে। 'এখন তোর সংসার হল; আর এখন 'পঞ্চ'কে তাচ্ছিল্য করলে চলবে না। যে সমাজে থাকবি তার সঙ্গে বনিয়ে চলতে হবে।'

ঢোঁড়াই গম্ভীর হয়ে শোনে—মুখ দেখে মনে হয় যে, এ বিষয়ে তারও মত ঐ একই।

বাওয়ার ইচ্ছে করে ঢোঁড়াইকে জিজ্ঞাসা করতে—"হ্যাঁরে ঢোঁড়াই, তোর কি একটুও কষ্ট হচ্ছে না, আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে"—দূর একথা কি জিজ্ঞাসা করা যায়? হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে!

সুত মানহিঁ মাতু-পিতা তব লোঁ।
অবলা নহিঁ ডীঠ পরী জব লোঁ॥ (১০)

আর কি এখন ঢোঁড়াইয়ের বাওয়ার কথা ভাববার ফুরসৎ আছে? ভুলুক সে বাওয়াকে; কিন্তু রামচন্দ্রজী! সে নিজে যেন সুখী হয়। রবিয়ার বৌ ছুটতে ছুটতে আসে—রামিয়ার ইচ্ছে একটা তুলসীগাছের বেদী করার উঠনে। সকলে লজ্জিত হয়ে যায়, দেখত কত বড় ভুল হয়ে যাচ্ছিল। মরদদের কি অত মনে থাকে।

বাওয়ার মুখ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—পচ্ছিমের মেয়ে, সংস্কার ভাল। ঢোঁড়াই সুখী হবে; তার ঢোঁড়াই।

টীকা:—

(১) জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে
(২) শিলাবৃষ্টি
(৩) টিউবওয়েল

(৪) আধাআধি বখরা

(৫) প্রণাম করবে

(৬) পুত্রবধূ

(৭) জিরানিয়ার পূর্বদিকের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলির হিন্দুরাও ভাদ্র মাসে বিবাহাদি দেয়। সেইজন্য জেলার পশ্চিমের লোকেরা এই বিবাহকে ব্যাঙের বিয়ে বলে ঠাট্টা করে।

(৮) মিথ্যাবাদী

(৯) প্রতি বাড়ীর পিছনে অন্তত এক ঝাড় কলাগাছ ধাঙড়েরা রাখে মেয়েদের আবরুর জন্য

(১০) ছেলে ততদিনই বাপমাকে মানে যতদিন তার চোখ স্ত্রীর উপর না পড়ে, (তুলসীদাস হইতে)

ঢোঁড়াই-রামিয়ার বিবাহ অনুষ্ঠান

তাৎমাটুলির বিয়েতে যারা বরপক্ষ, তারাই কন্যাপক্ষ। ঐ মহতোগিন্নী, রতিয়া ছড়িদারের বৌ, দুখিয়ার মা, হারিয়ার বৌ, এরাই 'পানকাট্টী'তে (১) যায় ফৌজী ইঁদারা তলায়; এরাই 'গোঁসাই জাগাবার গান' গায় বিয়ের আগের দিন; তাদেরই বাড়ির পুরুষরা বরযাত্রী হয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে 'দুয়ার লাগার' (২) অশ্লীল গান আরম্ভ করে। এ-বিয়েতে আবার ধাঙড়রাও বরযাত্রী এসেছে। বাওয়াকে দেখে আজ হুঁকো নামিয়ে রাখে রবিয়ার বৌ। মাথার কাপড় টেনে দিয়ে বলে, হাতের ঐ চিমটে দিয়ে 'সমধী' (৩) তোমার ছেলেটাকে কোথা থেকে টেনে বের করেছিলে? অঙ্গন-ভরা লোক হেসে উঠে এই রসিকতায়।

দুখিয়ার মায়ের আজ খাতির কত! হঠাৎ দুখিয়ার মা ঢোঁড়াইয়ের মা হয়ে উঠেছে। কিছু কাজ করতে গেলেই সবাই হাঁ-হাঁ করে ওঠে। চেলাকাঠ পেতে দিয়ে বলে, ব'স 'সমধীন' (৪)। মেয়ের বাড়িতে তুমি খাটবে, সে হয় না। এই নাও তামাক খাও। দেখো না তোমাকে আজ কি গালাগালিটা দিই।

পাঁচ এয়োতে তেল-সিঁদুর গুলে মাটিতে পাঁচটা ফোটা দেয়। নাপিত ঢোঁড়াইয়ের আঙুল চিরে রক্ত বের করে দুটো পানের খিলিতে লাগিয়ে দেয়। এইবার নাপিত ধরেছে শক্ত করে রামিয়ার হাতখান, এই নরুন দিয়ে চিরে দিল!

টপ টপ্ করে রক্ত পড়ছে পানের খিলির ভিতর! খুব শক্ত মেয়ে যাহোক। এ পর্যন্ত যত মেয়ের বিয়ে দেখেছে ঢোঁড়াই ছোটবেলায়, সকলেই এই সময় ভয়ে চোখ বুঁজে ফেলে। রামিয়া একবার ভ্রুকুটি পর্যন্ত কোঁচকালো না! আলবৎ হিম্মৎ বটে! রক্ত দেওয়া পানের খিলি ঢোঁড়াই খাওয়ায় রামিয়াকে। রামিয়া দিব্যি কচমচ করে চিবোয়। রবিয়ার বৌ ইসারা করে, অত হ্যাংলাপানা করে চিবুস না, লোকে বেহায়া বলবে। ঢোঁড়াইয়ের মুখে পান দিয়ে দেয় রামিয়া। ঢোঁড়াই ভক্তের রক্তের কথা ভেবেই গা ঘিন-ঘিন করে; নোস্তা নোস্তা লাগে খেতে—সামুয়রটা। আবার রামিয়াকে বলেছিল 'নোস্তা মেয়ে'। চমৎকার মানিয়েছে রামিয়াকে লাল শাড়িটিতে। কাপড়টা পছন্দ করেছে বাওয়া নিজে, লালের উপর হলদে ফুল। সিরুমুলের দোকানের কাপড় ভারি টেকসই; দামও নেয় 'পুরো'—নিয়েছে তিন টাকা বার আনা।

বর-কনে দুজনে মিলে উখলিতে ধান ভানে (৫)। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনেই দুহাত দিয়ে 'সামাট'টাকে(৬) ধরেছে। মহতোগিন্নি ঠাট্টা করেন—"সব দেখে যাচ্ছি; বর কনেকে মেহনৎ করতে দিচ্ছে না।" দুখিয়ার মা বলে, "তুমি থাম দিদি এখন।" হঠাৎ দুখিয়ার মা' চীৎকার করে কেঁদে ওঠে ..... "আজ ঢোঁড়াইয়ের বাপ বেঁচে নাইরে। এসে ছাখো ছেলে আজ তোমার কত বড় লোক।" বাবুলাল চাপরাসী পর্যন্ত এতে বিরক্ত হয না আজ।

মিসিরজী গুটিকয়েক চাল উখলি থেকে তুলে নিয়ে মনে মনে গুণতে আরম্ভ করেন। মেয়ে-পুরুষ সকলের নজর গিয়ে পড়েছে মিসিরজীর হাতের দিকে। চাল সংখ্যায় বেজোড় হলেই এ-বিয়ে সুখের হবে না। তবে সকলেই জানে যে, বেজোড় সংখ্যার চাল কখনও মিসিরজীর হাতে ওঠে না। আর পঞ্চায়তীতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এলেই মহতো নায়েবরা বলে যে ফৌজী ইঁদারার জল দিয়ে 'পানকাট্টী' করা হয়েছিল বলেই বিয়ের ফল এমন হয়েছে—ও ইঁদারাটার বিয়ে দেওয়া হয়নি ত।

পুরুতমশাই চাল গুণবার সময় রামিয়া ঢোঁড়াই দুইজনেরই বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। ঢোঁড়াই সঙ্গে সঙ্গে গুণে যায় মনে মনে—এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয়। ঢোঁড়াইয়ের ভয়ে বুক শুখিয়ে যায়, 'মাড়োয়ার' (৭) চাটাইটা

যেন পায়ের নীচ থেকে সরে যাচ্ছে···মিসিরজী সকলকে বলেন যে, চাল উঠেছে দশটা, জোড় সংখ্যা, এ-বিয়ে খুব সুখের হবে। ঢোঁড়াই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। যাক! তার বোধ হয় গুণতে ভুলই হচ্ছিল; রামায়ণ-পড়া মিসিরজীর মত তাড়াতাড়ি সে গুণতে পারবে কোথা থেকে। তাই একটা কম গুণেছিল সে।

এইবার মহতোর রামায়ণ থেকে ছড়া কাটবার কথা। কোথায় মহতো? তার বলা শেষ না হলে তো মিসিরজী নিজের ছড়াটা বলতে পারেন না। চিরকালের এই নিয়ম। মহতো ঢুলছিল বসে। সে নেশার আমেজে আছে এখন। হঠাৎ চমকে উঠে হড়বড় করে বলে ফেলে—

"সব লচ্ছন সম্পন্ন কুমারী।
হোইহি সন্তত পিয়হি পিয়ারী॥

সব সুলক্ষণ আছে এ মেয়ের। এ চিরকাল 'পুরুখের' পিয়ারী থাকবে।

এইবার মিসিরজী বলেন—

'সদা অচল এহি কর অহিবাতা।
এহি তেঁ জসু পইহহিঁ পিতুমাতা॥

এর এয়োতি অচল থাকবে; এর জন্য এর বাপ-মার নাম হবে।

বাওয়ার বুকের ভিতরটা টন টন করে ওঠে। বহুদিন পর আজ দুখিয়ার মাকে ঢোঁড়াইয়ের খুব ভাল লাগে; চোখের জল ফেলছে তার বাবার জন্য, যে বাপের কথা ঢোঁড়াই জীবনে একদিনও ভাবেনি। বাওয়াও দুখিয়ার মায়ের ছেলের উপর এই নতুন টান দেখে মনে মনে খুশি হয়; হাজার হলেও মা—যাক ঢোঁড়াইয়ের বৌটাকে একটা দেখবার লোক তবু হল।

নাপিত চীৎকার করে—কোথায় গেলে তুই 'সমধী'।

উখলির ধান বাওয়া একমুঠো দেয় রবিয়াকে; আর রবিয়া একমুঠো ধান দেয় বাওয়ার হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের একটানা গান আরম্ভ হয়ে যায় দুখিয়ার মাকে লক্ষ্য করে।

"বুজরুকি রাখ 'সমধীন',

বল ছেলের বাপটি কে

উর্দি-পরা চাপরাসী, না লেঙ্গট-পরা সন্ন্যাসী ?

না অন্য কোন নাগর ছিল,

বলেই ফেল ছাই ?

'খুসুর ফুসুর খুসুর ফুসুর'

কর কেন ? (৮)

অন্য কোন নাগর বুঝি

ভাঁটবনেতে লুকিয়ে আছে ?"

এ-গানে তুখিয়ার মা, বাগুয়া, বাবুলাল, সকলেই আর দশজনের মত হাসে। ঢোঁড়াইয়ের লজ্জা লজ্জা করে। রামিয়ার জন্মের ইতিহাসও সে শুনেছে। তবু মনে হয়, সে যেন রামিয়ার কাছে মর্যাদায় একটু ছোট হয়ে গেল। রামিয়ার গলার উপরটা নড়ছে, নিশ্চয়ই মনের আনন্দে পানের রস গিলছে।···

মেয়েদের গানের লক্ষ্য গিয়ে পড়ে ধাঙ্গড় বরযাত্রীদের উপর।···

কর্মাধর্মার চাঁদনি বাতে

পাটের ক্ষেত নড়ছে কেন ?

এতোযারীর সাদা মাথায়

চাঁদের আলো পড়ছে কেন ?···

বড্ড বেশি নড়ছে যেন···

মহতো বলে, "এতোয়ারী শুনছো তো ?"

তাৎমা-ধাঙ্গড় সকলেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। এই বিয়ের হিড়িকে ধাঙ্গড় আর তাৎমারা, তুই টোলার ইতিহাসে, এই প্রথমবার যেন একটু কাছে আসে। এই তুর্দিনের রোজগারের অসুবিধে, তহশীলদার সাহেবের বেইমানি, আরও অনেক জিনিস হয়ত এর মধ্যে আছ, কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের বিয়েকে উপলক্ষ্য করেই এটা সম্ভব হয়েছে।

টীকা :—

(১) 'জল সহা'র ন্যায় একটি স্ত্রী-আচার

(২) বরযাত্রীরা মেয়ের বাড়ীর দুয়ারে আসিলে আরম্ভ হয় 'দুয়ারলাগা'র গান।

(৩) বেয়াই

(৪) বেয়ান

(৫) উদুখল

(৬) উদুখলের মুষল

(৭) মণ্ডপের

(৮) উসখুস

ধাঙ্গড়টুলির অভিসম্পাৎ

হাসিখুশি-ভরা ধাঙ্গড়টুলিতে হঠাৎ অমঙ্গল আর আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে আসে। শনিচরার বাঁশঝাড়টায় ফুল ধরেছে।

প্রথমটা কেউ লক্ষ্য করেনি! আকলুর মা বুড়ী কি করে ঝাপসা চোখে এর ঠাহর করল, কেউ ভেবে পায় না। সাধে কি আর লোকে যায় তার কাছে সলা-পরামর্শ করতে। সেবার বির্ষার যখন 'বাই'-এর অসুখ হয়, তখন রেবণ গুণী রুগীর বিছানার পাশে একুশটি পান সারি সারি সাজিয়ে যখন চোখ বুজে মন্ত্র পড়ছিল, তখন বুড়ী মিটমিট করে হাসছিল। তারপর কলার পাতায় তেল-সিঁদুর গুলে গুণীর সম্মুখে রেখে দেয়। গুণী চোখ খুলে সিঁদুরের ফোঁটা দেয় মাটিতে। যে রেবণ গুণীকে সিঁদুরের কথা মনে করিয়ে দেয়, সে আর বাঁশের ফুলের খবর পাবে না।

এত বড় অমঙ্গলের সূচনা ধাঙ্গড়টুলিতে আর কখনও আসেনি। 'বাঙ্গাবাঙ্গী'র (১) নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল, না হয় দুঃসময় কাছে। ঐ ফুলের ফসল ছেড়ো না। তাই দিয়ে রুটি তৈরি করে খাবে। তারপর বারো বছরের বেশী, সেখানে থেকো না—বারো বার গাছে তেঁতুল পাকুক। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস করবার কথা ভাবতে হবে।

ধাঙ্গড়টুলির পঞ্চায়েৎ বসে। এতোয়ারী মোড়ল। মেয়েদের মুখে পড়েছে শঙ্কার ছায়া, আর পুরুষদের মুখ বিষাদে ভরা। গাছ, বাঁশ, কুয়ো ফেলে যেতে

হবে নাকি? আজ আর 'পচই'-এর উত্তেজনা নেই; পিড়িং পিড়িং মাদোল বাজছে না; বাঁশী আর গানে কারও উৎসাহ নেই। কোন বাড়িতে উনুনে আগুন পড়েনি। এতোয়ারী আর শুক্রা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে; আর-সকলে নির্বাক।

অবশেষে এতোয়ারী এ সম্বন্ধে অন্তিম রায় দেয়। মোড়লের কাজ বড় কঠিন। কত অপ্রিয় কাজ 'বাঙ্গাবাঙ্গী' মোড়লকে দিয়ে করান; কিন্তু শেষকালে দেখবে এই কথা এখন খারাপ লাগলেও পরে ফল ভাল হয়। যার বাঁশঝাড়, তাকে ধাঙ্গড়টুলি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

শনিচরার বৌ চীৎকার করে কেঁদে ওঠে।

আর য়াদের, যাদের ঝাড়ি থেকে ঐ বাঁশঝাড় দেখা যায়, তাদের কারও দানাপানি জুটবে না এ-গাঁয়ে বারো বছরের পর। কাঁদিস না শনিচরার বৌ, এখন তোরা যাতো। আমরাও পরে যাব।

এই তাৎমাগুলো থেকে যত দূরে যাওয়া যায়, ততই ভাল। বুঝি তো তা কিন্তু নাড়ি যে বাঁধা এখানে। হয়ে ওঠে কই। তাৎমারা ঠিকই বলে—বাঁশঝাড় লাগাবে পাড়া থেকে দূরে; যে-বাড়ি থেকে ভোরবেলায় পূবে বাঁশঝাড় দেখা যায়, সে-বাড়ির উপর যমের নজর।

ঠিক হয় পঞ্চায়েতে যে ধাঙ্গড়রা নূতন কলমের গাছ পোঁতা বন্ধ করবে। কুটীরের খুঁটিতে ঘুণ ধরলেও বদলাবার চেষ্টা কর না। যার যা জমে নগদ রাখবার চেষ্টা করবে। গরু-মোষ কিনতে খরচ করবে; মুরগী ছাগল বাড়াতে আরম্ভ কর; শনিচরা পশ্চিমে কোন জায়গায় চলে যাক 'বটেদারী'র কাজে (২); কুশীর দিকে। সেখানে জমি খুব ভাল। অড়র ক্ষেতে দাঁতওয়ালা হাতী ডুবে যায়; ধনে-মৌরির গাছ মানুষের সমান ডগা ছাড়ে, ভুট্টা-তামাকের তো কথাই নেই। ওদিকে পড়তি জমি আছে অনেক। নদীর জল খাস না খবরদার, গলগণ্ড হবে। শনিচরা চলে গেলে কর্মাধর্মার গান আর কি সেরকম জমবে?

"যাঁহা খেলে বোঁচাবোঁচি চলু দেখে যাই" (৩)'। মাদোলের সঙ্গে কি সুরই দেয় শনিচরা।

শনিচরা একটাও কথা বলে না। অনবরত নখ দিয়ে মাটিতে হিজিবিজি কাটে। তার ছলছলে চোখের দিকে কেউ আর তাকাতে পারে না।

সে রাত্রে এতোয়ারীর ঘুম হয় না। সারারাত শনের গাছ দিয়ে তৈরি মাদুরখানার উপর এ-পাশ আর ও-পাশ করে। মোড়লের অপ্রিয় দায়িত্বের বোঝা, আর সে বইতে পারছে না। ধাঙ্গড়টুলির মধ্যে সব চাইতে ফুর্তিবাজ লোক শনিচরা; হাসি, নাচ, গান, গল্পে চব্বিশ ঘণ্টা ধাঙ্গড়টুলি মশগুল করে রাখে; সে কেন পড়ল বাঙ্গাবাঙ্গীর কোপদৃষ্টিতে? তহশীলদারেরও আক্রোশ দেখেছি তারই উপর বেশী। ওর বৌটার দোষ আছে ঠিকই—বড় 'ছমকী আওরৎ' (৪)। বক যেরকম মাছের উপর নিশানা করে বসে থাকে, সামুয়রটাও সেইরকমই লেগেছিল শনিচরার বৌটার পিছনে। খালি সামুয়রকেই দোষ দিলে চলবে কেন, শনিচরার বৌটাও গায়েপড়া। কিছুদিন আগে সামুয়রটা ধরা পড়েছিল; সে ঐ বাঁশঝাড়টার মধ্যে ঢুকে, বাঁশের উপর বাড়ি মেরে একটা শব্দ করত রাতে আর শনিচরার বৌটা উঠে যেত বাঁশঝাড়ে। খুব ঠোকন খেয়েছিল সেদিন সামুয়রটা। তারপর থেকে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। বাঙ্গাবাঙ্গী কি শনিচরার বৌকেই পাড়া থেকে সরাতে চান নাকি? কে জানে? সেইজন্যই কি ওঁর ঐ বাঁশঝাড়টার উপর রাগ?······এতোয়ারী ভেবে কুলকিনারা পায় না। দোষ করল শনিচরার বৌ; তাও সেসব গণ্ডগোল কবে মিটে গিয়েছে; আর সাজা পাবে কিনা শনিচরা!······

ঠক! ঠক! শব্দটা কানে আসছে কিছুক্ষণ থেকে। হাতুড়ি-ঠোকা-পেঁচার ডাক নয়ত? না সেরকম তো মনে হচ্ছে না। শনিচরার বাড়ির দিক থেকেই আসছে······

ধড়মড় করে ওঠে এতোয়ারী। একখান লাঠি নেওয়া ভাল। ঠিকই শনিচরার বাঁশঝাড়টা থেকে আসছে শব্দ।

জোছনা উঠেছে শেষ রাত্রে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মেঠো পথ।······ এতোয়ারী আস্তে আস্তে বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। একটা আওরৎও গিয়ে ঢোকে সেই বাঁশঝাড়ে। দূর থেকে এতোয়ারী দেখে—মেয়েমানুষ বলেই তো মনে হল। আজ আর সামুয়রের রক্ষা নেই।···পা টিপে টিপে ঢুকছে এতোয়ারী

বাঁশঝাড়ের মধ্যে—হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরেছে শক্ত করে। কিন্তু সে শব্দটা থামছে না—বাঁশ কাটার শব্দ বলে মনে হচ্ছে। হুড়মুড় করে শব্দ করে এতোয়ারীর কাছেই একটা বাঁশ মাটিতে পড়তে পড়তে কিসে যেন আটকে যায়—বোধ হয় অন্য একটা বাঁশে।

"সবগুলোকে কাটো। সবগুলোকে। একটাও রেখো না"। পরিষ্কার শনিচরার বৌয়ের গলা। বাঁশের ঝাড়কে ঝাড় একেবারে নির্মূল করে কেটে ফেলে দেবে শনিচরা। আর কার উপর সে তার আক্রোশ, অভিমান দেখাবে? আগাছার মত তাঁর গাঁ থেকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে সকলে তাকে।......তাই রাতের আঁধারে স্বামী-স্ত্রী দুজনে এসেছে এখানে।

চোখের কোণে জল আসে বুড়ো এতোয়ারীর। সে আবার পা টিপে টিপে ফিরে আসে নিজের ঘরে, কোন সাড়া না দিয়ে।

টীকা:—

(১) ধাঙড়দের দেবতা
(২) বটেদার—আধিয়ার, বর্গাদার
(৩) যেখানে পুরুষ কুমির আর মেয়ে কুমির খেলা করছে, চল দেখতে যাই।
(৪) উড়ু উড়ু ভাবের স্ত্রীলোক

ঢোঁড়াইয়ের নিকট মহতোর আবেদন

ঢোঁড়াইয়ের ইচ্ছা রামিয়াকে রোজগার করতে না দেওয়া। দুখিয়ার মায়ের মত। অন্য তাৎমানীদের মত রামিয়া বাবু-ভাইয়াদের বাড়ি তাল, কুল, হেলেঞ্চার শাক বেচতে যাবে, সে ঢোঁড়াই পছন্দ করে না। সব সে বোঝে। সামুয়র-টামুয়রের মত বদ লোকগুলোর চোখের দিকে এক-নজর তাকিয়েই সে বোঝে। তার রামিয়াকে সে বাড়ির বাইরে যেতে দেবে না; কিন্তু মাটিকাটার রোজগার দিয়ে বৌকে বেড়ার ভিতরে রাখা চলে না। বাওয়াও সে কথা জানে।

কি করবি ঢোঁড়াই?

বাওয়ার ইচ্ছে ঢোঁড়াই একখান মুদীখানার দোকান খুলুক। কি জবাব দিন না যে?

ঢোঁড়াইও একথা ভেবেছে। রামিয়ার সঙ্গে কত গল্প হয়েছে এ নিয়ে। রামিয়া পয়সা আর আনা জুড়ে সেদিন সরষের তেল, ঘিঠে আর খয়নির হিসেব করে দিল। দোকান চালানোয় রামিয়া 'মদদ' (১) করতে পারবে ঠিকই; কিন্তু আওরতের সাহায্য নিয়ে রোজগার।...তেমন মরদ ঢোঁড়াইকে পাওনি। তার উপর এক কুড়ি লোক চব্বিশ ঘণ্টা তার দোকানে ফষ্টিনষ্টি করবে, ঐ সামুয়রটা পর্যন্ত—সেসব চলবে না।

পান-বিড়ির দোকান। তাহলে তো দোকান করতে হয় জিরানিয়াতে। বাওয়ারও হঠাৎ মনে পড়ে যে, সেদিন যখন সে অনিরুধ মোক্তারের সঙ্গে কাছারীর 'মুন্সীখানায়' গিয়েছিল, সেখানে কে যেন বলাবলি করছিল মহাত্মাজীর কথা—আবার নাকি একটা 'হল্লা' (২) হতে পারে সেবারকার মত। তাদের সব কথা বাবাজী বোঝেনি, তবে বুঝেছে যে, এবার 'তামাসা' জমবে আরও বেশি।...দরকার কি এই সব সময় পান-বিড়ির দোকান করে।

তাহলে ভাড়ার গরুরগাড়ি চালা ঢোঁড়াই। ভাড়ার মাল বোঝাই করে যখন ইচ্ছে যাও, যখন ইচ্ছে ফেরো। বাড়ির দুয়ারে বলদজোড়া বাঁধা থাকবে—ইয়াঃ তাজা তাগড়া শিঙে তেল লাগানো বলদ—'বটোহী' (৩) রাস্তা থেকে তাকিয়ে দেখবে। পাড়ার লোক হিংসেয় ফেটে পড়বে, লোকে সমীহ করবে। পথের মাঝে গরুরগাড়ি আড়াআড়ি করে রেখে দাও, মরদরা পর্যন্ত গাড়ীর নীচ দিয়ে যাবে; রাখুক তো দেখি কেউ গাড়িটা সরিয়ে একপাশে—কারও হিম্মৎ হবে না। বাড়ির সম্মুখে ঘুঁটের পাহাড় দেখে লোকের চোখ টাটাবে।

শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের গাড়ি-বলদ কেনাই ঠিক হয়—ভিখনাহাপট্টির মেলা থেকে।

পাড়া আবার সরগরম হয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে হয়ে উঠল কি তাৎমাটুলি। বড় যখন হয় তখন এমনি করেই হয়। এবেলা-ওবেলা বাড়ে। একেবারে বাবুলালের সমান হয়ে গেল ঢোঁড়াই। দুখিয়ার মা নিত্যি এসে "কনিয়ার" (৪) সংসার তদারক করে যায়। দুখিয়াটা পর্যন্ত 'ভাবীর' (৫) ফাই-ফরমাশ খাটে। রামিয়ার কাছে আসে না কেবল ফুলঝরিয়া। ডাকতে গিয়েছিল রামিয়া; তাও আসেনি। দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেছিল।

বিনা কাজে মহতোর কারও বাড়ি যাওয়া নিয়ম নয়—তার পদমর্যাদায় বাধে। সে শুদ্ধ একদিন ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে এল, নতুন বলদজোড়া দেখবার ছুতো করে। মহতো তার দুয়ারে; ঢোঁড়াই কি করবে ভেবে পায় না। রামিয়া তাকে উঠনে নিয়ে গিয়ে বসায়। পাড়ার লোকেরা বাড়ির বাইরে জটলা করে—নিশ্চয়ই ফের ঢোঁড়াইটা কোথায় একটা কি কাণ্ড বাধিয়েছে; নাহলে কি আর মহতো এসেছে অঙ্গনে। পচ্ছিমে মেয়েটা আবার কিছু করেনি তো?

রামিয়া মহতোকে পা ধোবার জল দেয়। মশলা বাঁটবার জন্য দুখিয়ার মা যে দু টুকরো পাথর দিয়েছে, তাই দিয়ে সুপুরি ভেঙ্গে দেয়। মহতো যতটা খুশি হয়, তার চেয়ে আশ্চর্য হয় বেশি। তাৎমাটুলির লোকেরা এসব পচ্ছিমে 'তরিবৎ'-এ অভ্যস্ত নয়। অথচ মহতো একথা প্রকাশ করতে চায় না। তাড়াতাড়ি পা ধোবার জলটা খেয়ে সুপুরি কয়টা মুখে ফেলে।

রামিয়া ফিক করে হেসে ফেলায়, মহতো বলে এই রকম হাসিই তো চাই; কিন্তু অঙ্গনের বাইরে গিয়ে নয়। একি মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের সিঁড়িতে চড়া মেয়ে পেয়েছে। আমাদের কনৌজী তাৎমার ঝোটাহারা মদ তাড়ি পর্যন্ত আঙ্গিনায় বসে খাবে—'কলালী'তে নয় (৬)। এই আমার গুদরের বৌকে দেখ না। তাড়ি খাওয়ার পর একদিন কেউ তার চোখে জল দেখতে পেয়েছে? বাড়ির লোকেও না। কিন্তু বেচারী এখন মুস্কিলে পড়েছে ভারি। জানই তো আজকালকার রোজগারের বাজার। আমি আর গুদরের মা তোমাকে তো নিজের বেটা বলেই মনে করি। তোমার ঐ গ্যাংএর কাজটা গুদরকে পাইয়ে দাও। তুমি তো ছেড়েই দিলে।

ঢোঁড়াই এতক্ষণে বুঝতে পারে, কেন মহতো এসেছে তার বাড়িতে। আচ্ছা আমি এতোয়ারীকে বলে দেখব। ওইতো সব—নামেই শনিচরার দল।

এতোয়ারীর কাছে একথা তুলতেই সে বলে যে, তা কি করে হবে। ধাঙ্গড়টুলির কথা তো তারা আগে ভাববে। আর একটা জায়গাও অবিশ্যি খালি হবে—শনিচরারটা; কিন্তু ক'জনকে ঢুকোতে হবে কাজে জান? ছোটাবিরষার চাকরি গিয়াছে, তার সাহেব চলে গিয়েছে বাড়ি বিক্রি করে। সামুয়রের খুড়তুতো ভাই মাসুয়র, যেটা গির্জায় ঘণ্টা বাজায়, সেটার চাকরিও টলমল। পাদ্রী সাহেবরা

জিরানিয়া থেকে চলে যাচ্ছে তুমকা জেলা। বাচ্চাদের একপোয়া করে যে দুধ দেয় গির্জা থেকে, সেটাও যাবে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে। আরও গোটাকয়েক চাকরি যাওয়ার ফিরিস্তি দেয় এতোয়ারী। তাছাড়া সামুয়রের সাহেব তো এই গেল বলে—তার মালীটাকেও তো এক জায়গায় ঢুকোতে হবে।

এর উপর আর কথা চলে না। ঢোঁড়াই বোঝে যে মহতো চটবে, কিন্তু উপায় কি?

টীকা:—

(১) সাহায্য

(২) গণ্ডগোল; আন্দোলন

(৩) পথিক

(৪) কনিয়া—কনে বৌ, পুত্রবধূ

(৫) ভ্রাতৃবধূ

(৬) মদের দোকান

বৌকা বাওয়ার অন্তর্ধান

বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের বিয়ের পর থেকে একটু বিমনা হয়ে পড়েছে। এতদিন তবু হাতে কাজ ছিল, বিয়ের যোগাড়, ঘর তুলবার বাঁশ খড়ের যোগাড়, গাড়ী বলদ কেনা। এসব কাজে একরকম উৎসাহও এসে গিয়েছিল তার। তার ঢোঁড়াইয়ের সংসার সে নিজে হাতে পেতে দিয়েছে। রামজী তার মাথায় যে কর্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা বইতে ইতস্তত করেনি একদিনও। সে আর কি করেছে; যাঁর কাজ তিনিই করিয়েছেন। তবে এতদিন ঢোঁড়াই ছিল, একটা অবলম্বন ছিল। এখন বড় একলা একলা লাগে; ভিক্ষা চাইতে ইচ্ছা করে না; রামজীর কথা পর্যন্ত মনে আসে না। তিনি সব দেখছেন উপর থেকে। আত্মগ্লানিতে ঘন ঘন মিলিটি ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করে; বেশীক্ষণ করে বসে রামায়ণ শুনতে। বার বার সেখানকার রামসীতা লছমনজী মহাবীরজীর 'মুরৎ'গুলিকে (১) প্রণাম করে। মোহান্তজী প্রসাদ করে কল্কে তার হাতে দিলে অন্যমনস্ক হয়ে টান মারে; কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি

পায় না। ঢোঁড়াই আর রামিয়া ধরেছিল তাদের বাড়ীতে খাওয়ার জন্য। সে রাজী হয়নি। তাই নিয়ে রামিয়া চোখের জল ফেলেছিল, কিন্তু বাওয়ার মতের নড়চড় হয়নি। বাওয়া স্বপাক খেত চিরকাল। তবে ঢোঁড়াইয়ের ছোঁয়া খেতে তার কোনদিন দ্বিধা হয়নি। রামচন্দ্রজী যাকে ছেলে বলে কোলে তুলে দিয়েছেন তার বেলায় কি ছোঁয়াছুঁয়ির কথা ওঠে; কিন্তু তাই বলে সে আর তার স্ত্রী এক নয়। ঢোঁড়াই এজন্য মনে মনে বেশ দুঃখিত হয়েছিল। বলেই ফেললো—তোমাকে মেয়ে বাছতে দিইনি বলে রাগ করেছ বাওয়া? দেখ অবুঝ ছেলের কথা—বোঝালেও বুঝতে চায় না। আরে না না, তা কি হয়? "তবে কেন খাবে না বাওয়া?" ঢোঁড়াইয়ের সন্দেহের নিরসন হয় না। বাওয়া হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে যায়। অনুতাপ নয়, তবু ঢোঁড়াইয়ের মনে হয় যে সেও যদি বাওয়ার মত সন্ন্যাসী হয়ে থাকত, তাহলে তার সঙ্গে গোঁসাইথানে থাকতে পারত। কিন্তু রামিয়া? তাহলে তার জীবনে রামিয়া তো আসতো না। তাহলে তার আজ থাকত কি? এই কয়দিনের মধ্যেই সে রামিয়াকে বাদ দিয়ে নিজের জীবনের কথা ভাবতেই পারে না। একদিনও সে জীবনে রামিয়াকে ছেড়ে থাকবে না। যদি রামিয়া কোনদিন মরে যায়—সীতারাম! সীতারাম! কেবল বাজে কথা মনে পড়বে।

বাওয়ার মন অস্থির অস্থির করে; নিঃসঙ্গতায় সে পাগল হয়ে যাবে নাকি! সবইতো সেই আছে, সেই 'থান', সেই রামায়ণ পাঠ। কেবল তার ঢোঁড়াই আর তার নেই। আর একজন তাকে একেবারে আপন করে নিচ্ছে। এতে দুঃখ কিসের; এতো আনন্দের কথা। তার ঢোঁড়াই সুখে থাকুক এইতো বাওয়া চেয়েছিল।······

চৈতী গানের সুর ভেসে আসছে। হরখুর মাতাল জামাইটা বোধ হয় মনের আনন্দে তান ধরেছে।

······ চায়েৎ সুভা দিনোয়া রামা, হো রামা ·····

আবি গেলে পিয়াকী গামানোয়া (২)।

······চৈত্রের শুভদিন এসে গিয়েছে রাম, পিয়ার দ্বিরাগমনের সময় এসে গিয়েছে।······

পাড়ার সবাই গিয়েছে মরনাধারের পুলের কাছে, ঐ যেখানে আলো আর আগুন দেখা যাচ্ছে। কাল রাতেও এই সময় ওখানে তাৎমাটুলি আর ধাঙড়টুলির সকলে গিয়েছিল। মহাৎমাজীর চেলারা ঐ জায়গাটাকে বেছেছেন নিমকতৈরীর মহলা দেবার জন্য।

'রংরেজ'এর (৩) নিমক খেলে, 'রংরেজের' খেলাপ যেতে পারবে না। 'রংরেজ' দারোগা কলষ্টরের মালিক। গরীবদের 'হালতের সুধার' (৩) করতে হলে নিমক তৈরী করতে হবে। নিমক তৈয়ার করবার সময় দারোগা এলে, কি করে সকলে মিলে নিমকের কড়াইখানাকে বাঁচাবে, তারই মহলা দিতে এসেছেন মাষ্টার-সাহেবের চেলারা। রামিয়া, মহতোগিন্নী, রবিয়ার বৌ আরও অনেক 'ঝোটাহা' সন্ধ্যাবেলায় মরনাধারের পুলের কাছে ঐ জায়গাটাতে পিদিপ দিয়ে এসেছে। কাল একদল এসেছিল মহলা দিতে, আজ আবার এসেছে নতুন আর একদল। এরাই সব আবার গাঁয়ে গাঁয়ে চলে যাবে এর পর। কিন্তু মরনাধারের কাছে থেকে যাবে একটা নতুন 'থান' (৪), মহাৎমাজীর থান, ঠিক যেখানটিতে আজ ঝোটাহারা সাঁঝে পিদিপ দিয়েছে সেইখানটায়। বাওয়া ভাবে যে সত্যি যদি ওখানে আর একটা 'থান' হয়ে যায়, তাহলে তাৎমাটুলিতে গোঁসাইথানের গুরুত্বতেও কিছুটা টান পড়তে পারে। কাল সে মরনাধারের কাছে মাষ্টারসাহেবকে দেখেছে। বাওয়া চিমটে কমণ্ডলু নিয়েও ঢোঁড়াইয়ের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারে না, আর মহাৎমাজীর চেলারা কি করে নিজের ছেলে পিলে ছেড়ে জেলে থাকে। তাদের কি মন কেমন করে না? না, 'বজরঙ্গবলী'র (৫) শক্তি মহাৎমা আর তাঁর চেলাদের। রামচন্দ্রজীর আশীর্বাদ আছে তাঁদের উপর। কিন্তু একটা জিনিস বাওয়ার মাথায় কিছুতেই ঢোকে না। কয়েক 'সাল' আগের, সেই গানহী বাওয়ার তামাসা, আর হল্লার সময় আফিংখোর উকীলসাহেব আরও কত মুসলমান পিঁয়াজ ছেড়ে গানহীবাওয়ার চেলা হয়েছিল। ঐ মিয়াদের আবার বিশ্বাস! মিসিরজীর কাছ থেকে বাওয়া শুনেছে, যে অযোধ্যাজীতে রামচন্দ্রজীর মন্দিরটাকে মিয়ারা মসজিদ করে নিয়েছে। দেখ আস্পর্ধা! ঐ মিয়াদের সঙ্গে এত মাখামাখি মহাৎমাজীর চেলারা করেছিল; তবু রামচন্দ্রজী কেন মহাৎমাজীর চেলাদের উপর এত সদয়? মহাৎমাজীকে রাখুকতো দেখি সরকার জেলে?

রামচন্দ্রজীর আশীর্বাদ তাঁর মাথায়, তাঁকে কি কলস্টর দারোগা জেলে পুরে রাখতে পারে। তুলসীদাসজীকে একবার এক নবাব জেলে রেখেছিল; লাখে লাখে বাঁদররা গিয়ে তাঁকে জেল থেকে বের করে এনেছিল। আর মহাৎমাজীকে রাখবে তালা দিয়ে! মা মরার সময় বলে গিয়েছিল অযোধ্যাজীতে গিয়ে থাকিস, সেখানে অনেক ভিখ পাওয়া যায়। হঠাৎ একথা মনে পড়ল কেন? রামজী বোধহয় মনে পড়িয়ে দিচ্ছেন আমার পথের কথা। তিনি আমার মাথার উপর থেকে সব ভার সরিয়ে নিয়েছেন; অযোধ্যাজী যাওয়ার রেলভাড়া জুটিয়ে দিয়েছেন; বলছেন, ভরতরাজার মত তোর হল নাকি?

শুভদিন এসে গিয়েছে।

······আবুহো বাভনমা, বৈঠোহো আঙ্গনমা,
গনি দেহ পিয়াকে গামনমা······
হো রামা·· ···(৬)

এস বামুনঠাকুর, অঙ্গনে বস, পিয়ার দ্বিরাগমনের দিনক্ষণ দেখে দাও।

না না, আর পাঁজিপুঁথি দেখবার দরকার নেই। বাওয়া ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় মনের পরতে পরতে জমানো, ঢোঁড়াইয়ের স্মৃতিগুলি। চৈতী গানের ইঙ্গিত, মরা মায়ের আদেশ, রামজীর অঙ্গুলিসঙ্কেতকে সে তাচ্ছিল্য করতে পারে না। তাকে সব ছিঁড়ে বেরুতে হবে, না হলে তার দশা হবে ভরত রাজার মত। এই জন্যই বোধ হয় তার মন এত অস্থির অস্থির লাগছিল। ঢোঁড়াইরা এখন সব গিয়েছে মরনাধারের কাছে মহাৎমাজীর চেলাদের তামাসা দেখতে। এখনই সময়টা ভাল—আর এক মুহূর্তও সে দেরী করবে না। চিমটে কমণ্ডলু নিয়ে সে ওঠে। থানের বেদীটিকে প্রণাম করে। চিমটের আংটাটার সঙ্গে ঢোঁড়াই ছোটবেলায় একটা আধলা ফুটো করে ঢুকিয়েছিল। হঠাৎ সেটার উপর নজর পড়ায়, সেটাকে খুলে ফেলবার জন্য টানাটানি করে। না এত তাড়াতাড়ি খোলা সম্ভব নয় ওটা।

সময় নেই। সীত্তারাম! সীত্তারাম!

"চায়েৎ স্বুভা দিনোয়া রামা,
আবি গেলে পিয়াকী গামানোয়া···
হো রামা···"

শুভদিন এসে গিয়েছে। আর এক মুহূর্ত ও সময় নেই নষ্ট করবার…

চিমটের আংটার সঙ্গে আধলাটা লেগে যে শব্দ হচ্ছিল সেটা ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। তেল ফুরোনোয় থানের পিদিপটার বুক জ্বলছিল; সেটা দপ্ করে নিভে যায়।

টীকা :—

(১) বিগ্রহ

(২) তাৎমাটুলির একটি প্রচলিত চৈতীগান। চৈত্রের শুভদিন এসে গিয়েছে রাম, পিয়ার দ্বিরাগমনের সময় এসে গিয়েছে

(৩) রংরেজ—ইংরাজ। হালতের সুধার—অবস্থার উন্নতি

(৪) থান—পূজার স্থান

(৫) বজরঙ্গবলী—মহাবীরজী

(৬) উপর্যুক্ত চৈতীগানের অপর এক লাইন।

এস হে বামুন ঠাকুর, অঙ্গনে বস
পিয়ার দ্বিরাগমনের দিনক্ষণ দেখে দাও
হে রাম!…

গানহী বাওয়ার ভিন্ন মূর্তিতে পুনরাবির্ভাব

'সার্ভে' খাতাখতিয়ান অনুযায়ী, মরনাধার সমেত বকরহাট্টার মাঠ, তাৎমাটুলির জমিদারবাবুর নিজস্ব সম্পত্তি। আসলে, তাৎমা ধাঙড়রা এখানে আসবার অনেককাল আগে থেকেই বকরহাট্টার মাঠ ছিল মরগামার লোকদের গরুচরানোর জায়গা। এ ছিল জনসাধারণের জমি (১)। ঢোঁড়াই জন্মাবার ছয় বছর আগে, যখন এখানে 'সার্ভে' হয় তখন (২) জমিদারবাবু টাকা পয়সা খরচ করে, এটাকে তাঁর নিজের পড়তি (৩) জমি বলে সার্ভে কাগজপত্রে লিখিয়ে নেন। তারপর থেকে লার জন্য কুলগাছ বিলি করতেন তিনিই; কপিলরাজার কাছে শিমুলগাছ বিক্রি করতেন তিনিই। কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এখন জমিদারবাবুর

মাথায়, বকরহাট্টার মাঠ নিয়ে অনেক জিনিস খেলছে। এর মধ্যে যদি মহাৎমাজীর 'থান' হয়ে যায়, বকরহাট্টার মাঠের মধ্যে, কিংবা এই নিয়ে যদি থানা পুলিশ মামলা মোকদ্দমা হয়, তা হলে, হয়ত আবার নতুন করে, এতদিনের চাপা পড়া, জমির স্বত্বের কথা উঠবে। ওখানে পিদিপ দেওয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, এখবরও তিনি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গিয়েছেন। রতিয়া ছড়িদার, পরসাদী নায়েব, রবিয়া, সকলের নামেই 'বাকি খাজনার ডিক্রি করানো আছে। তারা সবাই এখন তাঁর মুঠোর মধ্যে! তিনি সাঁঝেই তাদের ডেকে পাঠান।

পরের দিন ভোর না হতেই হৈ হৈ কাণ্ড তাৎমাটুলিতে। মোটরে করে 'লাইন' থেকে পুলিস এসে হাজির, সঙ্গে আবার 'রংরেজী টুপি'পরা (৪) হাকিম। তাঁরা মরনাধারের দিক থেকে ফিরছেন। মরনাধারের কাছে এখন কোন লোক নেই, তবে রাত্রে সেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিল, এখনো ঘাসের উপর তার চিহ্ন আছে। চৌকিদার, আর দফাদারের খবর যে, রাতে তাৎমাটুলি আর ধাঙড়টুলির ছেলেবুড়ো সকলে ভেঙ্গে পড়েছিল মরনাধারের কাছে। তাই হাকিম এসেছেন তাৎমাটুলিতে। দেখা গেল যে পুলিশ সব খবরই জানে। হাকিম বললেন যে সব খবর আমরা রাখি। আজ কিছু বললাম না। যা করেছ করেছ, আর যেন ভবিষ্যতে না হয়। বাইরের লোক কেউ তোমাদের পাড়ায় এসে সরকারের খেলাপ কাজ করলেও, ধরব তোমাদের। তাৎমাটুলির একখানা ঘরও দাঁড়িয়ে থাকবে না তাহলে, বলে রাখলাম। রোজগার কর, খাও দাও থাক। না হলে ফল ভুগবে। তোমাদের কিছু বলার থাকেতো আমার কাছে যখন ইচ্ছা বলতে পার, কিন্তু কংগ্রেসের লোকদের পাল্লায় পড়েছ কি, তোমাদের সবকটাকে ধরে জেলে দেব।

সকলের মন ভয়ে কেঁপে ওঠে। মহাৎমাজীর চেলারা, মাস্টার সাহেবের চেলারা তাহলে 'কাংগ্রিস'এর লোক। কিছুদিন থেকে মিসিরজীও রামায়ণ পাঠের সময় 'কাংগ্রিস কাংগ্রিস' কি সব বলে। এখন এস. ডি. ও. সাহেবও সেই কথা বলছেন। তাই বল! বাবুভাইয়াদের কাংগ্রিস আর দারোগা হাকিমের সরকার! এদের মধ্যে লেগেছে 'টক্কর' (৫)। 'হাকিম বোধ হয় ভুল বোঝাচ্ছে —মহাৎমাজীর নামতো নিচ্ছে না একবারও।...

ঢোঁড়াই হাকিমকে সেলাম করে বলে হুজুর মা বাপ। আপনার কাছে আমাদের একটা 'আর্জি' আছে। আমাদের চৌকিদারী ট্যাক্স বসাতে তশীলদার সাহেব বেইমানি করেছে; রবিয়ারও বারো আনা, রাবুলাল চাপরাসীরও বারো আনা। তা কি করে হয়? সকলে অবাক হয়ে যায় ঢোঁড়াইয়ের সাহসে। হাকিমের সঙ্গে কথা বলছে; দারোগার সম্মুখে; আবার তশীলদার সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ! এই বুঝি হাকিম তাকে তাড়া দিয়ে ওঠেন। হাকিম জিজ্ঞাসা করেন "তশীলদার কে?"

"ফুদনলাল, মাহীটোলার হুজুর।"

বাবুলাল চাপরাসীর গলা শোনা যায়—"এ ছোকরাতো মাত্র কদিন হ'ল ঘর তুলেছে। এ কি জানে 'চৌকিদারী'র (৬) সম্বন্ধে?"

হাকিম বাবুলালকে তাড়া দেন—"তোমাকে কে জিজ্ঞাসা করেছে?" তারপর ঢোঁড়াইকে বলেন "লিখে দরখাস্ত দিও আমার কাছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু খবরদার, সরকারের খেলাপ কিছু দেখলে, তাৎমাটুলির একটা লোকও থাকবে না, জেলের বাইরে।"

এস. ডি. ও. সাহেব হাতের ঘড়ি দেখেন। একপাল উলঙ্গ ছেলে, এতক্ষণে সাহসে ভর করে, পুলিস ভ্যানের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। টপ টপ করে মোটরের এঞ্জিন থেকে জল পড়ছে মাটিতে, ছেলেরা বলছে 'পিট্রৌল' পড়ছে, 'দরদের' ওষুধ (৭)।

গাড়ী চলে যায়। লু বাতাসে তার চাকায় উড়োনো ধূলো, মরনাধারের দিকে ছুটে যায়, বোধ হয় রাতের কলঙ্কের দাগ ঢাকবার জন্য।

লু বাতাসের মধ্যে দিনের বেলায় কারও বাড়ি রান্না হবে না—খড়ের ঘরে আগুন লেগে যেতে পারে! তাৎমাটুলির কেউ আর সেদিন কাজে বেরোয় না। সারাদিন সকলে মিলে সম্ভব অসম্ভব অনেক রকম আলোচনা করে। গানহী মহারাজ, পুরানো গানহী বাওয়া হঠাৎ কবে থেকে মহাৎমাজী হয়ে গিয়েছেন।... মাস্টার সাহেবের বেটা কাল এসে মরনাধারের কাছে বলে গিয়েছেন যে 'রংরেজ' সরকারের জন্যই তাৎমাদের রোজগার নেই। অনেকদিন আগে নাকি 'সরকার' তাৎমাদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছিল। দেখ কাণ্ডখানা একবার!

তবে একটা সুবিধে বুড়ো আঙ্গুল না থাকলে—কেউ আর জোর করে সাদা কাগজে আঙ্গুলের ছাপ নিতে পারবে না; না অনিরুধ মোক্তার, না সাওজী, না জমিদারবাবু।… …তারপর থেকেইতো তারা কাপড় বুনবার কাজ ভুলেছে।…… কলিযুগে

'নৃপ পাপপরায়ণ ধর্ম নহী।

করি দণ্ড বিড়ম্ব প্রজা নিতঁহী॥' (৮)

সাধে কি আর মহাৎমাজী 'রংরেজ'এর নিমক খেতে বারণ করেছেন। সব দেখতে পান তিনি। ঐ রংরেজ-এর নিমক ছিল বলেই না কপিলরাজার জামাইটা তাৎমাটুলির বুকের উপর বসে, গরুর চামড়ার কারবার করতে পেরেছিল।……

আচ্ছা, আচ্ছা ছাড় এখন এসব কথা। দেখছিস তো গাঁয়ের খবর দারোগার কাছে চলে যায়। আচ্ছা পরশু রাতের খবর কে পুলিশকে দিল বলতে পারিস? ধাঙ্গড়টোলার কেউ নয়ত? রতিয়া ছড়িদার, আর বাসুয়া নায়েবকে হারিয়া দেখেছে 'দফাদারের' সঙ্গে জিরানিয়াতে। দফাদারের সঙ্গে আবার তাদের কি কাজ থাকতে পারে? সে'দুটো গেল কোথায়? সত্যিই তাদেরতো সকালবেলা থেকে দেখা যাচ্ছে না।

হারিয়া বলে যে আমি কাল জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাদের। তারা বলে যে চৌকিদারী খাজনার কথা বলছিলাম।

এসব আবার কি গাঁয়ের মধ্যে! পঞ্চায়তীকে না জানিয়ে চৌকিদার দফাদারের সঙ্গে মেলামেশা! ঢোঁড়াইয়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে দফাদারকে খবর দেবে? হোক না সে নায়েব। এ মামলা নেবে কি না বল, মহতো। 'সাফ সাফ' বল এ মামলা পঞ্চায়তীতে রাখবে কি না—'ঘসর ফসর' (৯) কথা নয়। কেবল লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়ার পঞ্চায়তী করেন সব।

সকলেই ঢোঁড়াইকে সমর্থন করে। গ্রামের সকলের মুখচোখের ভাব, আর কথাবার্তার ধরণ দেখে, ভয়ে মহতোর মুখ শুখিয়ে যায়। আর ঐ সেদিনের ভুঁইফোঁড় ছোকরা ঢোঁড়াই, সেই কি না গাঁয়ের লোকের 'মুখিয়া' (১০) হয়ে

আগিয়ে আসে! নতুন পয়সার গরমে ফুলে 'ভাঁথী' (১১) হয়েছে ছোঁড়াটা। বললাম গুদরকে একটা কাজ দিতে মাটিকাটার, সে বেলা পারলেন না। গুদরকে আমার পাঠাতে হ'ল মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের সঙ্গে রাজমিস্ত্রির মজুরি করতে। আমার 'পুতহু' (১২) ঐ 'মইয়েচড়া' মুঙ্গেরিয়া তাৎমা (১৩) মেয়েদের সঙ্গে এক হয়ে গেল। কনৌজী তন্ত্রিমাছত্রিদের ঘরের বৌ শহরে মইয়ে চড়তে আরম্ভ করেছে—এই রকম দুর্দিন পড়েছে। এর মধ্যে আবার থানা পুলিশের ঝঞ্ঝাট করবার দরকার কি!······সেবারের মত আবার মহাৎমাজীর চেলারা তাড়ির দোকানে গোলমাল করবে নিশ্চয়। এই 'রুখা'র দিনে (১৪) এ আবার আর এক ফ্যাসাদ!···যাকগে! লোকের হাতে পয়সা থাকলে তবে তো তাড়ির দোকানে যাবে।······

ঢোঁড়াইয়ের সব থেকে বেশী আনন্দ যে সে আজ হাকিমের সঙ্গে কথা বলেছে। বলবার সময় সে একটুও ঘাবড়ায়নি। যা যা ভেবেছিল সব গুছিয়ে বলতে পেরেছে। হাকিম তার কথা শুনেছেন; আর বাবুলালটা কথা বলতে গিয়েছিল সেটাকে এক ধমক দিয়েছেন।······এখন ঢোঁড়াই, যে কোন হাকিম আসুন না, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে। আজ সে আবার লোকের চোখে বাবুলাল চাপরাসীর চাইতেও উঁচুতে হয়ে গিয়েছে। রামজীর কৃপায় তার জীবনের একটা আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হয়েছে। রতিয়া ছড়িদার আর বাবুয়া নায়েবের ব্যবহারে মনটা খারাপই হয়ে গিয়েছিল ঢোঁড়াইয়ের। সেই সব কথাই ভাবতে ভাবতে সে বাড়ির দিকে আসে; রামিয়ার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা হয়নি!

রামিয়া বলদের নাদায় জল ঢালছে! বাইরে এসে এসব কাজ করতে মানা করলেও সে শুনবে না।

ওটা কে? সামুয়র না!

"এই যে বলদের মালিক এসে পড়েছেন। যাচ্ছিলাম বাড়ি। রাস্তা থেকে হঠাৎ বলদ জোড়ার উপর নজর পড়ল।"

তারপর একথা সেকথা হয়।····তোমাদের পাড়ায়তো দেখি ভীষণ কাণ্ড। আগে জানলে আমি আজ সাহেবের কুঠিতেই থেকে যেতাম। আমার সাহেবও চলে যাচ্ছে আসছে সপ্তাহে। এই সব মহাৎমাজীর হল্লার জন্য না কি, কে জানে।······

তা হলে অনেক টাকা পাচ্ছ, বলো ?

সামুয়র বলে, শুনেছি তো সাতশো টাকা দেবে। ভারী খপসুরৎ তোমার বলদ জোড়া।……

তুমিও কেনো এই রকম গাড়ি-বলদ।……

"পাতলী কমরোয়া"র (১৫) গান গাইতে গাইতে সামুয়র ধাঙড়টুলির পথ ধরে।

অকারণ বিরক্তিতে ঢোঁড়াইয়ের মন তেতো হয়ে ওঠে।

রামিয়াই প্রথম কথা বলে। "আজ বাওয়াকে দেখলাম না থানে।" রামিয়া জানে যে বাওয়ার কথায় ঢোঁড়াইয়ের মন সব সময়ই সাড়া দেয়। সত্যিই তো সারাদিনের হট্টগোলের মধ্যে বাওয়ার কথা একবারও ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়েনি। গেল কোথায় ? পুলিসের গাড়ী দেখে ভোরেই কোথাও পালিয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু এতক্ষণ তো ফেরা উচিত ছিল।

এখনই ফিরে আসবে।

বাওয়ার খোঁজে ঢোঁড়াই কয়েকবার থানে যায়। রামিয়ার সঙ্গে গল্প আজ ভাল জমে না। সন্ধ্যাব পর পশ্চিমা বাতাস থামলে, থানে কাঠ জ্বেলে আগুন করে রাখে। 'মারুয়া' (১৬) ঠেসে 'লিট্টি'র লেচি পাকিয়ে রাখে। এই বাওয়া এল বলে! পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

রামিয়া এসে ডাকে "বাওয়া এখনও তো এল না। তুমি খেয়ে নাওনা বাড়ি এসে।"

"ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি খুব ?"

রামিয়া লজ্জিত হয়ে যায়।

গঙ্গাস্নানে যায় নাইত ? মিলিট্রিঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ পাওয়ার জন্য থেকে যায় নাইত ?

রামিয়ারই প্রথম নজর পড়ে, বাওয়ার কম্বলটাত নাই। কম্বল নিয়ে কোথায় যাবে এই গরমের মধ্যে। নিশ্চয়ই কোথাও বাইরে গিয়েছে, দিন কয়েকের জন্য। তা যাওয়ার সময় বলে গেল না কেন ?……

টীকা :—

(১) রেকর্ড অভ রাইটস্-এ লেখা থাকে "গৈর মজরুয়া আম"—সর্বসাধারণের সম্পত্তি

(২) 'সার্ভে'—সরকারী Cadastral Survey.

(৩) অনাবাদী

(৪) হ্যাট্

(৫) সংঘর্ষ

(৬) 'চৌকিদারী'—স্থানীর ভাষায় চৌকিদারীর অর্থ চৌকিদারী ট্যাক্স

(৭) পেট্রোল—ব্যথার ওষুধ

(৮) রাজা পাপপরায়ণ, তাহার ধর্ম নাই; প্রজাদিগকে দণ্ড দিয়া বিড়ম্বনায় ফেলে। (তুলসীদাস হইতে)।

(৯) বাজে কথা

(১০) মুখিয়া—(মুখ্য শব্দ হইতে), প্রধান, প্রমুখ

(১১) ভাঁথী—হাপড়

(১২) পুত্রবধূ

(১৩) তাৎমাটুলির তাৎমারা নিজেদের বলে কণৌজী তাৎমা, আর যে তাৎমারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে তাদের বলে মুঙ্গেরিয়া তাৎমা। মুঙ্গেরিয়া তাৎমাদের মেয়েরা রাজমিস্ত্রীর কাজ করার সময় মইয়ে চড়ে বলে তাৎমাটুলির বোটাহারা তাদের অবজ্ঞার চক্ষে দেখে।

(১৪) রুক্ষ শব্দ হইতে। শুখনো গরমের দিনে। এ অঞ্চলে লোকের বিশ্বাস যে, গরমের সময় তাড়ি খাইলে শরীর ভাল থাকে।

(১৫) 'সরু কোমর'টির গান।

(১৬) মারুয়া—গরীবের খাদ্য এক প্রকার শস্য। লিট্টি—রুটির ন্যায় খাদ্যদ্রব্য।

ঢোঁড়াইয়ের আত্মদর্শন

বহুদিন প্রতীক্ষার পরও বাওয়া ফেরে না। কি জানি কেন, ঢোঁড়াই নিজেকে এর জন্য দায়ী মনে করে। কিন্তু সত্যিই কি সে দোষী? বাওয়ার উপর ভালবাসা তার একটুও শিথিল হয়নি; এক বিন্দুও না। বাওয়ার উপর কর্তব্যের ত্রুটি সে করেনি। তার বিয়ে করায় বাওয়ার আপত্তি ছিল না। তবু সে বোঝে যে

বাওয়ার চলে যাওয়ার সঙ্গে তার বিয়ের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে; কিন্তু এমন দোষ সে কি করেছে যে বাওয়া যাওয়ার আগে তার সঙ্গে কোন কথা বলে গেল না।

রামিয়া বলে—আমার জন্যই হয়ত বাওয়া চলে গেল। ঢোঁড়াই কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে দেয়। সত্যিই রামিয়াকে বাওয়া পছন্দ করতে পারেনি। না হলে তার হাতের ছোঁয়া খেল না কেন? কেন বিয়ের পর থেকে বাওয়া অন্যরকম হয়ে গেল। এই ধূলো রোদ্দুরের মধ্যে এখন কোথায় সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। সেই ছোটবেলা থেকে, ঢোঁড়াই বাওয়াকে দেখেনি, এমন বোধহয় এর আগে একদিনও' হয়নি! তা ছাড়া এখানে বাওয়া থাকলে, সে ছিল এক কথা; দেখা না হলেও মনের মধ্যে স্বস্তি ছিল যে, যখন ইচ্ছা দেখা করতে পারব। বাওয়া কিছু না করলেও ঢোঁড়াইয়ের মনে ভরসা ছিল যে, তার মাথার উপর একজন আছে। তার সংসারের বিপদ আপদের সময় বাওয়া নিশ্চয়ই এসে দাঁড়াত তার পাশে।······এইসব কথা ভাবলেই ঢোঁড়াইয়ের মন খারাপ হয়ে যায়।····· চলে যাওযাব দিন এসেছে, ঢোঁড়াইয়ের দুনিয়ায়। শনিচরাটা চলে গেল, ধাঙ্গড়টুলি ছেড়ে; সেও যাওয়ার আগে দেখা কবে গেল না। এতোয়ারীরা যেদিন এসেছিল, চৌকিদারী খাজনার দরখাস্তে মিসিরজীব কাছে বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে, সে দিন তার কাছেই শুনেছে ঢোঁড়াই এ খবর। যাওয়ার আগে শনিচরা আর তার বৌয়ের কি কান্না! কি কান্না! বাড়ি ঘর দোর দেখে আর ডুকরে ডুকরে কাঁদে।·····শনিচরার চলে যাওয়ার খবরেও সেদিন ঢোঁড়াইয়ের প্রাণের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল।······শনিচরা বলেই পেরেছে। ঢোঁড়াই তাৎমাটুলি ছেড়ে অমন করে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। বড় ভাল লোকটা ছিল। দিনের পর দিন তারা একসঙ্গে কাজ করেছে 'পাক্কী'র উপর। কাজের মধ্যে দিয়ে তারা আপনার হয়ে উঠেছিল। সে সম্বন্ধ কোনদিন যাওয়ার নয়।······এতোয়ারীই সেদিন খবর দিয়েছিল যে, সামুয়র বলেছে যে সাহেবের কাছ থেকে পাওয়া টাকাটা দিয়ে সে ভাড়ার টমটম কিনবে,—গরুর গাড়ী কিছুতেই নয়; ঢোঁড়াইয়ের থেকে তার বড় হাওয়া চাই; তোর সঙ্গে তার কি এত রেষারেষি বুঝিও না। এখন কিনলে হয় ঘোড়া আর টমটম; তার আগেই আবার নেপালে জুয়ো খেলে টাকাটা উড়িয়ে দিয়ে না আসে; সব গুণইতো আছে

সামুয়রটার।······ঢোঁড়াই ভাবে যে সকলেই তাকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, পাড়ার মাতব্বরগুলো পর্যন্ত। সেদিন চৌকিদারী খাজনার কথাটা হাকিমকে বলার পর থেকে বাবুলাল আর দুখিয়ার মা তার বাড়িতে আসে না। মহতোর তো কথাই নাই। রতিয়া ছড়িদার, আর বাসুয়া নায়েব, সেই পুলিশ আসার দিন থেকে তার সঙ্গে কথা বলে না।······থাকার মধ্যে তার আছে রামিয়া—, রামপিয়ারী। রামিয়ার মধ্যে সে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর সব কিছু, আয়নায় হঠাৎ আলো পড়ার মত মধ্যে মধ্যে সেখানে ঝলক ফেলে, আবার তখনি কোথায় তলিয়ে যায়। রামিয়ার সব ভাল। হুঁকোটা ধরার মধ্যে, তামাকের ধোঁয়াটুকু ছাড়ার মধ্যেও তার অন্য তাৎমানীদের থেকে বিশেষত্ব আছে; ভারী সুন্দর লাগে ঢোঁড়াইয়ের। আর ঠাট্টা যা করতে পারে একেবারে হাসতে হাসতে "নাখোদম" (১) কবিয়ে দেয়। ঢোঁড়াইয়ের কাছে সামুয়রকে বলে মর্কট। এমন মজার মজার কথা বলবে! মর্কটের সঙ্গে একটু নাকি তফাৎ করে দিয়েছেন ভগবান; অন্যমনস্কভাবে গড়তে গড়তে লাল রংটা মুখেই পড়ে গিয়েছে ভুলে।··· দুজনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই এত হাসি, এইটাই ঢোঁড়াইয়ের কেমন কেমন যেন লাগে। বলে রামিয়াকে বাড়িতে থাকতে; কিন্তু কে কার কথা শোনে! চব্বিশ ঘণ্টা ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে এখানে ওখানে; হাসিমস্করা 'ফৌজী' কুয়োতলায়; বেটাছেলে দেখলেও শরম নেই। কি রকম যেন! আর ঢোঁড়াই অন্য সব জায়গায় জোর দেখাতে পারে; রামিয়ার কাছে সে একটু নরম। 'পচ্ছিমবালী' মেয়ে; বুদ্ধিতে তার চাইতে বড়; কত জোর করা যায় তার উপর। কিন্তু তার মন রামিয়ার মধ্যে ডুবে থাকলেও তার দৃষ্টির প্রসার বাড়ছে আস্তে আস্তে; তার জগৎটা বড় হয়ে উঠছে, গাড়ী বলদ কিনবার পর থেকে। পাক্কীতে কাজ করার সময়, দূরের 'বটোহী'র সঙ্গে দেখা হত তার পথের উপর। এখন সে নিজেই গাড়ীতে মাল বোঝাই করে কত দূরে দূরে চলে যায়, পাঁচ কোশ, সাত কোশ, পুরুবে, পচ্ছিমে, কারহাগোলার গঙ্গাস্নানে, মঘৈলী, কুর্বাঘাটের মেলায়। 'জাত পাঁত' (২) আলাদা হলে কি হয়, সব জায়গায় লোকের হালত, একই রকম। তবে পচ্ছিমের গাঁগুলোতে মহাৎমাজীর 'হল্লা' আর পুলিশের হল্লাটা অন্য জায়গার চাইতে বেশী এই যা। মাতব্বররা ছাড়া, পাড়ার অন্য সকলে

এইসব দূর দূরান্তরের গ্রামের খবর শুনবার জন্য আসে তার কাছে, যখনই সে গাড়ী নিয়ে ফেরে।……

টীকা:—

(১) নাখোদম--নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে

(২) জাত

মহতোর বিলাপ

কিছুদিন থেকে দুনিয়া দরকারের চাইতেও বেশী তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। ঘটনার পর ঘটনার আঘাত লাগছে তাৎমাটুলির সমাজে, তাৎমাদের মনে। জিনিসটা আরম্ভ হয়েছে হঠাৎ, কবে থেকে তা ঠিক মহতোর মনে নেই; এই 'এক সাল দেড় সাল' হবে আর কি। লোকের মনে কিসের যে আগুন লেগেছে, কিসের যে স্রোত এসেছে চারিদিকে, মহতো তা বুঝতেই পারে না, তো তার সঙ্গে তাল রাখবে কি করে?

রোজ শহর থেকে নতুন খবর শুনে আসছে তাৎমাবা কাজে গিয়ে।…… 'অলোচী' (১) ঘোড়সওয়ার শহরের রাস্তায় টহল দিচ্ছে। পাদরী সাহেবরা চলে যাচ্ছে; এখন খালি একজন দেশী পাদরী থাকবে জিরানিয়াতে। কিরিস্তান ধাঙ্গড়গুলোর বিনা পয়সার দুধ বন্ধ হয়ে যাবেরে; পাদরী সাহেবগুলো ছিল তোদের গরু, দুধ দিত। ভেউ ভেউ করে কেঁদে নে, তোদের গরু চলে যাচ্ছে।……'কালোঝাব্বাবালী' পাদরী মেমদের (২) হাঁসপাতাল একেবারে 'সন্নাটা' (৩) দেখলাম আজ। ধাঙ্গরটোলার ছয়ঘর কিরিস্তান আবার হিন্দু হয়ে গিয়েছে; বলেছে আর গির্জায় যাবে না, পাদরী সাহেবরা চাকরি জুটিয়ে দেবে না, দুধ দেবে না, তবে খৃস্টান থাকবো কিসের জন্য। …সামুয়রটাও হিন্দু হয়েছে; মিসিরজী প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছেন তার; ভাগলপুর থেকে একজন টুপিওয়ালা সাধুবাবা এসেছেন এই কাজ করতে। প্রায় সব সাহেব চলে গেল; এইবার ধাঙ্গড় আর কিরিস্তানগুলো মজা বুঝবে; বাঁধ, এখন বাড়িতে বসে বসে রং বেরঙের 'খুশবুদার' ফুলের তোড়া। সামুয়রের

'শাম্পনী'টার (৪) রং কিন্তু চোখে ঝিকমিক্ ঝিকমিক্ করে লাগে। তশীলদার সাহেব বলতে এসেছিল, যে এবার আবার বাড়িতে বাড়িতে 'লমর' (৫) লিখতে হবে, লোক গোনার জন্য; সেবার তো লোক গোনবার পর গাঁয়ের আধখানা উজাড় হয়ে গিয়েছিল অসুখে; তবু, মন্দের ভাল যে, বেশীর ভাগই মরেছিল মুসলমান; এবারে দ্যাখ কি হয়। লোক গোনবার সময় কেউ কিছু বলিস না তশীলদারকে; করুকগে শালা যা করতে, পারে; এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে তো ওর বিরুদ্ধে 'চৌকিদারী'র (৬) দরখাস্ত দেওয়াই আছে। কি যে হল সে দরখাস্তের তা বুঝি না। কেন এখন যাক না ঢোঁড়াই তার পেয়ারের হাকিমের কাছে; একথা বল্লেই অনিরুধ মোক্তার বলে যে, মহাৎমাজীর হল্লার মধ্যে হাকিমের সময় নেই এসব দেখবার; যেমন সরকার, তার তেমনি হাকিম, ঠিকই বলে মহাৎমাজীর চেলারা।......সমাজে কেউ কথা মানবে না; কারও কথা কেউ শুনবে না, কি করে সমাজ চলে? ঢোঁড়াইয়ের দল বসে—কার কথা শুনবো? ঐ রতিয়া ছড়িদারের আর বাসুয়া নায়েবের? দুটোইতো দফাদারের 'খুফিয়া' (৭)। ছড়িদার আর বাসুয়া শুনছি আবার মাস্টার সাহেবের বেটার খেলাপে হাকিমের কাছে সাক্ষী দেবে। মাস্টারসাহেবের বেটা নাকি কলালীতে কার মাথায় মদের বোতল দিয়ে মেরেছে; ওরা নাকি তাই স্বচক্ষে দেখেছে। ঢোঁড়াইয়ের দল তাই তাদের উপর ক্ষেপে আছে। আরে রতিয়া ছড়িদার ত কোন ছার! আমি মহতো; আমারই হাতের, তেলের শিশি আসবার সময় তারা শুঁকে দেখলো; বলে যে গুদরের মায়ের জন্য তেলের শিশিতে তুমি রোজ সাঁঝে কি কিনে নিয়ে আস সবাই জানে। এই হল সমাজের ব্যবহার তাদের মহতোর সঙ্গে। আমার সঙ্গে আসিস 'ফুটানী ছাঁটতে'; কর দেখি দফাদার সাহেবের সঙ্গে লড়াই তবে না বুঝি হিম্মৎ! দেওয়া দেখি ডিস্টিবোডের ফৌজী ইঁদারাটার বিয়ে, তবে বুঝবো বুকের পাটা।......এই সেদিন বাবুভাইয়াদের কাছে কি অপ্রস্তুতই হতে হল পাড়ার লোকদের জন্য! এবার 'দশারায়' (৮), ভগবত্তির মুরতের ঘরে তাৎমা ধাঙড় চামার দুসাদ সকলকেই যেতে দিয়েছিল; বাবুভাইয়াদের ছেলেরা ডেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন সকলকে; কেবল ছত্তিসবাবুর বুড়হিয়া মাই যখন 'পুজো চড়াচ্ছিলেন', তখন 'ছত্তিসবাবুর

বেওয়া বহন' (৯) একখানা লম্বা মোটা সজনের ডাল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন— যতক্ষণ বুড়ী মাইজীর পূজো না হয়, ততক্ষণ তাৎমা ধাঙ্গড় দুসাধ কেউ এসেছ কি পিঠে ভাঙ্গবো এই ডাল। ঢোঁড়াইরা দল বেঁধে চলে এসেছিল সেখান থেকে। বাবুভাইয়াদের ছেলেরা পরে তাৎমাটুলিতে খোসামোদ করতে এসেছিল। তাদের আবার 'নেওতা' (১০) দিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। আমি কত বোঝালাম, বাবুভাইয়ারা বলছে সকলে। কখনওতো উঠতে পেতিস না 'ভগবত্তি থানে (১১), এবার উঠতে পেয়েছিস। কোন মাইজী 'পান চিরে দু টুকরো করেছে' (১২) আর অমনি অনর্থ বাধিয়ে তুললি। আরে ঢোঁড়াই, তুই রাজী হলেই তোর 'এই হাঁ তে হাঁ মিলানেবালা' (১৩) শাগরেদগুলো এখনই রাজী হয়। এই কথায় ফোঁস করে উঠলো সবগুলো। আচ্ছা বাবা যা ভাল বুঝিস তাই কর। বাবুভাইয়াদের কাছে তোদের টোলার ইজ্জৎ খুব রাখলি বটে! আবার আমাকে শোনানো হল যে, রতিয়া ছড়িদার মহাৎমাজীর চেলার খেলাপে সাক্ষী দেবে, তাতে টোলার ইজ্জৎ বাড়বে? সেটা বন্ধ করার মহতো তুমি না, আর বাবুভাইয়াদের পা চাটাবার মহতো তুমি।

······না, না, এ মহতোগিরিতে না আছে আগেকার মত পয়সা, না আছে সম্মান, না আছে এক মুহূর্তের শান্তি।······নায়েব ছড়িদারদের পর্যন্ত কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। তাদের মধ্যে কে যে কখন কোন দিকে বোঝা দায়। রামিয়ার সেই লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়ার ব্যাপারে সবাই চলে গিয়েছিল মহতোর বিরুদ্ধে; সেইজন্য মহতো সে কথাটাই পাড়েনি পঞ্চায়েতে। চৌকিদারী ট্যাক্সের ব্যাপারে সব নায়েবই বাবুলালের বিরুদ্ধে। মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে সব নায়েবই ছড়িদার আর বাসুয়ার বিরুদ্ধে।···· এখন কাকে হাতে রাখবো? কাকে সঙ্গে নিয়ে চলবো?··· আর সমস্যা কি একটা? তাৎমাটুলি থেকে লোক চলে যাচ্ছে। বতুয়ার বোনটা মুসলমানের সঙ্গে চলে গেল। হারিয়া মেয়েটার বিয়ে দিয়ে এসেছে, মালদা জেলায়, টাকার লোভে। আর বলছে যে সেইখানেই চলে যাবে চাষবাসের কাজ করতে। আমার নিজের ছেলে গুদর সে আজ আরম্ভ করেছে, মুঙ্গেরিয়াতাৎমা রাজমিস্ত্রিদের যোগান দেওয়ার কাজ। সেই হয়ত চলে যাবে মুঙ্গেরিয়াতাৎমাদের গাঁ

মারগামায়।……মুঠো থেকে সব পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কাকে সে আটকাবে? …এই আখোনা ঢোঁড়াইয়ের দল তো আবার এক নতুন গণ্ডগোল বাধিয়েছে। এই যে হরখুর বাপটা—যেটা ধোঁদলের ফুলে ভরা মাচাটার পাশে, তেল মেখে ল্যাংটা হয়ে পড়ে থাকত সারাদিন, তাকে গোঁসাই টেনে নিয়েছেন ক'দিন হল। বড় ভাল হয়েছে—তাৎমাটুলির বুড়ো বুড়ীরা তো মরতে জানে না। ডাইনের জোর ছোট ছেলেপিলেদের উপরই খাটে কি না! সেই পৈতা নেওয়ার পর থেকেই ঢোঁড়াইএর দল চেঁচামেচি করছে যে, 'তেরহমা' করবে 'তিরসা' নয় (১৪)। বুড়ো লোক না মরলে গাঁ শুদ্ধ লোক মাথা নেড়া করার সুযোগ পায় না। এতদিনের মধ্যে এক কেবল মরেছিল বুড়ো মহাবীরা, তা সে সাপের কামড়ে। তাই তার 'ক্রিরিয়া করম' কিছু দরকার হয়নি। এইবার এই ঢোঁড়াই শয়তানটার দল গোলমাল পাকাবে তেরো দিনের দিন। সেটি হতে দিচ্ছি না। কিসে থেকে কি হয় তার খবর রাখিস, এদিকে তো খুব ফরফর ফরফর করিস তোরা। পিতৃপুরুষকে 'জল চড়ানোতে' একটু এদিক ওদিক হয়েছে কি উদ্বাস্তু হয়ে যাবি সকলে; ঘরবাড়িতে বিনা আগুনে আগুন লেগে যাবে, কালো টিকের মতো দাগ হবে প্রথমে চালে, তারপর দেখবি সেখান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে; তাঁদের ঘাঁটাস না ঘাঁটাস না। আগে লেজ তুলে ছাখ এঁড়ে কি বকনা, তবে না কিনবি।………মহতো থই পায় না; এক বছরের মধ্যে সে এত বুড়ো হয়ে পড়ল নাকি?……যাকগে, মরুকগে, যা হবার তা হবেই। "ভুমহঁসন মিটহি কি বিধি কে অঙ্কা" (১৫)। তোমার জন্য কি বিধাতার লেখা বদলাবে?…… পঞ্চায়তীর জরিমানার টাকার হিসাব চায় গাঁয়ের লোকে! আশ্চর্য! রাতারাতি বদলে যাচ্ছে তাৎমাটুলি। মরনাধারের বালির মধ্যে যেন তার পা ধসে যাচ্ছে।………

হঠাৎ রতিয়া ছড়িদারের বৌ চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করে। মহতো উঠে দাঁড়ায়। মহতোর দুদণ্ড নিশ্চিন্দি হয়ে বসবার জো নেই আজকাল। নিশ্চয় ছড়িদার বৌকে মারছে, আগুন টাগুন লাগলে তো দেখাই যেত।

সকলে দৌড়ে যায় রতিয়া ছড়িদারের বাড়ি। তার বৌ কুপী ধরে সকলকে দেখায় যে, ছড়িদারের ভুরুর উপর খানিকটা কেটে গিয়েছে। এখনও

অল্প অল্প রক্ত পড়ছে। একটা বাঁশে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে শহর থেকে ফিরছিল ; একটু বেশী রাত করেই সে আজকাল ফেরে। যেই শহরের বাইরে কপিলদেওবাবুর আমবাগানটায় পৌছেছে, অমনি অজস্র ঢিল তার উপর এসে পড়তে আরম্ভ করে।······ছড়িদার কোন লোককে দেখতেই পায়নি, তা চিনবে কি ? তবে পায়ের শব্দ সে শুনেছে।

······মহাৎমাজীর চেলারা মাছমাংস পিঁয়াজ রসুন খায় না। তারা কি কখনও কারও গায়ে হাত তুলতে পারে ?······এই আবার এক নতুন কাণ্ড হল পাড়ার মধ্যে ! দেখিস ছড়িদার, তুই আবার দফাদারকে এসব বলিস না যেন।······ থানা পুলিসের কথা ভাবলেই মহতোর বুক শুখিয়ে যায় ভয়ে।··· নিশ্চয়ই ঢোঁড়াইয়ের দলের কাণ্ড এটা ! কিন্তু ঢোঁড়াই-টোড়াই সকলকেই তো দেখছি এখানে।······ছড়িদারের বৌ তখনও গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে—হারামীর দলের সব কটাকে, হাতে হাতকড়া পরাবো।····· বাইরে ঠুনঠুন করে ঘোড়ার গলার ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। সামুয়রটা গাড়ী নিয়ে বাড়ি ফিরছে ; এই তাৎমাটুলির পথ দিয়েই সে, রোজ ফেরে, মদের দোকান বন্ধ হওয়ার পর। ওঃ ! তাহলে অনেক রাত হল। চল্ চল্ সকলে। ছড়িদারকে ঘুমুতে দে। শ্যাওড়া গাছের দুধ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কাটাটার উপর ; কালই শুখিয়ে যাবে ঘা।

টীকা :—

(১) বেল্লুটি
(২) কালো ঘাগরা পরা পাদরী মেম
(৩) খালি, চুপচাপ
(৪) জিরানিয়ার ভাড়া গাড়ীর নাম
(৫) নম্বর (আদমশুমারির)
(৬) চৌকিদারী ট্যাক্সের
(৭) গুপ্তচর
(৮) দশহরা বা দুর্গাপূজায়
(৯) সতীশবাবুর বিধবা ভগ্নী

(১০) নেওতা—নিমন্ত্রণ

(১১) বাঙ্গালীদের দুর্গামণ্ডপ

(১২) স্থানীয় ভাষায় 'পান চিরে ছুটকেয়ো করা'—বাঙ্গলার পান থেকে চুন খসা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১৩) যাহারা সকল কথায় সায় দেয়।

(১৪) শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্মাদি মৃত্যুর তেরো দিনের দিন করবে না ত্রিশ দিনের দিন, তাই নিয়ে পৈতা নেওয়ার পর তাৎমা সমাজে বেশ মতদ্বৈধ হয়। এতদিন হইতে ত্রিশ দিনের দিন কাজ করাই চলে আসছিল। নতুন দ্বিজ হইবার পর স্থানীয় সকল জাতের মধ্যেই এই বিষয় লইয়া দলাদলি, মারামারি, থানা-পুলিশ পর্যন্ত হইয়াছে। নূতনের দল তেরো দিনেই কাজ করিতে চায়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মত।

(১৫) তুলসীদাস হইতে—তোমার জন্য কি বিধাতার লেখা বদলাবে।

তাৎমাটুলিতে ডাকপিয়নের দৌত্য

হিন্দু হওয়ার পর থেকে সামুয়রের সম্মান বেড়েছে তাৎমাটুলিতে, নাহলে ঘোড়ার গাড়ির মালিক হলেও কিরিস্তানকে কে পোছে। মহতো আর নায়েবরাও জল্পনাকল্পনা করে, একসময় ত হিন্দু ছিলই ওরা। জাত কি কারও যাওয়ার জিনিস। 'সোন-অ নহী জরইছে' (১), সোনা জ্বালালে পরিষ্কারই হয় আগের চেয়ে। লোকটাকে যত খারাপ মনে করত সকলে আগে, আসলে সে তত খারাপ নয়। সে সকালে যখন গাড়ি নিয়ে শহরে যায়, তখন মহতো নায়েব, ছড়িদার, যার সঙ্গেই দেখা হয় পথে, তাকে গাড়িতে চড়িয়ে নেয়। এর আগে তাৎমাটুলির কেউ কোনদিন জীবনে ঘোড়ার গাড়িতে চড়েছিল? তাৎমা ছেলেমেয়েরাও গাড়ি চড়ার জন্য পাগল। কিরিস্তান সামুয়রটা আজকাল সকলের 'সামুয়রভাই' (২) হয়ে উঠেছে। মহতোগিন্নী পর্যন্ত একদিন তাকে আমলকীর আচার খাইয়েছে। গাড়ি নিয়ে শহরে যাওয়ার আর ফিরবার সময় সে তাৎমাটুলি হয়েই যায়; আর সকলের সঙ্গে খুব আলাপ জমাতে চায় সে আজকাল। পাদরী সাহেবের সম্বন্ধে এমন সব রসের গল্প করে যে, সকলে হেসে ফেটে পড়ে।

"না, তুই বানিয়ে গল্প করছিস সামুয়র।"

'তবে শোন্ আর একটা।' এই বলে সে কালো ঘাগরা-পরা মেম-পাদরীদের নিয়ে আরও একটা অবিশ্বাস্য গল্প বলে।

সে যখনি গাড়ি নিয়ে এ-পথ দিয়ে যায়, একবার হেঁকে যায়—"ঢোঁড়াই বাড়ি আছিস নাকি ?"

রামিয়া ভিতর থেকে জবাব দেয়, "না, সে গরুর গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে সেই সকালে; এখনও ফিরবার নাম নেই।"

ঢোঁড়াই কাজে বেরিয়েছে কিনা, তা বাড়ির বাইরে গাড়ি-বলদ আছে কি নেই, দেখলেই বোঝা যায়। তবু তার একবার জিজ্ঞাসা করা চাই-ই চাই। জিনিসটা মহতোগিন্নীর চোখেও কেমন কেমন যেন ঠেকেছে।

সামুয়রের এত মাখামাখি ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। মজার মজার গল্প বলে সামুয়র যেরকম রামিয়াকে হাসাতে পারে, তেমনটি ঢোঁড়াই পারে না। একথা ঢোঁড়াই বোঝে, আর মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে যায় এর জন্য। তার গল্প শুনে রামিয়া হেসেছে বলে ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ে না; অথচ সামুয়রটা এমন করে গল্প করে যে, রামিয়া শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ে। এতটা বাড়াবাড়ি ঢোঁড়াইয়ের ভাল লাগে না। সামুয়রটা ছোটবেলা থেকে সাহেবদের ওখানে কত 'আণ্ডা চিড়িয়া উড়িয়েছে' বোধ হয় (৩)। সে কথা মনে করলেই ঢোঁড়াইয়ের গা ঘিন্ ঘিন করে। রসুন হজম হওয়ার পরও ঢেকুরে রসুনের গন্ধ থাকে, আর ঐ সামুয়রটা কত অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েছে আগে; তার কি আর কিছু ওর শরীরে এখনও নেই। আর সেটাকে নিয়ে এখন এত মাখামাখি।...

রামিয়াটা আবার একা-একা রয়েছে।

ছড়িদারের বাড়ি থেকে ঢোঁড়াই কত কি ভাবতে ভাবতে আসে।

বাড়ির দুয়ারে সামুয়র গাড়ি থামিয়েছে। তাই হঠাৎ ঘোড়ার গলার ঘুঙুরের শব্দটা আর শোনা যাচ্ছিল না।

রামিয়াই প্রথম কথা বলে, "এই শোন এর কাছ থেকে; ডাকপিয়ন তোমাকে খুঁজছিল।"

"ডাকপিয়ন, কেন ?"

সামুয়র বলে, ডাকপিয়ন তাকে ঢোঁড়াই দাসের কথা জিজ্ঞাসা করছিল শহরে। তোমার নামে 'মানি-আটার' (৪) আছে।

'মানি-আটার ?'

'হাঁ, হাঁ, টাকা।'

ডাকপিয়নে আবার টাকা দেয় নাকি ? ঢোঁড়াই কি করবে ভেবে পায়না। টাকা কে পাঠাবে? কত টাকা, তাও সামুয়র বলতে পারে না। কেবল ডাকপিয়ন জিজ্ঞাসা করছিল তাই বলতে পারে।

সামুয়র চলে গেলে রামিয়া জিজ্ঞাসা করে "বাওয়া পাঠায় নি-ত ?"

সকলেরই সে কথা মনে হয়েছে, ঢোঁড়াই আর সামুয়রেরও। টাকার কথা উঠলে ঢোঁড়াইয়ের অন্য নাম কি মনে পড়তে পারে? ঢোঁড়াই কেন, সব তাৎমাই জানে যে, রোজগার করে হয়, আনা—টাকা নয়। আর টাকা আসে লোকের দৈবাৎ—রামজীর কৃপাদৃষ্টি হলে। বাওয়া পাঠিয়েছে; নিশ্চয়ই বাওয়া। বাওয়া এখনও তাকে মনে রেখেছে তাহলে।

তাৎমাটুলিতে সাড়া পড়ে যায়—'মানিআটার, মানি-আটার!' মহতো নায়েবদের বুকের ভিতর করকর করে—ঢোঁড়াইটা আরও মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো বুঝি এবার। 'ডাকিয়া' (৫) আনাগো ঢোঁড়াই পাড়ার ভিতর।

উঠন-ভরা ঝোটাহার দল সসম্ভ্রমে রামিয়ার গল্প শোনে। সে রাত্রে রামিয়া কি ঢোঁড়াই, কেউই ঘুমুতে পারে না। সারারাত তারা টাকার কথা, আর বাওয়ার কথা বলে কাটিয়ে দেয়।

দিনকয়েক পরে ডাকপিয়ন আসে সেই সন্ধ্যা বেলায়। মিসিরজী তখন পিয়নের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ফিরবার যোগাড় করছেন। বাবুলালের বাড়ি থেকে কাজললতা আসে। পিয়ন তিনটি টাকা থলির ভিতর থেকে বের করে দেয়, আর 'মানিআটার' ছিঁড়ে একটুকরো কাগজ দেয়।

'ওলায়তী লণ্ঠনের' (৬) জন্য বাওয়া তিন টাকা পাঠিয়েছে অযোধ্যাজী থেকে। আর কিছু লেখা নেই কাগজে। বাওয়ার হাতের ছোঁয়া চিঠি—ঢোঁড়াই কত রকমে উল্টে-পাল্টে দেখে। কত ছোটবেলার কথা তার মনে হয়। রামিয়ার

অলক্ষ্যে কাগজখানা শুঁকে দেখে—বাওয়ার জটার গন্ধ পাওয়া যায় কিনা তাতে। তারপর সযত্নে সেখানা রামিয়ার তৈরি বেনাঘাসের কাঠাতে রেখে দেয়।

মহতো বলে, "বড় খরচার রাস্তা—অর্থাৎ লণ্ঠন জ্বালতে বড় খরচ। বাওয়া তোর ভাল করল কি মন্দ করল বলা শক্ত।"

ছড়িদার সায় দেয়, "যাকে জেরবার করতে হবে, তাকে নাচিয়ে দিয়ে হাতি কিনিয়ে দেয় জমিদারবাবুরা। তারপর সামলাও তার খরচা।"

হারিয়ার ছেলে বলে, হাঁ এসব হচ্ছে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে কিনে রাখবার জিনিস। তাহলে দশের কাজে-কর্মে একটু উপকার হয়। ফোঁস করে ওঠে ছেলে-ছোকরার দল। "আরে রাখ্। পঞ্চায়তের সতরঞ্চি কিনবার কথা আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি, তা আজ পর্যন্ত কেনা হল না। আর "ওলায়তী লাণ্টেম" জ্বালিয়ে—"যুগীরা আর বলবাহী" (৭) নাচ নাচবে পঞ্চরা। এত টাকা জরিমানা ওঠে, কি হয় সে সব?"

মহতো এ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চায়।

"ঢোঁড়াই, তাহলে একটা ভাল করে দেখেশুনে লণ্ঠন কিনিস। কাঁচটা বাজিয়ে নিবি—ঠনন্। ঠনন্।"

"আমি কি অত শত চিনি? তা তোমরাই চল না কেন মহতো নায়েবরা, কাল সকালে বিলিতি লণ্ঠনের সওদা করে দিতে।"

রতিয়া ছড়িদার তার ফ্যাটা-বাঁধা ভুরুর নীচের চোখটা দিয়ে মহতোকে কি যেন ইসারা করে।

"না না, কাল সুবিধে হবে না আমাদের। একটা কাজ আছে।" ...

—আরে ফটফট করিস, তোরা আমার হাঁটুর বয়সী। আমার মাথার চুলটা রোদ্দুরে পাকেনি। আমাদের সরাতে চাচ্ছিস কাল সকালে হরখুর বাপের 'তেরহাঁ' (৮) করার মতলবে; সেটুকু আর বুঝি না? ...

"ঢোঁড়াই তুইই বরঞ্চ যাস সামুয়রের গাড়িতে, কাল ভোরে ও যখন কাজে যাবে। ও সাহেবদের বাড়িতে কত ওলায়তী লাণ্টেম জ্বালিয়েছে। আর ছত্তিস বাবুর দোকানে গাড়িতে করে গেলে জিনিসটা দেবে মজবুত।"

টীকা:—

(১) 'সোনা জ্বলেনা'—সোনা জ্বালালে আরও পরিষ্কার হয় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়

(২) সামুয়র দাদা

(৩) মুরগীর ডিম আর মাংস খেয়েছে

(৪) মনি-অর্ডার

(৫) ডাকপিয়ন

(৬) বিলাতী লণ্ঠন (ডিজ লণ্ঠন)

(৭) ঝুমীরা আর বলবাহী দুই প্রকার পল্লী নৃত্যের নাম

(৮) মৃত্যুর তেরো দিনের দিন শ্রাদ্ধাদি করার নাম 'তেরহঁা'

তেরহঁা তিরসার দ্বন্দ্ব

মহতোর কথামত ঢোঁড়াই সামুয়রের সঙ্গে লণ্ঠন কিনতে যায় বটে; কিন্তু সকালে নয়, বিকেলের দিকে। সকাল বেলা কি ঢোঁড়াই যেতে পারে? বুড়োরা নিজেদের যতই চালাক ভাবুক, তারা 'আঙুল উঠোলেই' (১) ঢোঁড়াইয়ের দল তাদের মতলব বুঝতে পারে।

যাস না ঢোঁড়াই খবরদার সকালের দিকে। তাহলে পাঁচ-পাঁচটা বুনো মোষের তাল সামলানো—পাঁচটা কেন, ছড়িদারকেও ধর, ছটা—সে আমাদের দ্বারা হয়ে উঠবে না।

পরের দিন সকালে ঝগড়া-ঝাঁটি, গালাগালির মধ্যে মাথা নেড়া করবার পর্ব শেষ হয়। তাৎমাদের 'কিরিয়াকরম'এর নাপিত পুরণকে মহতো নায়েবরা বারণ করে দিয়েছিল, হরখুর বাপের 'তেরহঁা'তে কারও মাথা নেড়া করতে। ঢোঁড়াই ধরে নিয়ে আসে মরগামার নাপিতের ছেলেটাকে।

—সে ছোকরা নাপিতটা কি ঢোঁড়াই না থাকলে আর কারও কথা শুনতো! —ঢোঁড়াই গাড়ি বোঝাই মাল নিয়ে গিয়েছিল কুশীস্নানের মেলায়। মেলায় দেখা এই নাপিতের ছেলেটার সঙ্গে। তার মেলাতে কেনা 'চাক্কী' (২) ঢোঁড়াই গাড়িতে করে এনে পৌঁছে দিয়েছিল তার বাড়িতে, ভাড়া না নিয়ে। সেই নাপিত কি এখন ঢোঁড়াইয়ের কথা না রেখে পারে?

মরগামার মুঙ্গেরিয়াতাৎমাদের পুরুতকেও ঢোঁড়াই ঠিক করে রেখেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা দরকার হয়নি। মিসিরজীই রাজী হয়ে গিয়েছিল পূজো করাতে। রতিয়া ছড়িদার মিসিরজীকে ভয় দেখিয়েছিল যে থানে রামায়ণ পাঠ বন্ধ করিয়ে দেবে। ঢোঁড়াই জবাবে বলেছিল, দফাদারকে বলে বন্ধ করাবে নাকি রামায়ণ পাঠ, ছড়িদার? সকলে হেসে ওঠায় ছড়িদার আর ভাল করে কথাটার উত্তর দিতে পারে নি।

ভাগ্যে সামুয়রের সঙ্গে গিয়েছিল লণ্ঠন কিনতে ঢোঁড়াই। না হলে তো ঠকেই মরেছিল—সামুয়র সঙ্গে ছিল বলেই না, সে বলে দেয় যে পলতেটাতে বড় ঠকায় দোকানদারেরা; নীল 'কোর' (৩) ওয়ালা পলতে নিবি। সেই রাতে সামুয়র বিলাতী লণ্ঠনটি জালিয়ে দেয় ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে। ভিড় বেশি হয়নি। মহতো নায়েবের দল চটে আছে; তারা ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে আসতেই পারে না। আর ঢোঁড়াইয়ের দল ছিল হরখুর বাড়ি, 'তেরহী'র ভোজের আয়োজনে ব্যস্ত।

রামিয়া বলে, "একেবারে দিনের মত আলো হয়েছে, না?"

সামুয়র ঢোঁড়াইকে বলে—"এমন আলো কিনলি ঢোঁড়াই একেবারে দোকানের আলো। এবার খুলে দে একটা দোকান। তোর বৌ হবে মুদিয়ানী; সওদা ওজন করবে, 'রামে রাম, রাম; রামে-দো দো; দুয়ে তিন তিন'"

রামিয়া হেসে লুটিয়ে পড়ে।

সামুয়রের এসব রসিকতা ঢোঁড়াইয়ের একটুও ভাল লাগে না। কিছু বলতেও পারে না; এত কষ্ট স্বীকার করে লণ্ঠন পছন্দ করে দিয়েছে। বাওয়ার কথা ঢোঁড়াইয়ের মনে পড়ছে। তারই দেওয়া বিলাতী লণ্ঠনে ঢোঁড়াইয়ের আঙিনা আলো হয়ে গিয়েছে। তারই দেওয়া তো সব—বাড়ি, ঘর, গাড়ি, বলদ, রামিয়া, ঢোঁড়াইয়ের আপন বলতে যাকিছু আছে এ দুনিয়াতে। রামজীর রাজ্যে গিয়েও বাওয়া তাকে ভুলতে পারেনি। আর সে বাওয়ার কথা ক'দিন ভেবেছে? এই সামুয়রের কথায় খিলখিল করে হাসা মেয়েটার জন্য, গেল এক মাসের মধ্যে, তার একবার গোঁসাই থানে যাওয়ার কথাও মনে পড়ে নি।

—আগে দেখেছি, এ-মেয়ের থানে পিদিম দেওয়ার সে কি ধুম। এখন সে

কথা মনেও পড়ে না। না, না, মিছামিছি সে রামিয়ার উপর দোষ দিচ্ছে; উঠনের তুলসীতলায় তো সে রোজই পিদিম দেয়। বাড়ির বাইরে যেতে তো সেই মানা করে রামিয়াকে।

সামুয়র কি যেন একটা মজার গল্প করছে; রামিয়াটা হাঁ করে গিলছে কথাগুলো। ঢোঁড়াই যদি অমন গল্প করতে পারত।

হঠাৎ সে আলো নিয়ে ওঠে।

"যাই বাওয়ার থানে একবার আলোটা দেখিয়ে, তারপর ওটা নিয়ে যেতে হবে হরখুর বাড়ির ভোজে। বাওয়ার দেওয়া জিনিসটা দশজনেব কাজে লাগুক।"

—পাড়ার লোককে নিজের বিলাতী লণ্ঠন দেখানোর ইচ্ছার কথাটা সে মনে মনেই রাখে।

অনেক লোক এসেছে হরখুব বাড়ির ভোজে। আট 'বাঁশের বাত্তি' (৪) লোক খেতে বসেছে। আরও জনকয়েক পরের দলে খাবে। মহতো নায়েবদের এরকম পরাজয়ের কথা ঢোঁড়াইরা কল্পনাও করতে পাবেনি। ঢোঁড়াইয়েরই জয়জয়কার। তারই নাম সকলের মুখে। তারই আনা নাপিত, তারই বিলাতী লণ্ঠন, সেইতো সব, বাকি লোকেরা তো 'পাহাড়ের আড়ালে' আছে।...... সকলের মুখে তার প্রশংসা শুনতে শুনতে ঢোঁড়াইয়ের নিজেকে মহতোর সমান বড় মনে হচ্ছে। চোখের সম্মুখে স্বপ্নরাজ্যের ছবি ভিড করে আসছে – মহতো মারা যাওয়ার পর পাড়ার লোকরা তাকেই মহতো করেছে; সে জরিমানার পয়সা দিয়ে তাৎমাটুলির জন্য সতরঞ্চি কিনেছে; ভজনের দলের জন্য ঢোলক কিনেছে; ভোজের জন্য প্রকাণ্ড কড়াই কিনেছে; রতিয়া ছড়িদারকে বরখাস্ত করে হরখুকে ছড়িদার করেছে; বাওয়া এসে দেখবে যে তার ঢোঁড়াই গাঁয়ের মহতো হয়েছে; রামিয়াটাকে আবার সকলে ডাকবে মহতোগিন্নী বলে; সত্যিই গিন্নী হয়ে উঠেছে সে আজকাল···

হঠাৎ মনে পড়ে যে, সে বেচারী একা রয়েছে ঘরে। তার মন উসখুস করে।

আঁচানোর পর ঢোঁড়াই বলে "আলোটা থাক এখন এখানে। পরের দলের খাওয়ার সময় লাগবে।"

"ঢোঁড়াইয়ের আর তর সইছে না"—সকলে হেসে ওঠে।

টীকা:—

(১) তারা কথা বলবার আগেই ঢোঁড়াইরা তাদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারে—এইরূপ অর্থে স্থানীয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

(২) চাক্কী—জাঁতা

(৩) কোঁর—বর্ডার; নীল বর্ডারযুক্ত।

(৪) সামাজিক ভোজের পঙক্তি ভোজনের সময় একখানি করিয়া সরু বাঁশের বাতা পাতিয়া দেওয়া হয়। ইহার উপর পা রাখিয়া সকলে উবু হইয়া বসে।

'তেরহাঁ' যজ্ঞের কুলপতির স্ত্রী-নিগ্রহ

ঢোঁড়াই হন হন করে বাড়ির দিকে আসছে। ভোজবাড়ির চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে অল্প অল্প। বেশ কুয়াশা হয়েছে চারিদিকে। কার্তিক মাস শেষ হয়ে গিয়েছে; পরশু বুঝি 'ছট্' পূজো (১)। রামিয়া হয়ত এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে; একা একা কতক্ষণ আর জেগে বসে থাকে। পায়ের নীচে বালি বেশ ঠাণ্ডা; শিশির পড়ে পথের ঘাস ভিজে উঠেছে। গা শির শির করছে ঠাণ্ডায়। হাতে তার ভোজ বাড়ির "মুখশুধ" (২)। ঘুমন্ত রামিয়ার মুখের মধ্যে সে এক টুকরো দিয়ে তারপর তাকে জাগাবে। ওটা কি সম্মুখে! হাতীর মত প্রকাণ্ড! তাই বল! গাড়ী, সামুয়রের! ঘোড়াটা খুলে রেখেছে; পথের ধারে চরছে। সামুয়র তাহলে যায়নি। এতরাতেও এখানে! তার রক্ত গরম হয়ে ওঠে। সেই সন্ধ্যায় এসেছে, এখনও গল্প করছে? একটু চক্ষু লজ্জাও তো থাকা উচিত। এত বুদ্ধি, আর এটুকু খেয়াল নেই রামিয়ার? পাড়ার লোকে কি বলবে; সামুয়রের মত 'লাখেড়া'র (৩) সঙ্গে একা গল্প করা এত রাত পর্যন্ত! দোরগোড়া থেকে দেখে যে উঠনে কেউ নেই। তাদের গল্প শোনা যাচ্ছে। কথার এক বিন্দুও বোঝা যায় না। রামিয়ার হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেই খিলখিল করে হাসি। ঢোঁড়াইকে নিয়েই হয়ত হাসাহাসি করছে।

বাড়ির ভিতর ঢুকে ঢোঁড়াই দেখে যে তারা দাওয়ার উপর বসে গল্প করছে।

তুলসীতলার পিদিপের ঝাপসা আলোতে তাদের পরিষ্কার দেখা যায় না। ঢোঁড়াই ঢুকতেই সামুয়র উঠে দাঁড়ায়। "তোর বৌকে পাহারা দিচ্ছিলাম। এই আসে, তো এই আসছে। তোর জন্য অপেক্ষা করছি কি এখন থেকে। বিলাতী লণ্ঠনটা যে রেখে এলি দেখছি?"

ঢোঁড়াই তার কথার জবাব দেয় না। গম্ভীর ভাবে মাটির কলসী থেকে জল নিয়ে পা ধুতে বসে।

"আচ্ছা, আমি যাই তাহলে এখন। অনেক রাত হয়েছে।"

ঢোঁড়াই বা রামিয়া কেউ উত্তর দেয় না।

সামুয়রের সঙ্গে গল্প করলে ঢোঁড়াই চটে, এ কথা রামিয়া ভালভাবেই জানে। কতদিন এ সম্বন্ধে ঢোঁড়াই তাকে বলেছে। রামিয়া সে সব কথা গায়েও মাখেনি। আজ কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের ভাব একটু যেন বেশী গম্ভীর গম্ভীর লাগে রামিয়ার। রামিয়া মনে মনে হাসে। শোবার পর একটু ভাল করে গল্প করলেই রাগ পড়ে যাবে বাবুর।

সামুয়র চলে যাওয়া মাত্র, ঢোঁড়াই গট্ গট্ করে ঘরে ঢোকে।

"রামিয়া!"

গলার স্বরেই রামিয়া বোঝে যে তার আন্দাজ থেকে আজ রাগটা একটু বেশী; 'তেরহাঁ'র লড়াই জিতে এসেছে কি না তাই।

"ফের যদি সামুয়রের সঙ্গে কথা বলতে কোনদিন দেখি, তা'হলে 'খাল' (৪) ছিঁড়ে নেবো।"

"কেন?"

'আবার বলা—'কেন'!" ঢোঁড়াইয়ের সর্বাঙ্গে আগুন লেগে যায়। রামিয়ার চুলের ঝুটি ধরে তার মুখে মাথায় কয়েকটি চড়চাপড় মারে। "পচ্ছিমা মিসিরজীর মত কথা, আর তাৎমাটুলির ঝোটাহার মত চাল চলন। মুখে মুখে জবাব! গরুর চাবুক মেরে ঠাণ্ডা করে দেব। উঠনে শানালোনা; দাওয়ায় উঠে ঢলাঢলি করছিলেন এতক্ষণ!"

রামিয়া প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। ঢোঁড়াই যে তার গায়ে হাত তুলতে সাহস করবে, সে কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। তার মাথায় রক্ত

চড়ে যায়। সে উঠে দাঁড়ায়। "আমাকে তোমাদের এখানকার 'ভূচ্চর' (৫) তাৎমাদের খুরপিধরা, কমজোর ঝোটাহা ভেবোনা। বাওয়ার পয়সায় ফুলে 'ভাথি' (৬)! 'ভিখমাঙ্গার (৭) পয়সা হয়েছে, আর বাবু-ভাইয়াদের মত বৌকে বন্ধ রাখতে সাধ গিয়েছে। তা করতে গেলে বাবুভাইয়াদের মত ব্যবহার শিখতে হয়"..... গালি দিতে দিতে রামিয়া বাড়ির বাহির হয়ে যায়। "এমন মরদের ঘর করতে বাপ-মা শেখায়নি" .....

"তোর মা বাপের কথা ঢের জানা আছে। থাকগে যা না সামুয়রের সঙ্গে। খানিক পরেই তো আবার 'কুত্তী'র (৮) মত ফিরে আসবি জানি।"......

গুটি গুটি পাড়ার লোক জমতে আরম্ভ করে। তাৎমাটুলিতে সব বাড়িতেই এমন হয়। বিশেষ করে ধানকাটনীর আগে 'ঝোটাহা'দের উপর মারধরটা একটু বেশী বাড়ে। পাড়ার লোকজন এসে দুজনকে থামিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই দিব্যি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে, যেন কিছুই হয়নি। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের বাড়িতে মারধর এই প্রথম, তাই প্রতিবেশীদের মধ্যে কৌতূহল বেশী। কারও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ঢোঁড়াই শুয়ে পড়ে। পাড়ার লোকের কথাবার্তা থেকে জানতে পারে যে, রামিয়া রবিয়ার বাড়ি গিয়ে খুব চেঁচামেচি করছে। কিছুক্ষণ পরই ঢোঁড়াইয়ের আঙ্গিনা খালি হয়ে যায়।

কুয়াশা আরও ঘন হয়ে তাৎমাটুলির বুকে চেপে বসে।

টীকা:—

(১) ষষ্ঠী এবং সূর্যের পূজা

(২) মুখশুধ—মুখশুদ্ধি; সুপারি কিংবা পান।

(৩) লাখেড়া—লক্ষ্মীছাড়া।

(৪) চামড়া

(৫) জানোয়ার

(৬) ভাথি—হাপড়;

(৭) ভিখমাঙ্গা—ভিখারী

(৮) কুকুর

পরদিন সকালেও রামিয়া এলনা দেখে শেষ পর্য্যন্ত ঢোঁড়াই রবিয়ার বাড়িতে যায়। অনুশোচনায় তখন তার মন ভরে গিয়েছে। ঝোঁকের মাথায় কি কাণ্ডই সে করে ফেলেছে রাতে! কাল আবার ছটপরব। আজ রামিয়ার উপোস। রাত্রে রামিয়া খেয়েছিল তো? খেল আবার কখন, সন্ধ্যা থেকেইতো সামুয়র বাড়িতে বসে।

রবিয়ার বৌ বলে যে, রামিয়াকে নিয়ে রবিয়া গিয়েছে মহতোর কাছে সেই ভোরবেলায়; রামিয়া পঞ্চায়তী করাবে। রবিয়ার বৌয়ের কথা বলবার সময় নেই; ছটপরবের যোগাড়যাগাড়ের ছিষ্টি কাজ তার পড়ে রয়েছে; নিশ্বাস ফেলবার বলে সে সময় করে উঠতে পারছে না, তার আবার সে এখন ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে গল্প করতে বসবে।

ঢোঁড়াইয়ের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে—কেবল আত্মমর্যাদায় নয়, আত্মবিশ্বাসেও।

কি আক্কেল রামিয়ার! তাদের ঘয়োয়া কথা নিয়ে গিয়েছে মহতো নায়েবদের কাছে! সামান্য জিনিসকে এত বাড়ানোর কি দরকার ছিল? কালকে ছটপরব তা কি রামিয়া ভুলে গিয়েছে? তাঁদের নতুন সংসারের প্রথম ছটপরব এইটা। কি কি জিনিস আনতে হবে তাকি ঢোঁড়াই অতশত জানে। 'সোহাগিন' (১) থাকল ছটপরবের সময় বাড়ির বাইরে—ঢোঁড়াইয়েরই বিরুদ্ধে নালিশের তদ্বিরে। তার রঙীন জগৎ আবছা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

ঢোঁড়াই সেদিন গাড়ী নিয়ে কাজে বেরোয় না, রামিয়া আবার যদি বাড়ি ফিরে তাকে দেখতে না পায়! বাড়িতে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে সে রামিয়ার কাছে মাপ চাইবে। ঠোঁটের কোণে হাসি এনে রামিয়া বসবে উনুনে আগুন দিতে, ঢোঁড়াইয়ের জন্য ভাত রাঁধতে। না না আজ আবার ভাত রান্না কি? স্নান করে রামিয়া বসবে গম ধুতে, ছটপরবের 'ঠেকুয়ার' (২) জন্য। ঢোঁড়াই ধাঙড়টুলি থেকে নিয়ে আসবে বাতাবী লেবু, আখ, সাওজীর দোকান থেকে আনবে গুড় আর 'ঠেকুয়া' ভাজবার তেল।......

উঠনে বসে ঢোঁড়াই আকাশ পাতাল ভাবে। সময় কাটতে চায় না। বড় একা একা লাগে। রামিয়া, রামিয়া, রামিয়া। বেনাঘাসের কাঠা, গোবরমাটি দিয়ে ন্যাপা তুলসীতলা, ঝকঝকে করে নিকানো উনুন, বাড়ির প্রতিটি জিনিসে রামিয়া মেশানো।

বাইরে বলদের ডাক কানে আসে। ওঃ তাইতো, আজ বলদ দুটোকে জল আর জাব দেওয়া হয়নি ত। একদম ভুলে গিয়েছি সে কথা।

ঢোঁড়াই ধড়মড় করে ওঠে।

বলদ দুটোকে খেতে দেওয়ার সময় রতিয়া ছড়িদার খবর দিয়ে যায় যে, রাতে মহতোর বাড়িতে রামিয়ার নালিশের পঞ্চায়তী হবে; সে যেন যায়।

'তেরহাঁর', মত দশজনের ব্যাপার হলে ঢোঁড়াই, মহতো নায়েবদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে; কিন্তু এ নালিশ যে রামিয়ার আনা। ঢোঁড়াই দোষ করেছে; সে পঞ্চায়েতের সম্মুখে সব দোষ স্বীকার করে নেবে। খালি বাড়িতে তার মন এরই মধ্যে হাঁফিয়ে উঠেছে। কাল শেষরাত্রে যখন রামিয়া মরনাধারে 'ছট' এর পিদিপ (৩) ভাসাতে যাবে, তখন সঙ্গে যাওয়ার জন্য ঢুলী আনবে ঢোঁড়াই মরগামা থেকে, যেমন বাবুভাইয়াদের 'ছট' এর পিদিপের সঙ্গে যায়। তার জন্য আট আনা দশ আনা যত খরচই হোক না কেন! পচ্ছিমের মেয়ের 'ছট'-এর ঘটা দেখুক তাৎমাটুলির 'ঝোটাহা'-রা। রামিয়াটা পঞ্চায়তের থেকে বাড়ী এসে কখন কোন্ কাজ করবে। সাজিমাটি পড়ে রয়েছে, তাই দিয়ে কাপড় কাচবে, গোবর দিয়ে ঘর আর উঠন নেপবে, গম পিষবে, কত কাজ ছট-পরবের। রামিয়ার কাজ আগিয়ে রাখবার জন্য সে নিজেই উঠন নিকোতে বসে গোবর মাটি দিয়ে। রামিয়া বাড়ী ফিরে অবাক হয়ে যাবে। দাওয়া নেপবার সময় মনে পড়ে যে রাতে এইখানটাতেই রামিয়া বসে ছিল। যেখানটায় সামুয়র বসেছিল সেখানে একটু বেশী করে গোবর দিয়ে দেয়; ঐ শালাই তো যত নষ্টের গোড়া। তার কথা ঢোঁড়াই ভুলতে চায়।

সাঁঝের আলোয় রঙীন হয়ে ওঠে ঢোঁড়াইয়ের নিজ হাতে নিকানো ঝকঝকে আঙ্গিনা। তুলসীতলায় অনভ্যস্ত হাতে পিদিপ জ্বালিয়ে দেয়; ভরে তেল দেয় তাতে, রামিয়া ফিরবার সময় পর্যন্ত যাতে সেটা জ্বলে। একটু

তেল শিশিতে রেখে দেয়; বিনা তেলে রামিয়াটা একদিনও স্নান করতে পারে না।...

তারপর রামজীর নাম নিয়ে ঢোঁড়াই বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। মহতোর বাড়ী পৌঁছে দেখে যে মহতো নায়েব সকলেই এসে গিয়েছে। সে ভেবেছিল যে রামিয়াকেও সেখানে দেখবে; কিন্তু রামিয়া নাই সেখানে। বোধহয় মহতোর বাড়ীর ভিতর ফুলঝরিয়ার সঙ্গে গল্প করছে। ঢোঁড়াইয়ের সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে সামুয়রকে সেখানে দেখে। ঐ হাড়খৃস্টান বদমাইশটা, মহতো নায়েবদের পাশে চুপটি করে 'বগুলা ভগৎ'-এর (৪) মত বসে আছে কেন? রামিয়া কি সামুয়রকে সাক্ষী মেনেছে না কি? তা হলেত সামুয়রকে নিয়েই যে কালকে রাতের ঝগড়া, সে কথা নিশ্চয়ই সবাই জেনে গিয়েছে। লজ্জায় ঢোঁড়াইয়ের মাথা কাটা যায়।

"বস্ ঢোঁড়াই"। ছড়িদার জায়গা দেখিয়ে দেয়। "তাড়াতাড়ি পঞ্চায়তের কাজ শেষ করতে হবে, বুঝলি ঢোঁড়াই। কাল 'ছট'। রামিয়া কোথায়?"

বাইরে থেকে জবাব দেয় রবিয়ার বৌ। "সারাদিন ছটের উপোস করে শরীরটা খারাপ হয়েছে তার। কাল সাঁঝেও খায়নি। তার উপর "পা ভারী" (৫)। আমরা বললাম তোর আর ওখানে গিয়ে কাজ নেই, আমরাতো থাকবই। মহতো নায়েবদেরতো সব কথা সকালেই বলে এসেছিস। বাড়ীতে বসে পরবের আটাগুড় ফল মূল পাহারা দে। সুরুজ মহারাজের জিনিস, ওগুলোতো ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারি না (৬)।"

আচ্ছা, আচ্ছা! হয়েছে।

তারপর ঢোঁড়াইয়ের বিচার আরম্ভ হয়। 'পা ভারী'! ঢোঁড়াইয়ের আশ্চর্য লাগে। ঢোঁড়াই স্বীকার করে যে সে মেরেছে রামিয়াকে রাগের মাথায়।

"চব্বিশ ঘণ্টা আমার মেয়েকে গঞ্জনা দেয়। বাড়ীর বাইরে যেতে দেয় না। কোন বেটাছেলের সঙ্গে কথা বললে মারধর করে, 'পা-ভারী'র উপরও। তোমরা পঞ্চ, জাতের মালিক। ওর পড়ে পাওয়া পয়সার গরমাই ঠাণ্ডা করে দাও।"— বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করে দেয় রবিয়ার বৌ।

মহতো নায়েবরা সকলেই তার বিরুদ্ধে, একথা ঢোঁড়াইয়ের চাইতে কেউ

ভাল করে জানে না। প্রত্যেকের তার উপর রাগের আসল কারণ সে জানে। তবু পঞ্চরা তাকে যে সাজা দেবে তা সে মাথা পেতে নিতে তৈরী আছে।' এবার থেকে সে চেষ্টা করবে রামিয়ার উপর সন্দেহ না করবার। তাকে সব জায়গায় যেতে দেবে। তার 'ভারী-পা'; একথা ঢোঁড়াইয়ের আগে খেয়ালই হয় নি।

বাবুলাল কথার মোড় ঘুরোবার জন্য বলে "পা-ভারী', তবু পচ্ছিমে মেয়ের ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ সারে না"। হেঁপো তেতর কাশতে কাশতে বলে "ওই শুনতেই পচ্ছিমের মেয়ে; আমাদের ঝোটাহাদেরও অধম।"

বাইরের ঝোটাহাদের চেঁচামেচি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। মহতো বলবে এবার কথা। চুপ্! চুপ্ কর্ সকলে।

"আমরা তোমার ভালই চাই ঢোঁড়াই।" সকলেই মহতোর এই কথায় সায় দেয়—আরে ঢোঁড়াইতো আমাদেরই ছেলে।

ঢোঁড়াই অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকায়। মহতো নায়েবদের কথার এই সুর সে জীবনে শোনেনি; আর তার নিজের ক্ষেত্রে কোন সহানুভূতি ও তাদের কাছ থেকে আশা করেনি। সে কিছুই বুঝতে পারেনা। বাবুলালের মুখের দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নেয়। সব হিসাবে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ঢোঁড়াইয়ের।

"পচ্ছিমের মেয়ে 'পচানো' (৭) আমাদের কম্ম না।"

বাইরে থেকে মহতোগিন্নীর গলা শোনা যায়। সেবার লোটা নিয়ে 'ময়দানে' যাওয়ার ব্যাপারটাতো একেবারে হজমই করে গিয়েছিলে নায়েবরা। যোয়ান মেয়ে দেখে ঢোঁড়াই না হয় তখন উন্মত্ত; তোমরা কি করে জাতের বেইজ্জতি গুলে গুলে খাচ্ছিলে তখন?

"তোকে কে পঞ্চায়তীতে কথা বলতে বলেছে? ছড়িদার, সরিয়ে দাও সকলকে এখান থেকে।" রবিয়ার বৌ চীৎকার করে—আমাদের মেয়ে নিয়ে মামলা; আর, আমরা শুনব না?

আচ্ছা, আচ্ছা থাক্ থাক্।

"হাঁ, দেখলিতো ঢোঁড়াই, বিয়ের আগেই আমরা মানা করেছিলাম। হাতীর

মত জোয়ান মেয়ে পচ্ছিমের পানির। 'কা ন করই অবলা প্রবল' (৮)...মহতোর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বাবুলাল পাদপূরণ করে দেয়—'কে হি জগ কালু ন খাই' (৯)। বাবুলাল সকলকে জানাতে চায়, সেও রামায়ণের সব জানে।

হেঁপো তেতরও রামায়ণের জ্ঞানে কারও থেকে পেছিয়ে নেই। সেও ছড়াকাটে—

"নিজ প্রতিবিম্বু বরুকু গ্রহি জাঈ।
জানি ন জাই নারি গতি ভাই॥" (১০)

আরশির উপর নিজের ছায়া যদিবা ধরে রাখা সম্ভব হয়, তবু মেয়েদের মনের গতি জানা সম্ভব নয়।

ঢোঁড়াই কিছুই আন্দাজ করতে পারে না। মহতো নায়েবরা কি করতে চায়? কেউ ঢোঁড়াইয়ের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলছে না কেন? সকলেই দেখছি রামিয়ার খেলাপেই বলছে। পঞ্চায়তের লোকরা এত শান্ত কেন? কেউ তাকে গালাগালি দিচ্ছেনা কেন?..."রামিয়া নিজে এসে আমাদের বলে গিয়েছে, যে সে আর কিছুতেই তোমার ঘর করবে না।" পঞ্চায়তের লোকজনের চেহারা ঢোঁড়াইয়ের চোখের সম্মুখে থেকে মুছে যায়। ঢোঁড়াই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে। ভারী মাথাটা নিয়ে আর সে সোজা হয়ে বসতে পারছে না। একটা গমপেষা জাঁতার চাকা ঘুরছে, তারই উপর যেন সে বসে আছে। জাঁতার শব্দের মধ্যে দিয়েও কানে পৌঁছুচ্ছে রবিয়ার বৌয়ের, কান্না মেশানো কথার স্রোত।

"যা জুলুম করে ঢোঁড়াই আমার মেয়ের উপর। এক মিনিট 'দম্' নিতে দেয় না। বাইরে আসতে দেয় না, ফৌজীকূয়োতল্লাতে পর্যন্ত না; হাসতে দেয় না। আমার মেয়ে কি টিয়াপাখী নাকি যে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখবে? রোজ মেয়ে আমার কাছে কান্নাকাটি করত। অনেক লাথি ঝাঁটা সয়েছে ঐ ভিখিরির বেটা বড়মানুষের। বাবুভাইয়াদের মাইজীরা মহাৎমাজীর নিমক বেচে, জিরানিয়ার রাস্তায়; আর ইনি আমার মেয়েকে বাড়ীতে বন্ধ করে রাখবেন। সাতকাল গেল ভিক্ষে করে, আজ আমাদের বিলাতীলণ্ঠন দেখাতে আসে। চুপ করব কেন? আমার 'পা-ভারী' মেয়ের হাড় গুঁড়ো করেছে ও

মেরে, "আর আমি চুপ করবো। তোমরা পঞ্চ, আমাদের দেবতা। ওই 'প্লাখণ্ডী'টার (১১) ঘরে আর আমার মেয়েকে ফিরে যেতে ব'ল না। নিয়ে নিক ও ফিরিয়ে, বিয়েতে ও মেয়েকে যত টাকা দিয়েছিল"। কান্নার শব্দে রবিয়ার বৌয়ের তারপরের কথাগুলি আর বোঝা যায় না।

টাকার কথায় ঢোঁড়াই চমকে ওঠে। কানের ভিতরের জাঁতার শব্দটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়; সঙ্গে সঙ্গে ঘুরুনিটাও। বলে কি! রবিয়ার বৌ দেবে টাকা! জমিদারের ডিক্রি ঝুলছে তার মাথার উপর! বিয়ের সময় মিসিরজী যে চাল গনেছিলেন তা সংখ্যায় বেজোড় ছিল; সে সময় ঢোঁড়াই ঠিকই দেখেছিল! আর কোন সন্দেহ নেই তাতে।

বাবুলাল এতক্ষণে কথা বলে। "বলছো যে সে মেয়ে ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে থাকবে না। কিন্তু জোয়ান মেয়ে থাকবে কার সঙ্গে। এখন না হয় ধানকাটনী আসছে; তারপর?"

রবিয়ার বৌ ঘোমটার মধ্যে থেকে কাঁদতে কাঁদতে জবাব দেয় "সে মেয়ে কিছুতেই ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে থাকবে না, মরে গেলেও না। এখন তোমরা অন্য কারও সঙ্গে ওর 'সাগাই' (১২) ঠিক করে দাও।"

এইবার মহতো কেশে গলা সাফ করে নেয়,—

—"কথা যখন উঠেছে, তখন পরিষ্কার কথাই বলি। তাৎমাটুলির মধ্যে ঐ মেয়ের সাগাই টাগাই আর আমরা করাচ্ছি না। একবার 'কমজোরী' (১৩) দেখিয়ে ঠকেছি।"......

ঢোঁড়াইয়ের মাথাটার মধ্যে যেন একখানা পাথর ঢুকে আছে—কোন কথা ঢুকবার আর জায়গা নেই সেখানে। নিজেকে দুর্বল দুর্বল লাগছে। বিয়ের সময় ফৌজীকুয়োর জল দিয়ে কাজ সারা হয়েছিল, ও কুয়োটার বিয়ে দেওয়া নেই। কেন সে সেই সময় আপত্তি করেনি?

"আর এই 'পা-ভারী' মেয়ে। এর অন্য জায়গায় 'সাগাই' হওয়াও শক্ত। আমাদের জাতের মধ্যে না হয় এরকম 'সাগাই' চলে। কিন্তু বাইরের লোকের মধ্যে তো তাৎমাটুলির পঞ্চদের কথা খাটবে না......"

ঢোঁড়াই ঘেমে উঠেছে। মাথার মধ্যেটা ঠাণ্ডা—ঝিম্ ঝিম্ করছে।...

...সাগাই......রামিয়া.....কথাগুলোর মানে যেন সে ঠিক বুঝতে পারছে না।......

'তার উপর ঢোঁড়াই বিয়েতে টাকাও খরচ করেছে সেটাও ফিরে না পেলে চলবে কেন। ওরওতো তাহলে আবার 'শাদি' করার দরকার হবে।'

"হাঁ এটা একটা 'ইনসাফ'এর (১৪) কথা বলেছ মহতো।"

এই সব কথাবার্তার মধ্যে সামুয়র এতক্ষণ একটিও কথা বলেনি। এক কোণে বসে সে একটা ঘাস দিয়ে দাঁত খুঁটছিল, আর মধ্যে মধ্যে থুতু ফেলছিল। সে ঢোক গিলে বলে "তোমাদের যদি মত হয়ত আমি ঢোঁড়াইয়ের টাকা দিয়ে দিতে রাজী আছি।" ঢোঁড়াইয়ের কান খাড়া হয়ে ওঠে। রামিয়াকে বিয়ে করতে রাজী আছি একথা পরিষ্কার না বললেও সামুয়রের কথার অর্থ সুস্পষ্ট।......

দপ করে জ্বলে ওঠে ঢোঁড়াই। "কি বল্লি? জিব টেনে ছিঁড়ে নেবো। শরীরের সবকটা শিরা ঢিলে করে দেবো (১৫) পিটিয়ে।" ঢোঁড়াই উঠে দাঁড়িয়েছে। আগুন বেরুচ্ছে তার চোখ দিয়ে।

মহতো একটু ভয় পেয়েছে। "বোসো ঢোঁড়াই ঠাণ্ডা হয়ে। সামুয়র তুই রাজী হলেইতো হলনা। আবার রামিয়া রাজী আছে কিনা তাওতো জানতে হবে।"......

রবিয়া সামুয়রের হয়ে জবাব দেয়—"আজ সাঁঝেইতো ছড়িদারের সম্মুখে বলেছে রামিয়া যে সে রাজী আছে।"

ঢোঁড়াইয়ের কাঁধ আর হাতের পেশীগুলি শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে। এই বুঝি বাঘের মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ে পঞ্চদের উপর।......

"টাকা খেয়ে সাজশ করছে, সালা চোট্টার দল", গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে ওঠে ঢোঁড়াই।

তার হিংস্র চোখের মধ্যে দিয়ে ঠিকরে পড়ছে অজস্র বজ্রের স্ফুলিঙ্গ। 'বজরঙ্গবলী' (১৬) মহাবীরজীর অসীম শক্তি এসে গিয়েছে তার দেহে আর বাহুতে। অনেক বড় দেখাচ্ছে তাকে। সম্মুখের এই 'হফৎরঙ্গী' (১৭) পিঁপড়েগুলোকে সে ফুঁ দিয়ে ছত্রাকার করে দিতে পারে মুহূর্তের মধ্যে; টেনে ফেলে দিতে পারে দূরে যেখানে ইচ্ছে; ঝড়ের মুখে বকড়হাট্টার মাঠের

শিমুলতুলোর মত উড়িয়ে দিতে পারে এক নিশ্বাসে; পড়পড় করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে ঐ কুত্তা সামুয়রটাকে; যেদিকেই সবুজ দেখে সে দিকেই চরতে যায় এই পঞ্চায়তীর ছাগলের দল; কিন্তু এই সব উকুন মারবার তার সময় কোথায় এখন।…রামিয়া…আগে রামিয়া সেই পচ্ছিমা বাজারের আওরৎ রামিয়া (১৮);—সামুয়রকে বিয়ে করতে চায় রামিয়া।…… এতদিন থেকে তাকে ঠকিয়ে আসছে।……বলেছিল মর্কটের মত দেখতে সামুয়রকে …পঞ্চায়েৎঘরের সকলে ভয়ে তার জন্য পথ ছেড়ে দেয়। কি ক'রে, কখন সে মহত্তোর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে, তা' সে নিজেই জানতে পারে না। সারা পৃথিবী তার চোখের সম্মুখ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে পচ্ছিমা সাপটাকে সে পুষেছিল সেটা এতদিনে ছোবল মেরেছে। তার কাছে রামিয়া সামুয়রকে নিয়ে ঠাট্টা করে কটাচোখো 'বিলাড়' (১৮) বলে।……কিছু জানতে পারিনি এতদিন!……পৃথিবীতে আগুন লেগে গিয়েছে—কাঁপছে ঘুরপাক খাচ্ছে, ধসে যাচ্ছে পায়ের নীচের মাটি।…… যাক, কিন্তু কারও শক্তি নেই সেই সাপটার কাছে যাবার পথে তাকে বাধা দেয়, মহাবীরজীও না, গোঁসাইও না, খোদ রামচন্দ্রজী এলেও না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হাওয়া বাতাস শান্ত হয়ে গিয়েছে, তার প্রতিটি স্নায়ুর উদ্দণ্ড আলোড়ন দেখে। তার হাত মুঠো হয়ে আসছে; প্রচণ্ড শক্তিতে পৃথিবীকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলতে পারে এখনই; এর প্রতিটি অণুপরমাণু তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে সারাজীবন।……মিষ্টিকে তেতো বিস্বাদ করে দিয়েছে।……

রবিয়ার বাড়ীর কুকুরটা কেঁউ করে ডেকে ভয়ে পালায়

পিদিপ জ্বলছে দাওয়ায়। রামিয়া বাঁশে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। সারাদিন উপোসের পর 'ছট' পূজোর জিনিসগুলো পাহারা দিতে দিতে তার ঢুলুনী এসে গিয়েছে।……

ঝুঠঠী! (২০)……বাজারের আওরাৎ।……পচ্ছিমের কুত্তী! (২১)…… তার মনের প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রকাশ করার মত ভাষা নেই ঢোঁড়াইয়ের। দরকারই বা কি?…… লাথি… কিল ঘুঁষি……চড়……এই নে!……এই নে। এখানে।……এখানে……এখানে……মাথায়, মুখে, পিঠে,…সর্বাঙ্গে……

ছটপরবের আখটা মট্ করে ভেঙে যায়।

থেঁতলে, কুটে, পিষে, চটকে, ছেঁচে, ফেলতে ইচ্ছে করে, হারামজাদীর দেহটাকে—পা দিয়ে নড়ালেও নড়েনা……

রবিয়ার বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়েছে ঢোঁড়াই অন্ধকারের মধ্যে। যে দুনিয়া তার বিরুদ্ধে গিয়েছে, সম্পর্ক কি তার দুনিয়ার সঙ্গে। রবিয়ার বাড়ীর কুকুরটা ডাকছে পিছনে ; থানের দিকে আলো নড়ছে। তারই বিলাতীলণ্ঠনটা নিয়ে বোধ হয় সকলে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। রামিয়ার কপালের 'থানিকটা কেটে গিয়েছিল … তার "পাক্কীর" উপর দিয়ে ঢোঁড়াই অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চলেছে। টিম্ টিম্ করে আলো জ্বলছে দূরে রেবণগুণীর বাড়ীতে। সেই—সেই রাতে রেবনগুণী বলেছিল তার পাওনাটা দিয়ে দিতে শীগগিরই ; হঠাৎ মনে পড়ল সে কথা। আর কারও ধার ধারেনা সে! কোমরে গোঁ এক আনা পয়সা রেবনগুণীর নাম করে সে অন্ধকারে ফেলে দেয়। 'পাক্কী পাথরের উপর কেবল একটু খুট্ করে শব্দ হয়। কাছের ঝিঁঝি পোক পর্যন্ত সে শব্দ শুনে এক মুহূর্তের জন্য তার একঘেয়ে ডাক থামায়না।

ঠক্-ঠক্! ঠক্ ঠক্! ঠক্ ঠক্! তাৎমাটুলিতে একটানা হাতুড়ি পিটে চলেছে "কামার পাখী" (২১)।

টীকা :—

(১) এয়ো।

(২) আটা ও গুড় দিয়া তৈরী একপ্রকার শুখনো পিঠা ; ছটপূজায় লাগে।

(৩) ছটপরবের পরদিন ভোর রাত্রে মেয়েরা নদী কিম্বা পুকুরে ষষ্ঠী ঠাকরুণ আর সূর্যদেবের নামে পিদিম জেলে ভাসিয়ে দেয়। প্রত্যেক বাড়ার মেয়েরা এই উপলক্ষে নদীর ধারে যাবার সাধ্য-সঙ্গতি অনুযায়ী জাঁকজমক করে।

(৪) বক-ধার্মিকের মত।

(৫) সন্তানসম্ভবা।

(৬) ছট কথাটি ষষ্ঠী শব্দের অপভ্রংশ। কিন্তু পূজো কেবল ষষ্ঠীর করা হয় না, সূর্যদেবেরও সঙ্গে সঙ্গে পূজো হয়। সাধারণ লোকেরা সূর্যদেবের পূজোকেই আসল ছটপূজো মনে করে। এ পূজার জিনিসপত্র অতি শুদ্ধাচারে রাখা হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং শুদ্ধাচারের অবহেলা হইলে তাৎমারা জানে যে, সূর্যদেব তাহাদের কুষ্ঠ-রো[illegible]